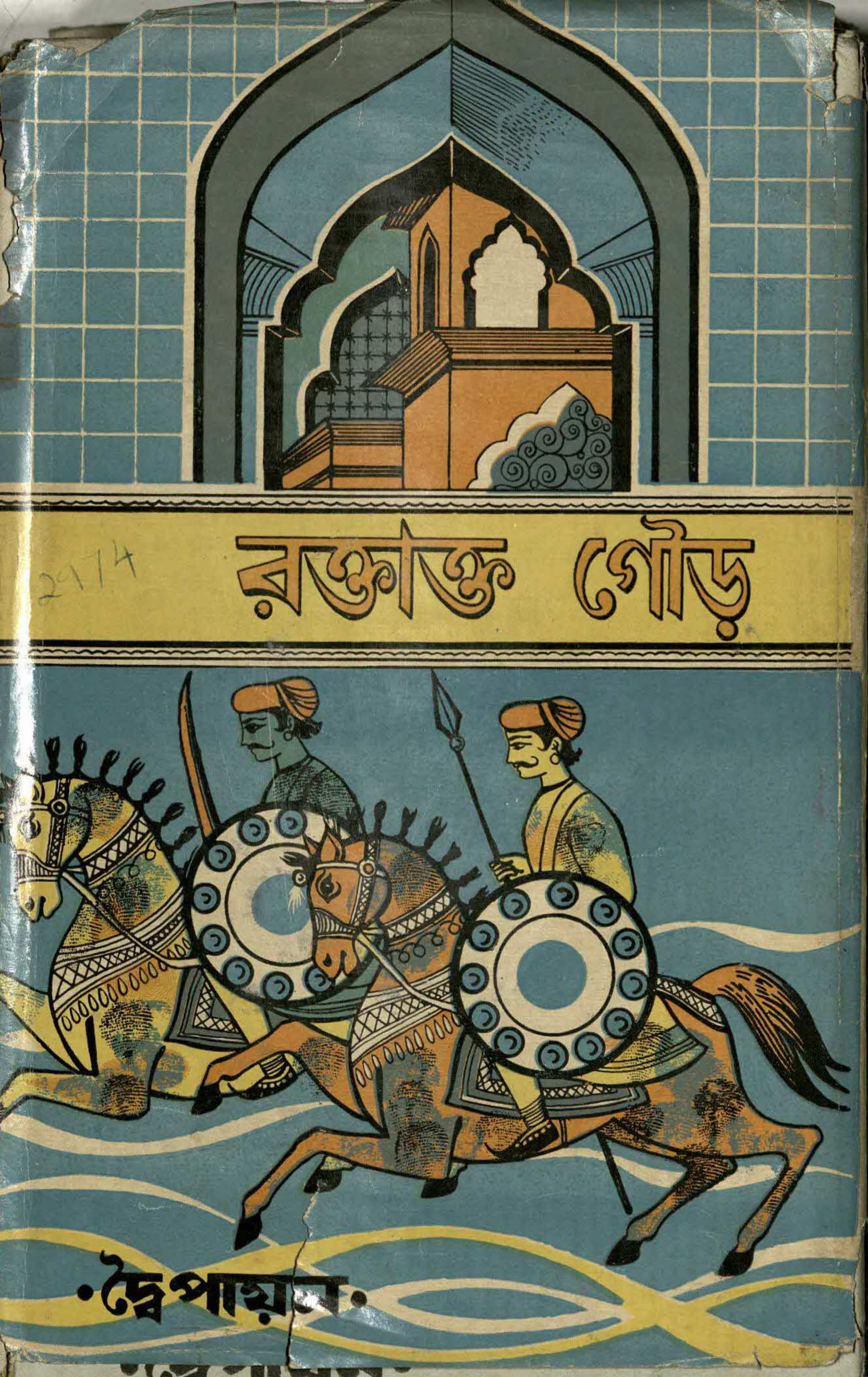

রক্তাক্ত গৌড়
2974
দ্বৈপায়ন

অঞ্জলি প্রকাশনী প্রকাশিত

রক্তাক্ত গৌড়



দ্বৈপায়ন

পরিবেশক : নব গ্রন্থ কুটির ৫৪/৫এ, কলেজ স্ট্রীট,

কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
কবিপক্ষ ১৩৭৬
মে — ১৯৬৯

প্রকাশক :
শ্রীসুশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২ই, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
জহর দাস

প্রচ্ছদ মুদ্রক :
মোহন প্রেস

ব্লক :
নিউ ইণ্ডিয়ান প্রসেস

মুদ্রক :
অনিলকুমার দে

রূপমুদ্রণ
৪১/১, হিদারাম ব্যানার্জী লেন
কলকাতা-১২

মূল্য : দশ টাকা

পূর্ব বাঙলার বিখ্যাত সাঁতারু

শেখ মনজুর হোসেন

ভাইসাহেব

ইতিহাসের পাতায় একদিন একটা নাম দেখেছিলাম সৈফুদ্দিন ফিরোজশাহ্, বাংলার হাবশী সুলতান। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে দেখলাম শুধুমাত্র একজন নয়, বাংলাদেশে প্রায় আশীহাজার হাবশী আমদানী করা হয়েছিল একদিন। কালে বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েছিলেন তাঁরা। সৈফুদ্দীন ফিরোজশাহ্ প্রথম সুলতান।

সাধ্যমত চেষ্টা করেছি তথ্য সংগ্রহে। কতটুকু কৃতকার্য হয়েছি জানি না। তাই মনে দ্বিধা-সংশয়। পাঠক কুল বিচার করবেন। দায়িত্বটুকু তাঁদের হাতেই তুলে দিলাম। সেই সঙ্গে জানিয়ে রাখলাম ক্ষমা ভূল-ত্রুটির।

দ্বৈপায়ন

২৫শে বৈশাখ ১৩৭৬
চতুষ্পাঠী লেন
বৈদ্যবাটী, হুগলী

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

রক্তস্নাত মধুমতী, হারেমের কোহিনূর, বাইজী থেকে বেগম, মতিবাঈ, এই রোদ এই বৃষ্টি, মোগল হারেম, জিন্নৎ উন্নিসা, মেঘনা মতি, মেহের উন্নিসা, রাজ তরঙ্গিণীর দেশে।

॥ এক ॥

ইনাম !!

বহুৎ-বহুৎ-আশরফি। হীরা-জহরত-মণিমাণিক্য—যা চাই।

আবছায়া অন্ধকারে ফিস্‌ফিসিয়ে উঠেছিল নাসিরুদ্দীনের চাপা কণ্ঠস্বরটা। লোভের ছায়া বিস্তার করতে চেয়েছিল সফির মনে। তার কাজের বিনিময়ে সে যা দাবি করবে—পূরণ করতে দ্বিধা করবে না নাসিরুদ্দীন। আর, কাজটা যে তার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, সেটুকু জানে ব'লেই ভার দেওয়া। তাছাড়া, বিশ্বাসের প্রশ্নটাও ওঠে!

কিছুই অস্বীকার করে না সফি। নাসিরুদ্দীনের প্রতিটি কথাই সত্যি। সত্যিই কাজটা অতি তুচ্ছ! শুধুমাত্র নির্ভুল লক্ষ্যের হিসাব। সামান্য কাতোরক্তি। মৃত্যু যন্ত্রণা! চাপ-চাপ খানিকটা রক্ত। লাল টকটকে।

একটা জীবিত মানুষের বুকের তাজা খুনের কোনো মূল্য নেই একজন পাইকের কাছে। কারণ পাইকের কাজই যে জান নেওয়া-দেওয়া। ভুল আর নির্ভুলের প্রশ্ন। ভুল হ'লেই সর্বনাশ! জান দিতে হবে।

না হ'লে আছে ইনাম! কাজের পুরস্কার! পাইকের ন্যায্য প্রাপ্তি। যা পাইকের দল এতোদিন পেয়ে এসেছে। পাচ্ছে। পাবে। কারণ, তারা না হ'লে চলবে না। তারা ছিল, আছে, থাকবে।

এই যে গৌড়ের মসনদ! সুলতান এখন সৈফুদ্দীন ফিরোজশাহ্‌। কিন্তু কতোটুকু ক্ষমতা তাঁর? হাজার লোভের হাতছানি থেকে কে বা কারা তাঁকে আগলে রাখছে, ঢেকে রেখেছে, দীর্ঘ ক'টা বছর রক্ষা ক'রে যাচ্ছে?

পাইকের দল। জান নিতে আর দিতে যাদের পরোয়া নেই—মসনদের প্রকৃত মালিক তারাই।

সুলতান একজন থাকেন। যেন সঙের পুতুল। দিনের আলোয় মসনদে বসেন। প্রজার দল নজরানা দেয়। দোষীর দল দণ্ড নেয় মাথা পেতে। কেউ পায় পুরস্কার, কারো যায় মাথা। বাধা দেওয়ার, দণ্ড মকুফ করার মতো ক্ষমতা কারো নেই। সুলতানই সব। তাঁর হুকুমমতো সব চলবে। নিজের মর্জিমতো কাজ করবেন তিনি।

কিন্তু এতো ক্ষমতা যাঁর—দিনের আলোয় ফকিরকে আমির আর আমিরকে ফকির বানাচ্ছেন যিনি তাঁরও বুক কাঁপে। বুক কাঁপে ভয়ে। দিনের সূর্যটা ম্লান হ'তে শুরু করলেই মুখটা শুকিয়ে ওঠে। চোখের তারায় জাগে চাঞ্চল্য। মনে মনে খোদার নাম নেন বুঝি!

মেহেরবান খোদা দোয়া কর! ম্যায় জিন্দারানে চ্যাতা হুঁ। ইয়ে দুনিয়া সে ম্যায় নেহি জাউঙ্গা।

নেহি জাউঙ্গা!

আমি যাবো না। আমি থাকবো। আমি বাঁচবো।

সবাই তাই চায়। জীবনের ধর্মই যে বাঁচা। মানুষ বাঁচতে চায়। সুলতান হ'লেও তো তিনি মানুষ! তাই তো তাঁর বাঁচার জন্যে ব্যাকুলতা। আর্তনাদ, ক্রন্দন।

আর কিছু নয়, তিনি বাঁচতে চান। খোদার দরবারে তাই তাঁর ব্যাকুল প্রার্থনা। দোয়া কর খোদা। তুমি দোয়া কর।

কিন্তু পারেন কই?

দিনে যিনি সুলতানরূপে সকলের কাছে পরিচিত, রাতের অন্ধকারে তাঁর নসিবে কি লেখা আছে, কে বলতে পারে! সুরার নেশায় সুন্দরীর নগ্ন বুকে মাথা দিয়ে সেই যে চোখ বুজলেন, পরদিন ভোরে পাখির ডাক, আসমানের আলো দেখার সৌভাগ্য আর হ'ল না।

তখন, মসনদের অন্য দাবিদার। নতুন সুলতান। একটা জিন্দা মানুষ শেষ হয়ে গেল। হয়তো কোনো চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়া গেল না তার।

এইভাবেই তো ক'টা বছর চলছে। নসিব খারাপ হ'লে দু'চার দিন বা দু-এক মাস। দু-এক বছর রীতিমতো সৌভাগ্য। তার বেশি নয়।

জ্ঞান হবার পর থেকে সফি অন্ততঃ দেখেনি। শুধু একজনই দু-এক বছর সুলতান সেজে মসনদে বসে আছেন, সৈফুদ্দীন। ভাগ্যবান সুলতান।

দু'একদিনের সুলতানি যাঁদের খতম হয়, রাতের অন্ধকারে যাঁরা খুন হন—তাঁরা কেন খুন হ'লেন, কে খুন করলে একথা কারোরই অজানা নয়। কিন্তু এমনই মজা. হত্যাকারীর পরিচয় প্রকাশ করা বা তাকে শাস্তি দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সবাই যেন জেনে-শুনে চোখ বুজে থাকে। হয়তো ভয়ে, আশংকায়।

কারণ সেই একই। সত্যিই ভয়। অধিকারের প্রশ্ন। মসনদের ন্যায্য দাবিদারদের ঘাঁটালে চলবে না। পাইক-সর্দার সুলতানের প্রভু। সুলতান শুধুমাত্র খেলার পুতুল! ইচ্ছা-শক্তিহীন খোদার দুনিয়ায় একটা আজব সৃষ্টি। মসনদের অধিকার তো পাইক-সর্দারের।

তবু এই দাবি যে কেউ পূরণ করার চেষ্টা করেনি তা নয়। খোজা বারবক তো পাইক-সর্দার ছিল। পাইক-সর্দার ছিল এই কারণে প্রতিরাত্রে যে পাঁচ হাজার পাইক সুলতানকে পাহারা দিত তাদের হাত ক'রে সুলতানকে খুন করলে সে। পাইকের দল সুলতান ব'লে মেনে নিলে তাকে।

জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ্। গৌড়-মসনদের বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, উদার হৃদয় সুলতান। আর হারেমের প্রধান খোজা বারবক।

একদিন দু'দিন নয় অনেক দিন লেগেছিল বারবকের। মসনদে বসে সুলতান সাজতে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। পাইকের দলকে নিজের আজ্ঞাধীন করতে কম কষ্ট করতে হয়নি। তবেই একদিন পাইক-সর্দারের প্রভু হ'তে পেরেছিল। পাইক-সর্দার তাকে তার প্রভু ব'লে মেনেছিল।

৮৮৬ থেকে ৮৯২ হিজরা (১৪৮১-৮২খ্রীঃ থেকে ১৪৮৭-৮৮খ্রীঃ) পর্যন্ত দীর্ঘ সাতটা বছর গৌড়ের মসনদে সুলতান ছিলেন ফতেহ্ শাহ্।

ফতেহ্ শাহে্র রাজত্বকালেই (১৪৮৬ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি) নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

দোষে-গুণে মানুষ ছিলেন ফতেহ্ শাহ্। কখনো কঠোর, কখনো কোমল। এক সময় মিথ্যা অভিযোগে তিনি যেমন নবদ্বীপের অসংখ্য ব্রাহ্মণ হত্যা ক'রে দেবমন্দির ধ্বংস করেছিলেন, নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে ভুল সংশোধন ক'রে নিয়েছিলেন।

কিন্তু জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। অন্যায়কারীর দলকে শাস্তি দিতে দল পাকিয়ে ছিল তারা। হারেমের খোজা বারবকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল। পাইকের দল বশীভূত হয়েছিল অর্থে। বারবক হয়েছিল পাইক-সর্দার।

তারপর একদিন রাতে পাঁচ হাজার জাগ্রত প্রহরী পাইকের চোখের সামনে ফতেহ্ শাহ্কে খুন করল বারবক।

গৌড়-মসনদের নতুন সুলতান। বারবক হ'ল সুলতান শাহ্জাদা।

মাত্র ক'টা দিনের সুলতানি। ৮৯২ হিজরার (১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ) মাঝের ক'টা মাস।

সুলতান ফতেহ্ শাহ্কে খতম ক'রে মসনদে বসেছিল খোজা বারবক। সুলতান শাহ্জাদা। হয়তো স্বপ্ন দেখেছিল। সুলতানির স্বপ্ন। এ ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন দেখা তো সম্ভব ছিল না তার পক্ষে।

কারণ যারা স্বপ্ন দেখে—গৌড়-মসনদে সুলতান সেজে ক'টা দিন, ক'টা মাস বা ক'টা বছর জীবন কাটায়—তারা জানে যে-কোনো মুহূর্তে জিন্দিগিটা খতম হ'তে পারে। আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে। জীবনের কোনো মূল্য নেই। বেঁচে থাকাটাই বড়।

আর সেইজন্যেই বেঁচে থাকার দিনগুলোতে—সুলতানির জিন্দিগিটায়, কোনো আপসোস রাখে না তারা। ভোগ করে যেমন খুশি। গৌড়-মসনদের সুলতানির জীবন শুধুমাত্র ভোগের জন্যে।

কিন্তু ভোগ করার সাধ্য ছিল না বারবকের। খোদার দুনিয়ায় একটা ভাগ্যহীন মানুষ বারবক। মানুষের স্বার্থে-ষড়যন্ত্রে, চিরকালের মতো বঞ্চিত হয়েছিল। ভুল করেছিল। ক'টা মাস মসনদে বসিয়ে তার সঙ্গে তামাশা করেছিলেন খোদা।

প্রায়শ্চিত্ত করল বারবক। সুলতান শাহ্‌জাদা। গৌড়-মসনদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ-সুলতানদের যা হয়, তার ভাগ্যেও তাই ঘটল।

পাইক সর্দারের সুলতান হ'লে কি চলে? সুলতান শাহ্‌জাদা বারবক মসনদে বসে হাঁফ ছাড়ার আগেই খুন হ'ল!

খুন হ'ল বিশ্বস্ত অনুচর মালিক আন্দিলের হাতে। আর এমনই মজা, যে ভুল বারবক করেছিল সেই ভুলই করতে যাচ্ছিল মালিক আন্দিল। হ'তে পারল না শুধু সৈফুদ্দীনের জন্যে। বারবকহীন নিষ্কণ্টক পথে কারো সাধ্য হ'ল না তাঁর গতিরোধ করা।

সফির স্পষ্ট মনে আছে সে দিনটাকে। মাত্র তিনটে বছরের ব্যবধান। সময়ের হিসাবে কিছুই নয়। জীবনের অগুনতি দিন-মাস-বছরের হিসাবে তিনটে বছর কতোটুকু? স্মৃতিতে উজ্জ্বল সেদিনের স্মরণীয় ক'টা মুহূর্ত!

মনে মনে হিসাব করল সফি।

এখন ৮৯৫ হিজরা। দু'বছর আগে ৮৯৩ (১৪৮৭ খ্রীঃ)-এর কথা। গৌড়-মসনদে হাবশী সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজশাহ্‌। আর পাইক-সর্দার জামান খাঁর অধীনে সামান্য একজন শিক্ষানবিস সে। পাইকের মর্যাদা লাভ তখনও তার ভাগ্যে ঘটেনি। তবু তারও সেদিন তলব হয়েছিল প্রাসাদ-সংলগ্ন ময়দানে হাজির হওয়ার।

গিয়েছিল সফি। দেখেছিল মানুষের মেলায় ছয়লাপ ময়দান। চেনা-অচেনা হাজার মানুষ। ভিন্ন ভিন্ন দলের। সকলেই পাইক। মাথায় লাল, সবুজ, সাদা নানা রঙের টুকরো কাপড়ে ফেট্টি বাঁধা। হাতে তীর-ধনুক, লাঠি-সড়কি, বল্লম—যার যা আছে। নিরস্ত্র শুধু

নিজেকেই দেখেছিল। কারণ, হুকুম শুধু হাজির হওয়ার। পাইক-সর্দার জামান খাঁর হুকুম। ইচ্ছে ক'রেই সফি তার নিত্য সহচর তীর-ধনুকটা সঙ্গে নেয়নি।

গৌড়-মসনদের নতুন সুলতার সৈফুদ্দীন ফিরোজশাহ্। হাবশী সৈফুদ্দীন। সুলতান নাসিরুদ্দীন মামুদ শাহের পুত্র রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্ গৌড়-মসনদে তাঁর একুশ বছর রাজত্বকালে যে আশী হাজার হাবশী বাংলায় এনেছিলেন, তাদের মধ্যেই ভাগ্যবান একজন।

গৌড়-মসনদের প্রথম হাবশী সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজশাহ্।

সুলতান ফতেহ্‌শাহের পার্শ্বচর যে গৌড়-মসনদে বসবে, একথা সফির মতো কেউই বুঝি ভাবতে পারেনি সেদিন। পরস্পরের কথা বলা, চাপা আলোচনা থেকে এইটুকু ধারণাই হয়েছিল তার।

তবু সেদিন, সেই সুলতান হওয়ার প্রথম দিনটাতেই সকলে মেনে নিয়েছিল তাঁকে। না মেনে উপায়ও ছিল না। কারণ, দরবারের আমির-ওমরাহ্‌দের পূর্ণ সমর্থন ছিল তাঁর প্রতি। ছিল জামান খাঁ। কয়েক হাজার পাইকের সর্দার জামান খাঁ।

পরবর্তী ঘটনাগুলোর কথাও মনে পড়ল সফির। মসনদে বসে প্রথম দিনের দরবার সামান্য সময়ের ব্যবধানে শেষ ক'রে, বাইরে জনতার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সকলের বিশ্বাস, ভালোবাসা আর সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। ঘোষণা করেছিলেন, নামে তিনি সুলতান হ'লেও একজন মানুষ তিনি। মানুষের বন্ধুরূপে, সেবকরূপে তিনি তাঁর কর্তব্য ক'রে যাবেন। তাঁর দ্বার সকলের কাছে সব সময়ের জন্যে উন্মুক্ত রইল। যিনি যখনই প্রয়োজন অনুভব করবেন, তিনি যেন বিনা দ্বিধায় তাঁর কাছে চলে যান। তিনি খোদার নামে কসম খাচ্ছেন, মানুষের কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণ চিন্তা কখনো করবেন না।

বলেছিলেন সৈফুদ্দীন। তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরটা বারবার কেঁপে-কেঁপে উঠেছিল। প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে উঠেছিল মুখমণ্ডল। সকালের প্রসন্ন আলোয় বড় সুন্দর দেখিয়েছিল তাঁর কালো মুখের সুন্দর হাসিটি।

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া মানুষগুলো তাঁর কথা শুনে কেমন যেন বিস্মিত হয়েছিল প্রথমটায়। নতুন কথা শুনছে তারা। এমন কথা আগে কেউ কোনোদিন তাদের বলেনি। সুলতান—সুলতান। উপকার করুক বা না করুক দোষ করলে সাজা দেয়। বিনা দোষেও গর্দান যায় সময়-সময়। কারণ, সুলতানের বিচার। তিনি যা ভালো বুঝেছেন করেছেন। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তিনি তাঁর মর্জি মাফিক কাজ করেছেন।

তাঁর কাজের বিচার, সমালোচনার অধিকার কোথায় সাধারণ মানুষের। কোনো অধিকার নেই। সুলতানের কাজের কৈফিয়ৎ, তা সে যতো অন্যায়, যতো জঘন্যই হোক না কেন তার বিচার সাধারণ মানুষ করবে না। করতে পারে না।

এই চলে আসছে। দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। মার খেয়ে মানুষ কেঁদেছে, আবার ভুলে গেছে। প্রতিকারের কথা চিন্তা করেনি।

নতুন কথা শুনিয়েছিলেন সৈফুদ্দীন। মানুষের অধিকারের মর্যাদা ঘোষণা করেছিলেন। মুক্তকণ্ঠে জানিয়েছিলেন, খোদার দুনিয়ায় আমরা সবাই সমান। আমরা মানুষ। সুলতান হ'লেও আমি মানুষ। মানুষের বন্ধু।

নতুন সুলতানের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়েছিল আকাশ-বাতাস। জেগে উঠেছিল মানুষ। আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। সমুদ্রের গর্জনে, উল্লাস ধ্বনিতে ফেটে পড়েছিল। একে অপরকে বুকে টেনে নিয়েছিল।

দেখেছিল সফি। মানুষে মানুষে জড়াজড়ি দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। তরুণ তাজা প্রাণটায় সাড়া জেগেছিল তার। দুরন্ত আহ্বান। কলোচ্ছ্বাস।

আর সেদিন, সেই প্রথম দিন নিজেকে তার মানুষ ব'লে মনে হয়েছিল। যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। নিজের দিকে তাকিয়ে

ছিল। নিজের মনটার দিকে। অচেতন একটা মন। আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত, মুখ থুবড়ে পড়েছিল।

আর······

জামান খাঁ একদিন ডেকেছিল তাকে।

গিয়েছিল সফি। দেখেছিল, সর্দার বসে আছে। বসে আছে একা। কেউ নেই। মুখটাও যেন হাসি-হাসি দেখোছিল।

বলেছিল : কী করছিলি?

কিছু করেনি সে। চুপচাপ বসেছিল। কিছু করার ছিল না ব'লেই বসেছিল। বসে থাকে চুপচাপ। দিনের পর দিন। কিছু ভাবে না। শুধু দেখে। আকাশ-মাটি, গাছপালা। সকালের সূর্য-ওঠা, বিকলের অস্ত যাওয়া। দুপুরের ধূ-ধূ প্রান্তরে পাখিদের ওঠা-নামা দেখে। শুধু দেখে। দেখতে দেখতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। হারিয়ে যায় সফির মনটা। প্রকৃতির অরণ্যে। ভুলে থাকে নিজেকে। ভুলে যায়।

কোনো কাজ না-করা সফি তাই চুপ করেছিল। কাজ করলে তো বলবে, সে কাজ করছিল। কোনো কাজ ছিল না তার। কেউ কোনো কাজ দেয়নি তাকে।

জামান খাঁ তাকে দেখছিল। হয়তো তারই মতো ভাবছিল। যাকে কোনো কাজ দেওয়া হয়নি তাকে কাজের কথা জিজ্ঞাসা করলে কি আর বলবে? নিশ্চয়ই চুপ ক'রে থাকবে।

বলেছিল : দেখ সেফি, তোর একটা কাজের ব্যবস্থা আমি করেছি। ওই কাজটাই তোকে আমি দেব। লেকিন, হুঁশিয়ার—বেইমানী করবার চেষ্টা করবি না।

সর্দারের কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল। আঘাত পেয়েছিল। কুঁকড়ে উঠেছিল মনটা। সর্দার যে এমন কথা বলবে ভাবতে পারেনি। কারণ, সেদিন তার মনটা চিন্তাশূন্য, খুশি ছিল। একটু আনন্দের ছোঁয়া। নিজেকে সে মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল।

তবু সর্দারের কথায় আঘাত পেলেও রাগ হয়নি তার। সর্দারের ওপর রাগ করা যায় না। অধিকার নেই। ধরুক-মারুক-কাটুক, তার যা ইচ্ছা করুক, তবুও।

কারণ···। কারণ অনেক। জামান খাঁর কাছে জিন্দিগিটা তার বিকিয়ে আছে। তার জিন্দিগির মালিক তো সর্দার।

হ্যাঁ, সর্দার—পাইক-সর্দার জামান খাঁ তার মালিক।

বা-প-মা-মরা না-খেতে-পাওয়া পথে পথে ঘুরে বেড়ানো একটা ছেলে। কুত্তার মতো সমস্ত জীবনটাই হয়তো কাটতো। হয়নি।

যে জামান খাঁয়ের পরিচয় অন্যের কাছে স্বার্থপর-শয়তান, সফির সে রক্ষাকর্তা। জীবনদাতা, প্রভু। সফিকে সে বাঁচিয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, দু'বেলা ভরপেট খেতে দিয়েছে। ভুখা পেট, কংকালসার জীর্ণ দেহটাকে সবল সুস্থ ক'রে তুলেছে।

হয়তো বলা যায়, ভাবা যায়, চিন্তা করতেও হয়তো বাধা নেই—মানুষ উপলক্ষ মাত্র। কে-কাকে দেখে, কে খেতে দেয়? খোদার দুনিয়ায় মানুষ কী করতে পারে?

খোদা ইচ্ছে করলে রাখেন, না হ'লে খতম ক'রে দেন। মানুষের কিছু করার, ধরে রাখার সাধ্য কোথায়? মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই। মানুষ উপলক্ষ মাত্র। মেহেরবান-খোদার ইচ্ছেতেই চলছে সবকিছু।

সফিকে জিন্দা রাখতে জামান খাঁও তেমনি উপলক্ষ। আসলে খোদাই সব করছেন। জামান খাঁ বাধ্য হয়েছে করতে।

না, সে কথা মেনে নিতে পারেনি সফি। মনে যে হয়নি তা নয়, মাঝে মাঝে অত্যাচারের মাত্রাটা চরমে উঠলে সে কথা মনে হয়েছে। ইচ্ছে হয়েছে পালিয়ে যায় কোথাও বা সুযোগ বুঝে······

আর সঙ্গে সঙ্গে অর্তনাদ ক'রে উঠেছে সফির অন্তরাত্মা! বিবেকের কশাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। শক্ত হাতে চিন্তার টুঁটি চেপে ধরেছে। আল্লার নামে কসম খেয়েছে। শপথ করেছে, জীবনে কখনো, কোনোদিন সর্দারের অমঙ্গল চিন্তা করবে না।

প্রতিজ্ঞা পালন করেছে। ক'টা বছরে, তার জোয়ান জীবনটাতেও সর্দারের 'কু' কখনো ভাবেনি। প্রতিটি আদেশ নীরবে, নির্বিবাদে মেনে নিয়ে পালন করার চেষ্টা করেছে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করেনি। কারণ, তার মনে হয়েছে, বিচারের অধিকার তার নেই।

তবু সেই প্রথম সর্দারের মুখে অমন শক্ত এবং তীক্ষ্ণ কথা শুনে একটু বিস্মিত হয়েছিল বৈকি। তার অন্ধবিশ্বাস বোধটায় আঘাত লেগেছিল। যেখানে পদে পদে বেইমানী, সেখানে তার প্রতি কথাটা প্রয়োগে নিজেকে তার ছোট মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, সে নিজে মনে-প্রাণে সাচ্চা থাকলেও সর্দার তাকেও বিশ্বাস করে না। বেইমান ভাবে!

হয়তো দোষ তার নিজের। হয়তো বা নসিব।

সর্দারের সব আঘাত-অত্যাচার নীরবে মেনে নেয়। প্রতিবাদ করে না। যন্ত্রণায় কাতরোক্তিটুকু পর্যন্ত না।

পোষা জন্তুও আঘাতের মুহূর্তে যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে, আঘাত এড়াতে পালিয়ে যাবার চেষ্টাও করে।

কিন্তু সে?

একটা জন্তুর চেয়েও অধম। তাই মনে হয়েছে তার। সর্দারের কাছে একটা মনুষ্যত্বহীন পশুর চেয়েও অধম ব্যবহার তাকে নিরুপায়, ব্যথিত করেছে। সর্দার নিজের অক্ষমতা আর নিস্ফল আক্রোশে অস্থির হয়ে অনেকবার অমানুষিক ব্যবহার করেছে। যাকে সামনে পেয়েছে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়েছে, মেরেছে।

সর্দারের স্বরূপ সকলের জানা। সময়ে সাবধান হয়েছে সবাই। দূরে সরে গেছে। সামনে আসেনি।

আর সফি?

না, পালায়নি সে। সর্দারের রুদ্র মূর্তি এতোটুকু ভয় জাগায়নি তার মনে। সাবধান হবার চেষ্টাটুকু পর্যন্ত করেনি। ফলে, হাতের কাছে পেয়ে সর্দার তাকে ধরেছে, গালি দিয়েছে, মেরেছে।

পিঠ পেতে দিয়েছে সে। আঘাত সহ্য করেছে। এতোটুকু কাতরোক্তি পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি।

পরে সর্দারের ব্যবহার আর নিজের নির্বোধ আচরণের কথা মনে পড়েছে। ন্যায়-অন্যায় বোধটুকু মাথা তুলতে চেয়েছে। ভেবেছে। না, ভাবনার টুঁটি টিপে ধরেছে সফি। খোদাকে ডেকেছে। গুনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। অন্নদাতা প্রভুর সম্বন্ধে গলতি চিন্তা করা কসুর। তার আব্বা, আম্মা তাকে পয়দা করলেও দুনিয়ায় জিন্দা রেখেছে তাকে সর্দার। খোদার চেয়েও সর্দার তার কাছে অনেক—অনেক বড়।

বেইমানী সে করবে না।

সর্দার বলেছিল: দেখ সফি, তোকে আমি বিশ্বাস করি, আর সেই জন্যেই···

: কাজটা কি? বাধা দিয়ে কাজের কথাটা জানতে চেয়েছিল সফি। তার প্রতি সর্দারের সত্যকারের বিশ্বাস বোধটার স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু কোনারকম উৎসাহ প্রকাশ করেনি।

সর্দার বুঝি তার সন্থ আঘাত পাওয়া মনটার নিরাসক্ত ভাবটা অনুভব করতে পেরেছিল। একটুক্ষণ তীক্ষ্ণ-ধূর্ত চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল: কি হ'ল তোর?

সফি চুপ ক'রে ছিল।

: কী রে? আবার জানতে চেয়েছিল সর্দার।

: কি? কথা বলেছিল সে।

: তবিয়ত খারাপ?

: না।

: তবে?

সে প্রশ্নের জবাব দেয়নি। বলেছিল: কাজটা কি?

এবার সর্দার যেন গম্ভীর হয়েছিল। গম্ভীরভাবেই বলেছিল: বলছি।

বলছি ব'লে কিন্তু অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ছিল সর্দার। কি যেন ভাবছিল। ভাবতে ভাবতেই কোমরে গোঁজা হাতীর দাঁতের বাঁটওলা ছুরিটা বার ক'রে নাড়াচাড়া করছিল।

দাঁড়িয়েছিল সফি। সর্দারের কাছ থেকে একটু তফাতে। ঠিক পেছনে শিরীষের ছোট্ট একটা চারা মাথা তুলেছিল; কচি সবুজ পাতা আর সরু-সরু ডাল। তার খোলা পিঠের একটা অংশে স্পর্শ অনুভব করছিল। আলতো, নরম আর মিষ্টি স্পর্শ। বাচ্চা শিশুর কচি আঙুলের সুড়সুড়ির মতো।

ছুরিটা নিয়ে নিজের মনেই নাড়াচাড়া করছিল সর্দার। সফি অপেক্ষায় ছিল। সর্দার কি বলে ভাববার চেষ্টা করছিল সে।

হঠাৎ এক সময় সর্দার তার হাতের ছুরিটা গাছটা লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে দিয়েছিল। অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুরিটা গিয়ে বিদ্ধ করেছিল শিশু শিরীষের কচি একটা ডাল। আর নিজের মনেই সর্দার হেসে উঠেছিল হাঃ হাঃ ক'রে।

সফি যদি অন্যমনস্ক না থাকতো, যদি সে সর্দারের হাতের ছুরিটার প্রতি লক্ষ্য রেখে সাবধানতা অবলম্বন করতে যেত, তাহলে নিশ্চয়ই একটা অঘটন ঘটতো।

তা ঘটেনি। আর সেও তার মনের আতংকটাকে বুকে চেপে ছুরিটা এনে তুলে দিয়েছিল সর্দারের হাতে। আর ছুরিটাকে সেই কচি আর সরু ডালটা থেকে খুলে নেওয়ার পরক্ষণেই ডালটা ঝুলে পড়েছিল। হয়তো এতোদিনে শুকিয়ে গেছে।

ছুরিটা হাতে নিয়ে হাসি থামিয়েছিল সর্দার। তার চোখের দিকে চেয়ে বলেছিল : তুই কাল আমার সঙ্গে যাবি।

কোথায় যেতে হবে, সে প্রশ্ন করেনি। কিছু জানার মতো উৎসাহ আর অবশিষ্ট ছিল না। ভয়ে নয়, একটা অবসাদ ভাব গ্রাস করেছিল তাকে।

সর্দার বলেছিল : সুলতানের পাহারাদার হবি তুই।

সে নীরব ছিল।

সর্দার কথা বলেছিল। তার দায়িত্বটা জানিয়ে দিয়েছিল। বলেছিলঃ আমি তোর হয়ে জবান দিয়েছি। হুঁশিয়ার হয়ে নিজের কাজ করবি। ঝুটা কিছু লক্ষ্য করবি না। নজরে রাখবি সুলতানকে। আর কাউকে দুশমন মনে হ'লে জান খতম ক'রে দিবি।

ঃ কেন? ইচ্ছা না করলেও কথা বলতে হয়েছিল।

ঃ এই তোর কাজ। মসনদ নিয়ে কুত্তার মতো কামড়া-কামড়ি বন্ধ করতে হবে। খোজা না হয়েও জানানা মহল পর্যন্ত এক্তিয়ার তোর। লেকিন……

সর্দার থেমেছিল। তার মুখের দিকে চেয়েছিল। কি যেন দেখতে চেয়েছিল সে মুখে। পায়নি। ব্যর্থ হয়ে বলেছিলঃ আমার কথা বুঝতে পারলি?

কী বুঝেছিল সফি? তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা কষ্ট অনুভব করছিল। নিজের কষ্ট সম্বন্ধে অস্পষ্টতা ছিল না।

সুলতানের দেহরক্ষী নিযুক্ত হচ্ছে সে। জবান দিয়েছে সর্দার। সৈফুদ্দীনের কাছে আল্লার নামে কসম খেয়েছে। কতো বড় বিশ্বাস তার প্রতি জামান খাঁর।

কঠিন কর্তব্য!

বিস্ময়! একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের হারেমে প্রবেশের অধিকার লাভ। অনধিকার প্রবেশ। যা একমাত্র খোজাদের অধিকারে।

এছাড়া হয়তো অন্য কোনো উপায় ছিল না। পাইকের দল রাত্রের অন্ধকারে সুলতানকে পাহারা দেয় সমস্ত হারেম ঘিরে। কারো পক্ষে সম্ভব হয় না বাইরে থেকে আসার। তবু খুন হ'ন সুলতান। রাতের অন্ধকারে হাজার জোড়া সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে কে যেন বুকের গভীরে বসিয়ে দেয় আমূল ছুরিকা।

কে দেয় বুঝতে পারলেও ধরা সম্ভব হয় না। হত্যাকারী যে ভেতরেই থাকে। অর্থের বিনিময়ে সামান্য কাজটুকু সহজেই করতে পারে সে।

আর সেইজন্যেই নতুন ব্যবস্থা। সৈফুদ্দীনকে বাঁচাতেই হবে। হারেমের নিয়ম ভঙ্গ। হয়তো বা তাকেও খোজা ব'লে মিথ্যা পরিচয়ে পরিচিত করা হয়েছে। জানেন সুলতান। সেইজন্যে কসম খেয়েছে জামান খাঁ। সৈফুদ্দীনকে জবান দিয়েছে। তার সততার, বিশ্বাসের।

জামান খাঁ বলেছিল ঃ তোকে আমি বিশ্বাস করি। জানি, তুই বেইমানী করবি না। আমি সুলতানকে জবান দিয়েছি।

ঃ কেন ? প্রশ্নটা করার ইচ্ছা ছিল না। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল তার। যেন পরীক্ষা করতে চেয়েছিল সর্দারকে।

জামান খাঁ বলেছিল ঃ আমি যে তোকে চিনি!

সফি কথা বলেনি আর। সর্দারকে দেখছিল। বিশ্বাসের ছবিটা সত্যি-সত্যিই জামান খাঁর মুখে-চোখে ফুটে উঠেছিল।

বলেছিল ঃ জানানা মহলে যাবি, লেকিন কোনোদিকে চাইবি না। বে-সরম ছুকরিগুলো যদি উলঙ্গ হয়ে পড়ে থাকে, দেখবি না। আর, সুলতান যদি বে-সরম হন তবু নজর রাখবি তাঁর ওপর। যদি কিছু দেখে সরম লাগে, তবভি দেখবি। সুলতান ছুট্টি দিলে ছুট্টি। লেকিন রাতে ছুট্টি নেই। তোর কাম রাতে।

সর্দারের হুকুম মেনে নিয়েছে সফি। প্রতিবাদ করেনি, কিন্তু ভয় পেয়েছে। আর তার ভয়টা যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ পেতেও বেশি দেরি হয়নি।

॥ দুই ॥

একটা নতুন জগৎ। আজব দুনিয়ার মাঝে বিচিত্র জীবন শুরু হয়েছে তার। দিনে রাতে সর্বদা সশংকচিত্ত। ভয় আর ভয়। লজ্জার চেয়ে ঘৃণা বেশি।

জানানা মহল রূপের হাট নয়, নরক!

যদিও সফির নারীসম্বন্ধে ধারণা কম, তবু নারীর নতুন রূপ দেখে আতংকে শিউরে উঠেছে। যেখানে বাইরের পুরুষের প্রবেশ অধিকার নেই, সব সময় ঢাক-ঢাক, সেখানে যে এমন বে-আব্রু তা কে জানতো!

লজ্জা, সরম যেন শুধুমাত্র মুখের কথা। আতংক জাগে। সব সময় আপন কর্তব্য আর সর্দারের হুঁশিয়ারী সম্বন্ধে সচেতন থেকেও নিজের মনকে সংযত রাখা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

হয়তো এ তার গুনাহ। কিন্তু এই গুনাহের হাত থেকে নিষ্কৃতির পথ তার জানা নেই। আর সেইজন্যেই তার মনটা অস্থির, চঞ্চল, কিছুটা বিক্ষিপ্ত। বাইরের ব্যবহার রুক্ষ। একটা যন্ত্রণাকাতর কাঠিন্য!

মুক্তির কথাও চিন্তা করেছে সফি। দূরের কোনো দেশ, অজানা পথ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ভয় নেই। কিন্তু বেইমানী আছে।

সর্দারের সঙ্গে বেইমানী করতে হয়। কুত্তার জীবন থেকে যে তাকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। যাকে অনেকে স্বার্থপর বেইমান ভাবে। একমাত্র ভরসা রাখেন সুলতান। পাইক-সর্দার জামান খাঁ সৈফুদ্দীনের জিন্দিগিটাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছে।

গৌড়ের মসনদ ঘিরে সুলতানদের এই অস্থায়ী খেলা শেষ করতে চায়। দু'পাঁচ, দশদিন বা দু'একমাসের সুলতানির স্থায়িত্ব চায়।

কারণ এতে রোজ-রোজ ঝামেলা। সবাই সুলতান হয়ে বসতে চায়। ওই ছোট্ট মসনদটার ওপর সকলের দৃষ্টি। যে একবার কাছে গেছে, ভাল ক'রে দেখেছে, তারই লোভ জেগেছে মনে। সেই পাগল হয়েছে ওটার জন্যে।

অথচ বেশ জানে, ওখানে একবার বসলে যে বসে থাকতে পারবে, তার ঠিক নেই। আজ আছে কাল নাও থাকতে পারে।

জানে সকলেই। তবু ছোটে। সুলতান হয়ে মসনদে বসার জন্যে নয়, প্রাণভরে সুলতানি জীবনটাকে উপভোগ করবে ব'লে। অঢেল ঐশ্বর্য আর উপভোগের বন্যায় ভাসবে ব'লে। মৃত্যু যদি আসে আসুক। ক'দিন তো জীবনটাকে ভোগ ক'রে নিতে পারবে!

লোভ, লালসা মোহ। অন্ধ হয়ে ছুটে যায়। ভুলে যায় ভবিষ্যতের কথা। হয়তো বা সেকথা মনেই পড়ে না। জীবনের মুল্যটাকে তুচ্ছ মনে হয়।

তাই তো দেখেছে সফি। ক'টা বছরে ওই মসনদটায় ক'জন মানুষ বসল। শেষ হ'ল। স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না কেউই।

হয়তো পারেও না। বসে থাকার উপায় নেই ব'লেই পারে না। ওখানে যে শক্তির লড়াই। স্বার্থের দ্বন্দ্ব। লোভে পাগল হয়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বিচার-বিবেক-বুদ্ধি বিসর্জন দেয়। মনুষত্বকে দূরে সরিয়ে রাখে।

আর এই জন্যেই মসনদটাকে তার অভিশপ্ত ব'লে মনে হয়। লোভ আর লালসার আগুন যেন ওই ছোট্ট মসনদটা। মানুষের সাধ্য কি দূরে সরে থাকে!

জামান খাঁ কিন্তু তার স্বার্থের কথাটা স্পষ্ট ক'রেই বলেছিল। বলেছিল: হররোজ এই ঝুট-ঝামেলা আর ভালো লাগে না। একজন জান দিয়ে সুলতানি খতম করলে লোকসান বড় কম নয়। পাইক-

সর্দার জামান খাঁর ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি চলে। হুঁশিয়ার থাকবি। সুলতান যদি খতম হন তাহলে তোর কসুর আমিও মাপ করবো না। রাতের বেলা যে সুলতানের ঘরের দিকে যাবার চেষ্টা করবে তাকেই খতম ক'রে দিবি। জান পয়ছান, চিন্তা-ভাবনার কোনো দরকার নেই। জানানা-মরদানা দেখবি না।

সর্দারের কথাগুলো ভেবেছে সফি। তার দায়িত্বের কথাটাও। তৈরি থেকেছে। রাতের অন্ধকারে সতর্কভাবে সুলতানের কক্ষটা পাহারা দিয়েছে। কোথাও একটু শব্দ হ'লেই চমকে উঠেছে। বুক কেঁপেছে। কোমরে ঝোলান তলোয়ারটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেছে।

একদিন রাতে তো একটা বিশ্রী কেলেংকারী হয়ে যেত। একটা নিরীহ প্রাণীকে নিশ্চয়ই খতম ক'রে দিত। ফলে কি হ'ত জানে না। তবে, ভাল কিছু নিশ্চয়ই হ'ত না।

সেদিনও প্রতিরাতের মতোই পাহারায় ছিল সে। রাতটা তখন বেশ গভীর হয়েছে। কালো অন্ধকার রাত। আলো ছিল কিন্তু ছায়া-ছায়া ভাব। অপরিসর অলিন্দ পথটায় দিনে রাতে সব সময় কেমন যেন ছায়া ঘনিয়ে থাকে। সব দিকে নজর চলে না ঠিকমতো।

শরীরটা ভালো ছিল না। সকাল থেকেই একটা ম্যাজ-মেজে ভাব। বুখারও যেন হয়েছিল একটু। গ্রাহ্য করেনি। শুধু দিনে খাওয়াটা বন্ধ করেছিল। সন্ধ্যের দিকে একটু খিদে পেতে, ভালো না লাগলেও সামান্য কিছু খেয়ে এসেছিল।

সুলতানের ঘরটা সেদিন অন্য সন্ধ্যার মতো ফাঁকা পড়েছিল না। দেখেছিল সেই সন্ধ্যাতেই সুলতান তাঁর ঘরে রয়েছেন। বেগম সাহেবাও। মৃদুকণ্ঠে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করছিলেন তাঁরা। পদশব্দে সুলতান প্রশ্ন করেছিলেন ঃ কে ?

সফি নিজের নাম বলেছিল।

ঃ আভি—আভি চলা আয়া ?

: জী, হাঁ। কথাটা ব'লে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গাটায় ফিরে এসেছিল।

স্থানটা নিজেই পছন্দ করেছিল সে। দুই অলিন্দের মধ্যভাগ। যেখান থেকে সুলতানের কক্ষ আর প্রবেশ পথটা ভালোভাবে দেখা যায়।

সে রাতে অনেকক্ষণ জেগেছিল সে। বসে বসে কালো আসমানের বুকে সিতারাদের অসংখ্য নীল-নীল বিন্দুগুলোকে লক্ষ্য করেছিল। তারপর কখন কেমন ক'রে ক্লান্ত দেহটার দু' চোখের পাতায় তন্দ্রার ঘোর ঘনিয়ে এসেছিল জানতেও পারেনি। হয়তো গভীর ঘুমে রাত ভোর হয়ে যেত।

কিন্তু হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল তার। কি এক বিপদ আশংকায় সতর্ক হয়ে উঠেছিল মুহূর্ত মধ্যে। কোষমুক্ত করেছিল তলোয়ার।

মৃদু একটা শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে এসেছিল কাছে, আরও কাছে। আততায়ীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল সফি। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল অঘটন।

যাকে আঘাত হানবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, চকিতে তাকে সম্পূর্ণ হতভম্ব ক'রে ছুটে এলো সে। আর পর মুহূর্তেই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল হাসি। দুরন্ত হাসিতে ভেঙে পড়েছিল সফি।

সেই অন্ধকার নিস্তব্ধ রাতে অট্টহাসিতে ঘুম ভেঙে ভয় পেয়েছিলেন সুলতান। ক'বার সফির নাম ধরে ডেকেছিলেন। সাড়া না পেয়ে বাইরে ছুটে এসেছিলেন। পিছনে বেগম সাহেবাও।

আর তখন বেগম সাহেবার কোলে সেই আগন্তুক। ক্ষণপূর্বে যাকে আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল সফি। বেগম সাহেবার তুর্কী বিল্লীটা। কালো, লোমশ, বিরাট দেহ। নীল-নীল দু'টো চোখ, ধারাল নখ, বাঘের থাবা যেন সামনের দুই পা। বেগম সাহেবার বড় পেয়ারের বিল্লী।

আর বিল্লীটাকে শত্রুজ্ঞানে যদি সে আঘাত করতো, যদি খতম ক'রে দিত, তাহলে তার নসিবে কি ঘটতো সে জানে না।

কিন্তু তাকে ওই ভাবে হাসতে দেখে সৈফুদ্দীন বলেছিলেন: ক্যা হুয়া, সফি ?

: কুছ নেহি জনাব। বাধ্য হয়ে হাসি থামিয়ে কথা বলতে হয়েছিল।

: তব ? সৈফুদ্দীন যেন সন্তুষ্ট হ'তে পারেননি। কেমন যেন একটু সন্দেহের ছায়া ঘনিয়েছিল তাঁর দুই চোখে।

সফি কোনো কথা বলতে পারেনি।

: হাসতা কিঁউ ? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

: জী !

: হাসছিলে কেন তুমি ? একটু অধৈর্য হয়েছিলেন তিনি।

: ওই যে! বেগম সাহেবার কোলে বিল্লীটাকে দেখিয়ে দিয়েছিল।

সৈফুদ্দীন দেখেছিলেন। বেগম সাহেবা সেটাকে আরও চেপে ধরেছিলেন। তবু তিনি বলেছিলেন: কী হয়েছে ?

ঘটনাটা বলেছিল সফি। শুনে সৈফুদ্দীনও অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। বেগম সাহেবা বিল্লীটাকে বুকে চেপে ছুটে চলে গিয়েছিলেন কক্ষে।

আর সুলতান একসময় হাসির বেগটাকে সংযত ক'রে তার দিকে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন: সাচ বলছো, তুমি ওটাকে খতম ক'রে দিতে ?

: জী হাঁ। সত্যি কথাটাই স্বীকার করেছিল সফি। সে যা করতো তাই বলেছিল।

: ক্যাহে ?

একটু বেশ, তীক্ষ্ণ হয়েছিলেন সৈফুদ্দীন। যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না সফির কথাটা।

সফি কিন্তু চুপ ক'রে থাকেনি এবার। বলেছিল : কেমন ক'রে বুঝবো ও আদমী নয়, জানোয়ার।

: আদমী হো-তো ? সৈফুদ্দীন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন।

: খতম ক'রে দিতুম। বলেছিল সফি। স্পষ্টভাবে কথাটা উচ্চারণ করেছিল। একটু ভাবেনি। এতোটুকু গলা কাঁপেনি তার।

আর তারপরে সৈফুদ্দীন কথা বলেননি। আর কিছু জানতে চাননি। ধীরে ধীরে কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।

সফি চলে এসেছিল নিজের জায়গায়। এসে বসেছিল। ঘুমটা পালিয়ে গিয়েছিল। আসমানের তারা গোনা শুরু করেছিল।

রাতের অন্ধকার পার হয়ে সূর্য উঠেছিল এক সময়।

সুলতানের দেহরক্ষী সফি। সুলতানকে বাঁচানো, আততায়ীর হাত থেকে তাঁর জীবন রক্ষা করাই তার কাজ। আর এর জন্যে যদি তাকে মানুষ মারতে হয়—আততায়ী ভেবে ভুল ক'রে যদি কাউকে খুন করে তাতেও কিছু যায় আসে না। রাতের অন্ধকারে বা দিনের আলোয়, তার যখন খুশি যাকে ইচ্ছে খুন করতে পারে। ইচ্ছে করলেই সে জান নিতে পারে একটা মানুষের।

সত্যিই তাই। সেই রকম হুকুমই আছে তার ওপর। জামান খাঁ তাকে বলেছে, দিনে রাতে যাকেই সুলতানের দুশমন ব'লে মনে হবে খতম ক'রে দেবে। আর রাতের বেলা জানানা-মরদানাও যেন না দেখে।

তেমন প্রয়োজন অবশ্য হয়নি। এ কাজে কারো জান খতম করতে হয়নি। এই দু'টো বছরে সুলতানের ঘরের আশে-পাশে একজনকেও দেখতে পায়নি। যদি কোনো দিন দেখে, প্রয়োজন হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সে জান নিতে দ্বিধা করবে না।

আর এই সিদ্ধান্তে আসতে অনেক চিন্তা করেছে সফি। অনেক ভেবেছে। মনটাকে ঠিক করেছে তবে।

শুধু কর্তব্য পালন নয়। শুধু নোকরির জন্যেই সুলতানের গুপ্ত-ঘাতক সন্দেহে কোনো মানুষের জান সে নিশ্চয়ই নিতে পারতো না। নেবে, মানুষ সৈফুদ্দীনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই। কারণ, তাঁর মতো মানুষের বেঁচে থাকা দরকার। খোদার দুনিয়ায় মানুষের প্রকৃত বন্ধু তিনি।

সফির অন্ততঃ তাই মনে হয়েছে। তাঁকে ভালোবেসেছে, শ্রদ্ধা করেছে। খোদার কাছে তাঁর মঙ্গল কামনা পর্যন্ত জানিয়েছে।

অনেকের মুখে আগের সুলতানদের অনেক কথাই শুনেছে সফি। জেনেছে কীর্তি-কাহিনী। জানানা মহল জ্বলন্ত সাক্ষ্য। জেনেছে তাঁদের লোভ-লালসা, অনাচার আর পাপে ভরা কাহিনী।

সেখানে আজও নীরবে চোখের জল মোছে অনেকে। বাপ-মা, ভাই-বোনের জন্যে, কেউ বা স্বামী-সংসার, পুত্র-কন্যার জন্যে। অভিশাপ দেয়, হতাশায় ক্লান্তিতে চোখের জলে বুক ভাসায়।

আবার কেউ পাপের খেলায়, যৌবনের দাহে বিকৃত, নগ্ন। লজ্জা-সরম-আব্রুহীনা! খোজাগুলোর সঙ্গে জন্তুর মতো ব্যবহার করে। বাঁদীদের ওপর করে অকথ্য অত্যাচার। কখনো এমন অত্যাচার করে যা চোখে দেখা যায় না। চোখে জল ঝরে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে সমস্ত শরীর, কিন্তু কাঁদবার উপায় নেই। নীরবে শুধু সহ্য করে যন্ত্রণা। না হ'লে শাস্তির মাত্রা চরমসীমা অতিক্রম করবে।

এমনি অনেক ঘটনাই নজরে পড়েছে তার। দেখতে না চাইলেও দেখতে হয়েছে। হয়তো বা বয়েসের দোষে মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছে। ইচ্ছে করেছে এই নিষ্ঠুর অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করে। লাথি মেরে শেষ ক'রে দেয় বিকৃত যৌবনা নাগিনীগুলোকে।

কিন্তু সম্ভব হয়নি তা। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করেছে। মনে পড়েছে সর্দারের সতর্কবাণী। সর্দার তাকে বারবার সতর্ক ক'রে দিয়েছে।

শুনে হেসেছে জামান খাঁ। বলেছে : মাথা গরম করিস্‌নি।

লেকিন……। প্রতিবাদ করতে গেছে সফি।

বাধা দিয়েছে সর্দার। বলেছে : কী করবি ?

: কী ? যেন জানতে চেয়েছে সে।

: আরও দেখতে পাবি।

: তব ?

: দেখবি।

: ক্যাহে ! যেন জবাব চেয়েছে সে। কেন দেখবে ? কেন দেখতে হবে তাকে ? আর প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গেই অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়েছে সর্দার। মুখটা কঠিন আকার ধারণ করেছে। বলেছেন : বুরা লাগে তোর ?

কথা বলেনি সফি। মাথা নেড়েছে। জানিয়েছে : সত্যিই তাই।

ভেবেছে জামান খাঁ। অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য আর কঠিনতা আস্তে আস্তে সহজ হয়েছে। গলাটা অত্যধিক শান্ত শুনিয়েছে। যেন নিজের মনেই বলেছে কথাটা, বদ নসিব।

সফি চুপ ক'রে থেকেছে। ভেবেছে। কার মন্দ ভাগ্য ? তার কি ? তারই। সে তো এমন চায়নি, এমন ভাবেওনি কোনোদিন।

কাজ চেয়েছিল সে। নিষ্কর্মা দিনগুলো মাঝে মাঝে তার অসহ্য বোধ হ'ত। মনে হ'ত কোনো কাজের মধ্যে, যে-কোনো কাজ—যদি নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারে তাহলে আরও ভালোভাবে নিশ্চয়ই দিনগুলো কেটে যেত তার।

কারণ কাজের আনন্দ সে দেখেছে, অনুভব করেছে। মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত্রি কাজ করছে। সময়ের অভাব পদে পদে। তবু হাসছে, প্রাণভরে গল্প করছে। এতোটুকু ক্লান্তি নেই, কোনো অবসাদ।

ভেবেছে। দেখেছে। কেমন ক'রে এমন সম্ভব হচ্ছে স্থির করতে পারেনি। কাজের মাঝেই মানুষ হাসে, গায়, গল্প করে। সে পারে

না। দিনে রাতের অখণ্ড অবসরের মাঝে কেন হাসতে পারে না। মনটা কেন হালকা হয়ে ওঠে না।

ঃ জামান খাঁ লক্ষ্য ক'রে বলেছে ঃ কি রে কী হ'ল তোর?

কি যে হয়েছে জানে না, তাই চুপ ক'রে থেকেছে।

ঃ তবিয়ত ঠিক নেই?

ঃ না—না।

ঃ তবে?

এই তবের উত্তর দিতে পারেনি। দেওয়া সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

কোনোদিন সর্দার বলেছে ঃ এবার তোর কাজ ঠিক ক'রে দেব!

কাজ! যেন লাফিয়ে উঠেছে সে। মনটা ভরে গেছে কাজের নামে। এই তো সে চায়। কাজ চায় তরুণ প্রাণটা।

কিন্তু সত্যি সত্যিই যেদিন কাজের ডাক এলো, সর্দার তার কাজ ঠিক করল, সেদিন মনটা খুশি হয়েও মুখ থুবড়ে পড়েছিল। জেনেছিল কাজের মধ্যে বেইমানী আছে। যার জন্যে সে পাগল হয়ে উঠেছিল। তার মনটাও।

সত্যিই এমন চায়নি সে। এমন কাজ। শান্তিতে ছিল, স্বস্তি ছিল। বেইমানীর ভয় ছিল না। ছিল না এমন নোংরামি।

জামান খাঁ এক সময় কথা বলেছিল। তার পিঠে হাত রেখে বলেছিল ঃ ওসব দেখবি না। নিজের কাজ করবি।

কিন্তু……

হেসেছিল সর্দার। বলেছিল ঃ ভয় পাস্‌নি। কী করবে ওরা!

সত্যিই তাই। কিছুই করার নেই ওদের। হতভাগিনীর দল।

প্রতিবাদ বা প্রতিকারের কোনো উপায় নেই। পথ রুদ্ধ। ওরা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে। পাগল হয়ে গেছে। বিকৃত, নরকের কীট যেন!

সফি ব্যর্থ! তাই না-দেখার চেষ্টা করেছে। চোখ পড়লে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। রাত্রি ছাড়া জানানা মহলের দিকে পা দেয়নি।

পূর্ববর্তী সুলতানদের অপকীর্তি। সুলতানি-দুনিয়ায় নিয়ম যেন! হোক অনিশ্চিত জীবন। মসনদের মতো জানানা মহলও অধিকারে। অভাব নেই নারী-দেহ। তবু, আরও চাই। আরও নিয়ে এসো। ঘর জ্বালিয়ে, লুঠ ক'রে, চুরি ক'রে যেমন ক'রেই হোক, যেখান থেকে পার নিয়ে এসো তাজা জওয়ানী। খুবসুরত জানানা।

ইনামের ছড়াছড়ি। অভাবও হয়নি। সুলতানদের পছন্দ হ'লে কাছে রেখেছে, ভোগ করেছে। না হ'লে পাঠিয়ে দিয়েছে বাঁদীমহলে। তুলে দিয়েছে পেয়ারের ইয়ার-দোস্ত, আমির-ওমরাহ্‌দের হাতে।

যারা একবার এসেছে ফিরে যায়নি। যাওয়ার উপায় নেই।

পথ বন্ধ!

সমাজের নাগপাশ। তার শাসন বড় কঠিন। হিন্দু-মুসলমানে তফাত নেই।

নারী ভোগের সামগ্রী। পুরুষ তার অধিকারী। তবু তাদেরই দোষ। পুরুষের অক্ষমতায় শাস্তি গ্রহণ করতে হয় নারীকে। ভাগ্য! নারীর ভাগ্য, জানানার নসিব। শুধু পীড়ন। পেয়ার-মহব্বৎ, ভালোবাসা দেহের উর্ধ্বে নয়। দেহটাকে নিয়েই বিচার। মনের কোনো বালাই নেই।

তাই সুলতানদের জানানা মহলের নরকুণ্ডে বন্দিনী নারী কাঁদে, মৃত্যু কামনা করে, কেউ বা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যায়। পাগলামী তাদের অনেক রকম। কেউ তারা সুস্থ, স্বাভাবিক নয়।

সফির তাই মনে হয়েছে। দীর্ঘ দু'বছরে নারীর অনেক রূপ প্রত্যক্ষ করেছে। যাকে মনে হয়েছে কামুকা, যৌনাভিলাষিণী তাকেই আবার নির্জনে সকলের অলক্ষ্যে ব্যর্থতার হাহাকারে ডুকরে কেঁদে উঠতেও দেখেছে। দেখেছে একদৃষ্টে আসমানের দিকে চেয়ে থাকতে, মুক্তির প্রহর গুণতে। দিনের আলো, মুক্তির আনন্দ—অন্ধকারে আচ্ছন্ন!

হাবশী সুলতান সৈফুদ্দীন এর ব্যতিক্রম।

তাই কি ?

নয়ই বা কেন ? হয়তো সচ্চরিত্রবান বলতে যা বোঝায় তা তিনি নন। তিনি শরাব খান। জানানা মহলে ভোগের জন্যে যান। কিন্তু এই দু'টো বছর পার হয়ে তিন বছরের সুলতানি জীবন তাঁর। এই তিন বছর ছায়ার মতো সে তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জানানা মহলে নতুন কোনো নারীর আবির্ভাব ঘটেনি।

প্রজার ঘর জ্বালিয়ে, লুঠ ক'রে নিয়ে আসেননি নতুন কোনো নারী দেহ। বরং তেমন কোনো ঘটনার সংবাদ পেলে প্রতিকারের ব্যবস্থাই তিনি করেছেন।

আর এই জন্যেই কালো পাথরের গড়া একটা মূর্ত—কোমলে-কঠিনে মেশা একটা প্রৌঢ় মানুষ তাকে মুগ্ধ করে। বুঝি নিজের মনের অগোচরে কখনো ভালোবাসতেও শিখিয়েছে।

কিন্তু......

॥ তিন ॥

অসহ্য যন্ত্রণা !

সফির তাই মনে হ'ল। এখন, এই মুহূর্তে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠল সে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ করল।

আতংকে শিউরে উঠল সফি। দু'হাতে সমস্ত শক্তিতে বুকটাকে চেপে ধরল সে।

মধ্যরাত্রি। ফাল্গুনের সায়াহ্নকাল। শীতের মৃদু স্পর্শ। আকাশে নীলাভ তারকামণ্ডলী।

কক্ষদ্বার ঈষৎ মুক্ত। দৃষ্টি সঞ্চালনের ব্যবস্থা। রাতের প্রহরীর সুবিধার্থে এই নিয়ম। প্রয়োজনবোধে প্রবেশের অনুমতি আছে। সুলতান-ই দিয়েছেন। বেগম যদি এক শয্যায় থাকেন,—তবুও।

জান বড় বালাই। ক্ষণস্থায়ী সুলতানির স্বপ্ন কখন্ শেষ হয়ে যায় কে বলতে পারে!

কক্ষটা বহুদিনের পরিত্যক্ত। কারণ, আয়তনে বিশাল নয়। আলো-বাতাস কম। চলাচলের পথও অপ্রশস্ত।

কিন্তু মসনদে বসবার পর সৈফুদ্দীন তাঁর রাত্রিবাসের জন্যে কক্ষটাকে মনোনীত করেছিলেন। জানানা মহলের শেষ প্রান্তের কক্ষগুলোতে আপন পরিবার পরিজনদের এনে তুললেন। নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করলেন এই কক্ষটাকে। এতে বেগম যে খুশি নয়, তা তিনি জানেন। কিন্তু কিছুটা নিশ্চিন্ত তিনি। কারণ যাতায়াতের পথ একটিমাত্র।

অনেকক্ষণ পরে সেই ঈষৎ উন্মুক্ত দ্বারপথে কক্ষের মধ্যে দৃষ্টিটাকে সঞ্চালন করল সফি। সেজবাতির মৃদু আলোয় ভেতরটা আলো-আঁধারীতে পূর্ণ। মধ্যে পালংকে নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত সুলতান। তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে বাতাসটা ভারী।

আজ তিনি একাকী নিদ্রিত। বেগমের ডাক পড়েনি আজ। এমন অনেক দিনই যায়, যেদিনগুলোতে একাই ঘুমান তিনি।

জানানা মহলে অন্য জানানাদের কাছে তিনি যে যান না তা নয়। সুলতানি জীবনটাতে ক'জনকে শাদি ক'রে বেগমের মর্যাদাও দিয়েছেন। কিন্তু এককক্ষে তাদের কারো প্রবেশাধিকার নেই। এককক্ষ ভিন্ন অন্য কোথাও রাত্রিবাসও তিনি করেন না।

পদে পদে সাবধানতা অবলম্বন। হিসাবের এতোটুকু ভুল নেই। জীবনটাকে উপভোগ করেন অত্যন্ত সতর্কতায়।

এখানের সমস্ত দায়দায়িত্ব সফির। রাতের প্রহরী সে। সমস্ত রাত্রি নিজে জেগে সুলতানকে পাহারা দেয়। তাঁর জান বাঁচায়। শত্রু যে ঘরে-বাইরে। কাউকে বিশ্বাস নেই।

আছে খোজা প্রহরীর দল। তারা ছিল,—আছে। এখানে

প্রবেশ পথের সামনে তারাও পাহারা দেয়। পালা বদল হয় তাদের। একদল গিয়ে একদল আসে। পাহারা দেয়, জেগে থাকে।

সফি এখানে একা। সফি আর সুলতান। একজন জেগে থাকে, একজন ঘুমোয়। সবকিছু বিস্মৃত হয়ে পরম নিশ্চিন্তে।

সুলতান তাই বলেন। স্পষ্টভাবেই সেকথা বলেছিলেন তাকে। বলেছিলেন : জানিস্ সফি, আগে যারা সুলতান হয়েছিল, সুলতানি করতে গিয়ে মর্দা বনে ছিল যারা—তারা রাতে ঘুমোতো কিনা জানি না। আমার মনে হয় তারা ঘুমোতো না। ঘুম আসতো না তাদের চোখে।

সুলতানের কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারেনি সফি। একটু বা অবাক হয়েছিল। প্রশ্ন করেছিল : কেন?

তার প্রশ্ন শুনে সৈফুদ্দীন মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন : কেন?

: হ্যাঁ! ঘাড় নেড়েছিল সফি। সত্যিই সে জানতে চায়।

সৈফুদ্দীন একটু ভেবেছিলেন। চিন্তার রেখা ফুটেছিল তাঁর চোখে-মুখে। বলেছিলেন : হয়তো ভয়ে।

: ভয়?

: হ্যাঁ। জানের ভয়ে তারা ঘুমোতে পারতো না।

: কেন?

তিনি হেসেছিলেন। স্নেহের হাসি। ছেলেটার সরলতায় একটু যেন মুগ্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন : তারা যে খুনী ছিল।

: খুনী?

: হ্যাঁ, খুনী। খুন করেছিল তারা। হাতের রক্ত মুছে মসনদে চড়েছিল। লেকিন, রক্তের দাগটা যে তাদের মনে বসে গেছে। তাই ভয় পেত তারা। খুন হওয়ার ভয়। সারারাত ছটফট করতো। ঘুম আসতো না তাদের চোখে।

: আপ? সফি নয়, অন্য কেউ যেন প্রশ্নটা করেছিল। চমকে উঠেছিল সে।

সৈফুদ্দীন তার মুখের দিকে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন : আমি ?

সে মাথা নীচু করেছিল। উত্তর দিতে পারেনি।

: কি হ'ল ?

সে তবু চুপ করেছিল। মাথা তোলেনি।

: ডর মৎ। বলেছিলেন তিনি।

এবার সে মুখ তুলেছিল। তাঁর দিকে চেয়েছিল।

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন : আমার কথা তুমিই তো ভালো জানো।

সত্যিই তাই। তারই তো জানার কথা। সুলতান কি করেন, তিনি জেগে থাকেন না ঘুমান সেই তো দেখে।

এর পরে কিন্তু অন্য কথা বলেছিলেন তিনি। সত্যি কথা। বলেছিলেন : আমারও ভয় আছে। আমিও ভয় পেতাম।

সফির কেমন যেন গোলমাল ঠেকেছিল। কেমন যেন মনে হয়েছিল তার। একটু যেন সন্দেহ জেগেছিল মনের কোণটায়। মানুষটা স্বাভাবিক তো ? হয়তো নয়। যদি তাই হবে তাহলে এমন কথা বলছেন কেন। না, তার সঙ্গে দিল্লাগী করছেন !

তাই সন্দেহভরা দৃষ্টিতেই সুলতানের মুখের দিকে চেয়েছিল।

হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন : আমার কথা বুঝতে পারছো না, তাই তো ?

সফি 'হাঁ' 'না' কিছুই বলেনি।

: সত্যিই আমি ভয় পেতাম। বলেছিলেন তিনি : অনেক দিন এই ভয়টা আমাকে তাড়া ক'রে ফিরেছে। শয্যায় শুলেই কেমন যেন আতংক জাগতো মনে। ক্লান্ত দেহ, দু'চোখে অজস্র ঘুম, তবু ঘুমোতে পারতাম না। চুপ ক'রে চোখ বুজে পড়ে থাকতাম। মাঝে মাঝে চোখ মেলতাম। দেখতে চাইতাম আমি জিন্দা আছি তো ?

সফি যেন নতুন কথা শুনেছিল। মরার ভয় মনে নিয়ে একটা

মানুষের বেঁচে থাকার কথা। ঘুম এলেও যিনি ঘুমোতে পারতেন না। মৃত্যুর ভয়ে। বেঁচে থাকার জন্যে।

আমরা তো বাঁচতে চাই। মৃত্যু আসন্ন জেনেও বাঁচার চেষ্টা করি। শেষ চেষ্টা। মনের চেষ্টা। যে মনটা মরতে চায় না। মরতে ভয় পায়।

তিনি বলেছিলেন : সত্যিই আমি ভয়ে ঘুমোতে পারতাম না। লেকিন, একদিন ঘুমোতে পারলাম। সেই প্রথম অনেক দিন পরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলাম আমি। কেমন ক'রে জানো?

: কেমন ক'রে?

: তুমি আছ। আমার মন বললে ও তো রয়েছে, তুমি ঘুমোও। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভীষণভাবে চমকে উঠল সফি।

গত দিনের সেই বিশ্বাসঘাতক সন্ধ্যাটাকে মনে পড়ল তার। সমস্ত শরীরে আতংকজনিত শিহরণ অনুভব করল। কেমন যেন দুঃস্বপ্ন ব'লে বোধ হ'ল। মনে হ'ল ঘোরে কেটেছে। অস্বাভাবিক, নেশাগ্রস্তের মতো। আচ্ছন্ন চেতনা। যা শুনেছে তা যেন সত্য নয়!

কিন্তু নয় ভাবলেই বা অস্বীকার করে কেমন ক'রে? এখনও তার বাঁ হাতটার কব্জিতে টন্‌টনে ব্যথার ভাব। সেই ছদ্মবেশী আগন্তুকের অতর্কিত আক্রমণে এমন হয়েছে। হঠাৎই সে তার সতর্ক হবার আগেই বজ্রমুষ্টিতে বাঁ হাতের কব্জিটা চেপে ধরেছিল।

আর তা যদি না হ'ত, যদি ক্ষণপূর্বে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারতো, ঘটনাটা হয়তো অন্য ধারায় বয়ে যেত। কেলেংকারীর শেষ থাকতো না।

মনে পড়ল তার।

গতকালের দিন আর সন্ধ্যাটাকে। বিশেষত্ব ছিল না। আর পাঁচটা দিনের মতোই ছিল গতকালের দিনটা আর সন্ধ্যাটা। পরিচিত পরিবেশ। মানুষজন। দিনের হিসাব।

শুধুমাত্র খেয়ালের বশবর্তী হয়ে দিনের সূর্যডোবার অনেক আগে প্রাসাদের পশ্চিম প্রান্তের জীর্ণ পরিত্যক্ত ক'খানা ঘরের সমষ্টি, এককালের কবুতর কুঠিটায় ঘুরতে গিয়েছিল।

কবে, কতোদিন আগে, কোন্ সুলতান কবুতর কুঠি তৈরি করিয়েছিলেন জানে না সফি। জানার কৌতূহলও জাগেনি। শুধু দূর থেকে নীচু আর ছোট ছোট কিছু ঘরের সমষ্টি কবুতর-কুঠিকে অন্য সকলের মতোই চোখে দেখেছে।

কাল কি যেন হয়েছিল তার। মনটা ভালো ছিল না। কিছুই ভালো লাগছিল না। কেমন যেন বিষাদ। কষ্ট হচ্ছিল। একটু যন্ত্রণা। ঠিক আবার যন্ত্রণাও নয়। কেমন যেন। হাঁফ ধরার মতো। খোলা বাতাসেও নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ করছিল।

এমন মাঝে মাঝে হয়। বেশ আছে। কোনো কষ্ট নেই, যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই। মনটা খুশির ঢেউ-এ মাতাল না হ'লেও নিজের কাজ ক'রে যায়। অন্য কথা ভাবে না। অহেতুক কোনো চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় না মনে।

তারপর এমনি বেশ ভালো থাকতে থাকতে, নিজের কাজ করতে করতেই কিছুই আর ভালো লাগে না। একটা অস্বস্তি-অশান্তিতে ভোগে। মনটা জ্বলে, পোড়ে।

বুকটা ভার ভার লাগে। তিক্ত একটা বিস্বাদ জড়িয়ে থাকে যেন দেহ-মনে। জমিলা নামের কিশোরী মেয়েটা, যাকে মনে মনে পছন্দ করে, মনটা একটু হাসি-কটাক্ষের জন্যে লোভি হয়ে ওঠে—সেই মেয়েটা তখন যদি, কোনো কাজের অছিলায় কাছে আসে, হাসে, কটাক্ষ হানে তাহলেও ফিরে চায় না। মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

আর এজন্যে ভোগান্তি তারই। মনটা সহজ হ'লে, স্বাভাবিকতা ফিরলে পথ আগলায়। জমিলা মেয়েটা তখন অচেনা। চিনতে পারে না তাকে। কথা বলে না। পাশ কাটাতে চায়।

তখন বিস্মিত হয় সফি। জমিলার এমন ব্যবহারের অর্থটা

বোধগম্য হয় না। আঘাত পায় মনে। ডাকে ওকে। ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়।

জমিলা যেন শুনতে পায় না ওর কথা, ওর ডাক। নিজের কাজে চলে যায়। ফিরেও চায় না একবার।

আবার সেই অশান্তি। মনের চেয়ে দেহটা পোড়ে এবার। পুরুষত্বে যেন আঘাত লাগে। যেন অপমানিত বোধ করে নিজেকে।

আর খোঁজে সুযোগ। একটু নির্জনতা। মেয়েটাকে একটু একলা পাবার অপেক্ষায় থাকে। একটু একলা পেতে চায়।

যখন সে সুযোগ আসে তখন ধরে ওকে। ধরে জোর ক'রে। নিজের দেহের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে চায়। ওর দেহের নারীত্বের ঘ্রাণ আর আস্বাদ গ্রহণে পৌরুষটা মাথা তোলে।

আর এমনই আশ্চর্য কাণ্ড মেয়েটা কেমন ক'রে যেন অস্বাভাবিক শক্তি পায়। সেই শক্তিতে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। ছিটকে দূরে সরে যায়।

ব্যর্থ মুহূর্তে ঘন নিঃশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয় প্রশ্ন : কী হ'ল?

মেয়েটা চুপ ক'রে থাকে। শক্ত ক'রে থাকে ঘাড়টা।

আবার হাত ধরে সে। ডাকে : জমিলা।

: ছাড়!

: কেন?

: ছাড়!

: কেন?

: হাত ছাড় বলছি!

মেয়েটার কণ্ঠে যেন জাদু! একটু বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! ঠিক ভয় নয়, কেমন যেন বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়ে। হাত ধরতে আর সাহস করে না। কথা বলতেও ইচ্ছে হয় না। হয়তো অভিমানে, অপমানের লজ্জায়।

ক'টা দিন। দূরে সরে থাকে দু'জনে। পরস্পরকে এড়িয়ে চলে।

দেখা হ'লে চকিতে চায়। একদিন আর মুখ ঘুরিয়ে নেয় না, মাথা নীচু ক'রে নিজের কাজে চলে যায়।

তারপর অবশ্য সব ঠিক হয়ে যায়। আবার সহজ স্বাভাবিক। মেঘ কাটে। মনের বরফ গলে জল হয়। মান-অভিমানের ছেদ টানে।

অবশ্য সবকিছুই চোরের মতো চুপি চুপি। অগোচরে, অন্যের চোখ-কান বাঁচিয়ে। ধরা পড়ার ভয়। বেইমানীর শাস্তি প্রসঙ্গটাও ওঠে।

ভাবে, দূরে সরে থাকবে। পারে না। হয়তো বয়সের দোষ, যৌবনের ধর্ম। ভালোলাগা বা ভালোবাসার দিনগুলো নদীর স্রোতের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সে মুহূর্তগুলোতে কর্তব্য সম্পর্কে মনটা সচেতন থাকলেও মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশায়, কথা বলায় দোষ দেখতে পায় না। অন্যায়বোধ জাগে না। পরে কখনো বা জ্বালা বাড়ে, মনটা অস্থির হয়, নিজের ক'রে পেতে ইচ্ছে করে।

আবার কখনো বা বিচিত্র মনটা কেমন যেন উদাস নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। কোনো কিছুর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না। জগৎ-সংসার, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হয়। নিজের সম্বন্ধেও কেমন যেন আচ্ছন্ন চেতনা। সে যে একটা গোটা মানুষ—প্রাণ আছে তা ভুলে যায়। তখন যেদিকে মন চায় বেরিয়ে পড়ে। ঘুরে বেড়ায় আর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

গতকালও ঠিক এমনি হয়েছিল। একটা ছন্নছাড়া ভাব জেগে-ছিল মনের মধ্যে। কিছুই ভালো লাগেনি। অলস মন্থর পায়ে কবুতর-কুঠির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য নীরবে নির্জনে চুপচাপ কিছুক্ষণ নিজের মুখোমুখি বসে থাকা।

ক'খানা জীর্ণ নীচু ছোট ছোট ঘরের সমষ্টি। দু'ভাগে ভাগ করা। মাঝখানে ছাদে ওঠার সিঁড়ি। আবর্জনা আগাছাপূর্ণ।

তারই মাঝ দিয়ে সংকীর্ণ সিঁড়ি পথে ওপরে উঠেছিল সে। বাঁশের তৈরি একটা বিরাট মাচান, ক'টা কাঠের তৈরি ছোট-ছোট বাসা।

কালের ব্যবধানে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সেগুলোকে একপাশে সরিয়ে বসেছিল সফি।

বসেছিল অনেকক্ষণ। শীত শেষের আকাশে যতোক্ষণ রক্তজবার মতো রোদ্দুরটা ছিল, ততোক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখেছিল রঙের খেলা। ভালো বা মন্দ লাগার প্রশ্ন ওঠেনি। সময় কেটে গিয়েছিল। সন্ধ্যা হয়েছিল। আকাশে চাপ-চাপ কালো অন্ধকার। একটা দু'টো ক'রে তারা ফুটেছিল। অসংখ্য।

একসময় যেন সম্বিত ফিরে পেয়েছিল। মনটা শান্ত। অসুখী ভাবটা অনেকাংশে কমে গেছে। কাজের কথাটাও মনে পড়েছিল।

অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে নীচে নেমেছিল। নেমেও এসেছিল প্রায়। হঠাৎ কে যেন বজ্রমুষ্টিতে তার বাঁ হাতের কব্জিটা চেপে ধরেছিল। কিছু চিন্তা করার অবকাশ না দিয়ে দুর্গন্ধময় হিমশীতল অন্ধকারের মাঝে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

বাধা দিতে পারেনি। শুধু আর্তকণ্ঠে জানতে চেয়েছিল : কে!

: দোস্ত! চাপা অথচ সতর্ককণ্ঠে জানিয়েছিল আগন্তুক।

: দোস্ত?

: চুপ।

: লেকিন……

আগন্তুক আরো জোরে চেপে ধরেছিল তার কব্জিটা।

তারপর এক সময় শেষ প্রান্তের ঘরখানায় পৌঁছে হাত ছেড়েছিল। কব্জিটা টন্-টন্ করেছিল। হাতটা মুক্ত হ'তে ব্যথায় হাত বুলিয়েছিল সে। আর ভাবতে চেষ্টা করেছিল আগন্তুকের পরিচয় এবং এমন ব্যবহারের অর্থ।

ভয় যে করেনি তা নয়। মানুষ মাত্রেই ভয় পাওয়া জীব। যতোই সে দুঃসাহসী এবং জীবনের প্রতি মমতা-হারা হোক না কেন।

গুপ্ত আক্রমণে মৃত্যু অনিবার্য। বাধা দেওয়ার উপায় থাকে না। তাই আক্রমণকারী তার হাতটা ধরার মুহূর্তে সে কথা মনে

হ'লেও ভুল ভাঙতে দেরি হয়নি। আর সেই জন্যেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। যদি ইচ্ছে করতো তাহলে কোমরে গোঁজা ছুরিটা চালাতে দ্বিধা করতো না বা কষ্টকর হ'ত না। শুধু তাই নয়, ছোরা-ছুরি চালাতে হু'টি হাতই সমান পটু।

আর এখবরটুকু যে আগন্তুকের অজানা নয়, তার প্রমাণও পেয়েছিল। সবধান ক'রে বলেছিল : সাবধান, হাত চালিও না যেন!

নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে। আর যাই হোক তাকে খতম করার কোনো উদ্দেশ্য নেই।

কিন্তু—লোকটা কে?

কি পরিচয়?

দুর্গন্ধময় সেই নরককুণ্ডে পৌঁছবার পরমুহূর্তেই জানতে চেয়েছিল : কে তুমি?

: দোস্ত! তেমনি চাপা কণ্ঠস্বর তার।

: না। অস্বীকার করেছিল সফি। তাকে সে বন্ধু ব'লে মেনে নিতে পারেনি।

: ক্যাহে?

এবার উত্তর দেয়নি আর। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়েছিল। চিনতে পারেনি। অন্ধকারটা বড় কালো আর ভয়ংকর।

: কী হ'ল? আগন্তকই জানতে চেয়েছিল এক সময়।

: না।

: কী?

: দুশমন।

: না।

: হ্যাঁ।

একটু চুপ করেছিল আগন্তুক। বলেছিল : সত্যি, আমি দোস্ত তোমার।

: কে তুমি?

একটু যেন মৃদু হাসির শব্দ উঠেছিল। একটু সহজ স্বাভাবিকতা। এবার তার নাম ধরে ডেকে ছিল : সফি!

: কে?

: আমি।

: কে তুমি?

: চিনতে পারলে না? সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর। এতোটুকু অস্পষ্টতা ছিল না আর। বিস্ময়েরও শেষ ছিল না সফির। সে যেন স্বপ্ন দেখছে। আগন্তুক শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীন।

: শাহ্‌জাদা!

: হুঁ। তেমনি হাসির তরঙ্গ জেগেছিল নাসিরুদ্দীনের কণ্ঠে।

: আপনি! একটু বিমূঢ় যেন সে। মুহূর্তে সন্দেহ-জাগা চিন্তার কুণ্ডলীটা মাথার মধ্যে খেলে গিয়েছিল।

তারপর অনেকক্ষণ কথা বলতে পারেনি। কোনো প্রশ্ন! নাসিরুদ্দিনও চুপ করেছিল। সন্ধ্যার ভারী বাতাসটা হিস্-হিস্ শব্দ তুলে বয়ে গিয়েছিল। দুর্গন্ধ ছড়িয়েছিল কবুতর কুঠির ঘরখানায়।

অন্ধকারে ক'বার শাহ্‌জাদার মুখের দিকে চেয়েছিল, কিন্তু অন্ধকারে সেই কালো মুখখানার একটি রেখার সঙ্গেও পরিচিত হ'তে পারেনি।

একটু ভয়, আতংক—অস্বস্তি জেগেছিল। ভালো লাগছিল না তার। ইচ্ছে হচ্ছিল চলে আসে। তাছাড়া, সুলতানের কাছে উপস্থিত হবার সময়ও হয়েছিল।

আর সেইজন্যেই বাধ্য হয়ে নীরবতা ভঙ্গ করেছিল। মৃদুকণ্ঠে ডেকেছিল : শাহ্‌জাদা!

: উঃ! যেন সদ্য ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল নাসিরুদ্দিন।

: কিছু বলবেন?

: সফি!

: বলুন।

একখানা হাত এগিয়ে এসেছিল। দৃঢ়মুষ্টিতে এবার তার ডান হাতটা চেপে ধরেছিল নাসিরুদ্দীন। ডেকেছিল : সফি!

: বলুন।

: তোমাকে একটা কাজের ভার দিতে চাই আমি।

: আপনার কাজ?

: তোমারও বটে।

: বলুন।

: কসম খেতে হবে।

: কসম?

: হ্যাঁ।

: কিসের কসম?

: যে কাজ, তার কথা আমি আর তুমি ছাড়া আর কেউ জানবে না।

: কেন?

: প্রয়োজন আছে!

: কিন্তু·····

: ভয় নেই। যদি রাজী না হও আমি জোর করবো না। আর···

নাসিরুদ্দীন তখন অনেকটা সহজ। যদিও তাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। তার গলাটা কাঁপছিল। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা ক'রেও পারছিল না! বলেছিল : যদি কাম খতম করতে পারো ইনামের অভাব হবে না।

: ইনাম! বুকটা কেঁপে উঠেছিল সফির।

: হ্যাঁ, ইনাম! বলেছিল নাসিরুদ্দীন : যা চাইবে। তোমাকে আমি আমির বানিয়ে দেব।

: আমির! স্খলিতকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল তার! অসহ্য লোভের হাতছানি। শিরা-উপশিরায় উষ্ণ রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছিল।

: হ্যাঁ সফি, আমির। নাসিরুদ্দীন স্পষ্ট হয়েছিল। আমির বনে

যাবে তুমি। মুঠো-মুঠো আশরফি, হীরা-জহরত, মণি-মাণিক্য……
আর……

ঃ কাজটা কী? যেন ককিয়ে উঠেছিল তার প্রাণটা। চিৎকার ক'রে উঠেছিল। সম্পদের প্রলোভন ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছিল তাকে।

ঃ চুপ, আস্তে! সতর্ক করেছিল নাসিরুদ্দীন। হাতটায় চাপ দিয়েছিল একটু। বলেছিল ঃ তুমি রাজী?

ঃ কাজটা কী? তেমনি অধীর সে। জানতে চায় কোন্ কাজের বিনিময়ে শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীন তাকে ফকির থেকে আমির বানিয়ে দেবেন? কি কাজ?

হেসেছিল নাসিরুদ্দীন। তার হাসিটা স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল। বলেছিল ঃ কাজটা তোমার পক্ষে কিছুই নয়। ইচ্ছে করলেই তুমি পারো। আমি জানি তুমি পারবে।

ঃ বলুন!

বলেছিল নাসিরুদ্দীন। খুব সহজেই কথাটা বলেছিল। যেন কিছুই নয় এমন ভাব নিয়ে। হাসতে হাসতে।

কিন্তু কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকে উঠেছিল সফি। মনে হয়েছিল জেগে, না, ঘুমিয়ে আছে। স্বপ্ন দেখছে। দুঃস্বপ্ন।

মনে হয়েছিল শাহ্‌জাদা যেন ঠাট্টা করছে। মৃত্যু নিয়ে ছেলেখেলা। যে খেলা খেলার জন্যেই তার নোকরী।

তবু নাসিরুদ্দীনের প্রস্তাবটা মেনে নিতে পারেনি সে। প্রত্যাখ্যান করেছিল। ভয়ে! আল্লার নামে সর্দারের কাছে কসম খেয়েছে। জান কবুল তবু বেইমানী করবে না।

কিন্তু নাসিরুদ্দীন তাকে বেইমানী করতেই বলেছিল। বিনিময়ে অগাধ ঐশ্বর্য। আমির বনে যাবে সে।

বলেছিল ঃ কী করবে?

ঃ এ্যাঁ! চমকে উঠেছিল।

ঃ রাজী?

: এঁ্যা ! আবার সেই চমকানি।

: কী হ'ল ? নাসিরুদ্দীন যেন বুঝতে পারেনি। হাতটা ধরেছিল। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল সফি। মুহূর্তে লোভের সর্বনাশা প্রলোভনটাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। কঠিনকণ্ঠে বলেছিল : নেহি।

: কী ?

: ম্যায় সকেগা নেহি।

: কেন ?

সে চুপ করেছিল।

: সফি !

: ম্যায় মাফি মাংতা।

: সফি !

: হামকো মাপ কর্ দে না।

: সফি !

: ম্যায় নেহি পারুঙ্গা।

আর কথা বলেনি নাসিরুদ্দীন। অনুরোধও করেনি। লোভ দেখাবার চেষ্টাও করেনি। ব্যর্থ হতাশায় ফিরে গিয়েছিল। আশা ভাঙার জ্বালা বুকে নিয়ে।

সফি দাঁড়িয়েছিল। অনেকক্ষণ। সবকিছু কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল তার। মাথাটার মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করেছিল।

পিপাসা বোধ করেছিল। অসহ্য তৃষ্ণা !

॥ চার ॥

সফি ফিরে এসেছিল। নিজের কাজে গিয়েছিল এক সময়। কিন্তু সুলতানের কক্ষের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে কেমন যেন গাটা ছমছম ক'রে উঠেছিল তার। এই প্রথম। এর আগে কোনোদিন এমন হয়নি। ভয়টা যেন নিজের জন্যেই। মনে হয়েছিল কে যেন সঙ্গে আসছে।

কখনো পাশে পাশে, কখনো পিছনে। স্পষ্ট পদশব্দ যেন শুনতে পেয়েছিল। থমকে দাঁড়িয়েছিল। দেখেছিল। কেউ নেই। কেউ আসেনি তার সঙ্গে।

তবে ?

তবে কি সে মিথ্যা শুনলো ? সন্ধ্যার সেই দুঃস্বপ্নটাই কি তার মনের সঙ্গে ফিরছে! সেই অস্বাভাবিক লোভের হাতছানি!

তাই বা কেমন ক'রে হয় ? সে যে স্পষ্ট শুনেছে পদশব্দ। ভুল নয়। নিশ্চয়ই কেউ তাকে অনুসরণ করছে। ভুল হয়নি তার। সে সতর্ক হ'তে কোথাও থামের আড়ালে আত্মগোপন করেছে।

মনের সন্দেহ মেটাতে খুঁজে দেখেছে। কাউকে পায়নি।

খোজা প্রহরীর দল যেখানে পাহারা দেয় সেখানে ফিরে গেছে। জিজ্ঞাসা করেছে : হামারা পিছে কৈ ইধার ঘুসা ?

: কৌন ? বিস্মিত তারা জানতে চেয়েছে।

ওহি পুছতা !

: নেহি তো।

: তব ?

নিঃসন্দেহ হ'লেও তারা বিস্মিত হয়েছে। বলেছে : হামলোগ কিসিকো নেহি দেখা।

: তব ভি হুঁশিয়ার রহো।

: জী! সতর্ক হয়েছে তারা।

সফি সুলতানের কক্ষটার দিকে এগিয়ে গেছে। এবার আর শুনতে পায়নি কিছু।

: এতনা দেরি কেঁউ ? পদশব্দে তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে কথাটা জানতে চেয়েছেন সৈফুদ্দীন।

চমকে উঠল সফি। ধরা পড়বার ভয়ে আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করেছে সুলতানকে। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়নি।

: চুপ কেঁউ ? জানতে চেয়েছেন তিনি।

তবু কোনো উত্তর দিতে পারেনি। ভয়ে পা দু'টো থরথর করেছিল। নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা ক'রেও পারছিল না।

আর সেটুকু লক্ষ্য করে সুলতানের কালো পাথরের মতো মূর্তিটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। অট্টহাসিতে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। নিজের মনেই হেসেছিলেন। সফিকে দেখেছিলেন আর হেসেছিলেন। তারপর হাসির বেগটা একটু কমতে বলেছিলেন : ডরো মৎ!

: ম্যায়......। কথা বলার চেষ্টা করেছিল সে।

বাধা দিয়েছিলেন সৈফুদ্দীন। হাসিমুখে বলেছিলেন : তোমার দেরির জন্যে আমি কিছু মনে করিনি। আমি শুধু ভেবেছি, তুমি আসছো না কেন? কাম ছিল?

: জী, না।

: তবে?

: আমি......

: এখনও রাত্রি হয়নি। যদি ইচ্ছে কর আরও একটু ঘুরে আসতে পারো তুমি।

তাই করেছিল সে। ফিরে গিয়েছিল নিজের আস্তানায়। খিদে পেয়েছিল। সন্ধ্যায় খাওয়া হয়নি। সুলতান যদি অনুমতি না দিতেন, সমস্ত রাত্রি তাকে অভুক্ত কাটাতে হ'ত।

সদর দেউড়ির পাশেই ছোট্ট সেনানিবাস। জামান খাঁর পাইকের দল থাকে। আহার আয়োজনের দায়িত্ব সুলতানের। কারণ, অন্য সবাই তার মতো না হ'লেও সুলতানের দেহরক্ষী। তিনি বাইরে যখন যেখানে যান পালা ক'রে পাহারা দেয়। সফিরই শুধু প্রবেশ অধিকার হারেমে। জানানা মহলে। সুলতানের খাস কামরায়।

অন্যমনস্ক ছিল সফি। মনটা চিন্তাচ্ছন্ন। তাই বাবুর্চি বুড়োর ডাক শুনতে পায়নি। ফিরে তাকায়নি তার দিকে।

সুলতানের কাছে অনুমতি পেয়ে নিজের ছোট্ট ঘরখানায় ফিরে এসেছিল। এসেই শুয়ে পড়েছিল। নিজেকে বড় ক্লান্ত বোধ

করছিল। কেমন যেন ঘুম-ঘুম ভাব। অথচ ঘুমোতেও পারছিল না। সমস্ত এলো-মেলো, অস্থির।

অনেকক্ষণ পরে। কতোক্ষণ হিসাব করেনি। তখন সবেমাত্র চোখের পাতায় ঘুম নেমেছে। একটা নিশ্চিন্ত আরামবোধ উপলব্ধি করতে পারছিল। ঠিক সেই সময় থপথপে বুড়োর পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এসেছিল।

শুয়ে শুয়ে সেই আধা-ঘুমের মধ্যেই চিনতে পেরেছিল লোকটাকে। বাবুর্চি বুড়ো। আর শুধু বাবুর্চি বুড়ো নয়, এখানকার সকলের পদশব্দই তার চেনা। অনেক দূর থেকে হ'লেও যদি কানে আসে পরিচিত হ'লে ব'লে দিতে পারে কে আসছে।

বাবুর্চি বুড়ো ঘরে ঢুকেছিল। দাঁড়িয়েছিল তার পাশটায়। সফি তার গায়ের দুর্গন্ধ পাচ্ছিল। কফজমা ঘড়ঘড়ে গলায় আওয়াজ উঠছিল। হাঁপাচ্ছিল বুড়ো। কাশির বেগটাকে দমন করছিল অতিকষ্টে।

দিনে রাতে সবসময় হাঁফায় আর কাশে বুড়ো। কষ্ট হয়। কখনও বা বুক চেপে শুয়ে পড়ে। ছটফট করে যন্ত্রণায়, কষ্টে।

বিমার। বিমারী বুড়ো। নোংরা আর খিটখিটে। তিরিক্ষি মেজাজ। কথা বল আর নাই বল সবসময় খিঁচিয়েই আছে। খোদা জানেন কোনো দিন গোসল করে কি-না।

মুখ-মাথা ভর্তি চুল-দাড়ি, নোংরা পোশাক আর হাতে-পায়ের কালো চাপ-চাপ ময়লায় একটা জানোয়ারের মতো দেখায়।

দেখলে ঘেন্না করে। দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এমনই নসিব, ওর হাতে খেতে হয়। না খেয়ে উপায় নেই। সুল-তানের হুকুম আছে কি-না জানেও না। ও ওর নিজের কাজ ক'রে যায়। রাতারাতি সুলতান বদলায় কিন্তু বাবুর্চি বুড়ো ঠিক আছে।

কতো বছর এখানে আছে জানে না। শুনেছে আগে নাকি আড়কাঠী ছিল। পথে-ঘাটে ঘুরে ঘুরে সুলতানদের চরের কাজ করতো। ঘর

ভাঙার কাজ। জানানা মহলের অনেক মেয়ের সন্ধান বাবুর্চি বুড়োই দিয়েছে। লোক গিয়ে ঘর ভেঙে তুলে এনেছে রাতের অন্ধকারে।

এমনি চলছিল। কিন্তু চললো না। একদিন ধরা পড়ে মার খেয়েছিল। মরে গেছে মনে ক'রে ফেলে দিয়েছিল নদীর চড়ায়। মরেই যেত, কিন্তু মরেনি। জানটা কড়া ব'লে আর নদীতে জোয়ার আসেনি তাই। তারপর থেকেই অসুখ ধরেছে।

কিন্তু কাজ না করলে খাবে কি? কে খাওয়াবে বসিয়ে? সুলতান পাল্টায় হামেশা। এমন দিন গেছে যে, আজ আছে কাল নেই। বাবুর্চি বুড়োর দুর্গতির একশেষ। শেষে নিজের কাজ নিজেই জুটিয়ে নিয়েছিল।

মানুষের অভিশাপে, খোদার মেহেরবানিতে পাপের ফল ভোগ করছে। মেহেরবান খোদা! বাবুর্চি বুড়োই বলে। উঠতে বসতে। খোদাকে ঠাট্টা করে। নিজের পাপের জন্যে এতোটুকু অনুশোচনা নেই।

কাশির বেগটা কমলে ঘড়ঘড়ে গলায় বুড়ো ডেকেছিল: এই—এইগুলি কেন রে?

সফি চুপ ক'রে শুয়েই ছিল।

: এই বকরির বাচ্চা!

এবার উঠতে হয়েছিল। উঠে বলেছিল: কী বলছিস্?

: গুলি কেন এখন?

: তাতে তোর কী?

একটু থতমত খেয়েছিল বুড়ো। পরক্ষণেই তিড়বিড়িয়ে উঠেছিল: আমার কি রে শয়তানের বাচ্চা! গিল্‌বি না? আমাকে উদ্ধার ক'রে হারেমের মাগীগুলোর সঙ্গে আশনাই করতে যাবি না?

: এই! ধমকে উঠেছিল সফি। ফালতু বক্‌বি না বল্‌ছি। একেবারে জানে খতম ক'রে দেব। যা, ভাগ।

তার মূর্তি দেখে একটু যেন থমকে ছিল বুড়ো। ছেলেটা ঠাণ্ডা প্রকৃতির। তুই-তোকারি করলেও কোনোদিন এমন রেগে ওঠে না।

হারেমের মেয়েগুলোকে নিয়ে বললেও চুপচাপ হাসে। আজ ভিন্ন ব্যাপার। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে!

বলেছিল : শুয়েছিলি যে?

: এমনি।

: কামে যাবি না?

: যাবো।

: খাবি তো?

খাওয়ার কথায় উঠে বসেছিল সফি। খাওয়ার জন্যেই এসেছে। বলেছে : খাবো।

: তোর খাবার নিয়ে আসবো?

বাবুর্চি বুড়োর দিকে চেয়েছিল সফি। ওকে সেই মুহূর্তে কেমন যেন চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। একটু যেন সন্দেহের ছোঁয়াও জেগেছিল মনটায়। মনে হয়েছিল শাহ্‌জাদার কোনো হাত নেই তো এতে! হাত করেছে বুড়োটাকে। কারণ, খাবার কথা তুললে যে দু'চার কথা না শুনিয়ে খেতে দেয় না কোনোদিন, তার এমন ব্যবহারের অর্থ কি?

বাবুর্চি বুড়ো তাকে বেশি ভাববার অবকাশ দেয়নি। তাড়া দিয়েছিল : কিরে, নিয়ে আসবো?

: যা, নিয়ে আয়।

বলেছিল সফি। আর ভেবেছিল। সন্দেহটা ঘনীভূত হয়েছিল ক্রমশঃ। সাবধান হবার কথাও মনে হয়েছিল। সাবধানতা অবলম্বন নিজের সম্পর্কেই। শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীন তাকেও শেষ ক'রে দিতে পারে।

কারণ, তার প্রস্তাব সে অস্বীকার করেছে। লোভের হাতছানিতে সাড়া দেয়নি।

রাতের খাবার এনেছিল বুড়ো। সফি লক্ষ্য করেছিল খাদ্যবস্তুর কোনো পার্থক্য ঘটেনি। প্রতিদিনের মতোই। তবু একটু ইতস্ততঃ করেছিল। বুড়োর মুখটা লক্ষ্য করেছিল। সে মুখ নির্বিকার।

খেতে বসেছিল সে। খেয়েছিল।

বুড়ো কথা বলেছিল এক সময় : হ্যাঁ রে!

মুখ তুলেছিল সফি।

: একটা কথা বলবো ?

ওর মুখের দিকে চেয়েছিল সফি। বলেছিল : ফালতু বাত ?

: না—না।

: বল্।

: আজ তোর কী হয়েছে ?

চমকে উঠেছিল। বুড়োর দিকে চেয়ে দেখেছিল, সে তার দিকেই চেয়ে আছে। বলেছিল : কি আবার হবে ?

: তোর মেজাজটা আজ আচ্ছা নেই।

: তোর কী ? এবার কঠিন হবার চেষ্টা করেছিল সফি।

: তোর গরম লেগেছে।

: এ্যাই ! ধমকে উঠেছিল সফি।

: তোর মতো উমর আমারও ছিল।

: ফিন্!

দাঁত বার করেছিল বুড়ো। লাল লাল দাঁতগুলো বার ক'রে হি-হি ক'রে হেসেছিল। কৌতুক উপচে পড়েছিল কুত-কুতে চোখ দু'টোয়।

সফি দাঁড়ায়নি আর। বুড়োর মুখের দিকে চায়নি। বুড়োকে যেন তার বন্ধু ব'লে মনে হয়েছিল।

যা ভেবেছিল তা যেন সত্যি নয়। সন্দেহটা মিথ্যে। কিন্তু অসভ্য ইঙ্গিতটায় অসহ্য বোধ হয়েছিল। ফিরে এসেছিল হারেমে। সুলতানকে পাহারা দিতে। সৈফুদ্দীন নামের মানুষটাকে রাতের গুপ্ত আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করতে।

কিন্তু সুলতান তখন তাঁর কক্ষে ছিলেন না। কোনো সাহেবাকেও

দেখতে পায়নি। শূন্য ঘরটা খাঁ-খাঁ করছিল। সফি গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নিজের জায়গায়।

রাত একটু গভীর হ'তে জানানা মহল থেকে তিনি ফিরে এসেছিলেন। তাঁর পা টলছিল। বাঁদীদের ওপর ভর দিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। সফিকে দেখে দাঁড়িয়েছিলেন।

ঃ তুম আগিয়া ?

ঃ জী, হাঁ।

ঃ এবার ম্যায় শোনে যাতা।

কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। বাঁদীরা বেরিয়ে এসেছিল। যাবার সময় সফির সামনে দাঁড়িয়েছিল। একটু হাসি-হাসি মুখ করেছিল।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল সফি। তারা চলে গিয়েছিল।

সৈফুদ্দীন তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

দ্বারের পাশে জাগ্রত প্রহরী দাঁড়িয়েছিল সে। লক্ষ্য করেছিল সুলতানের অবস্থাটা। শরাবী একটা অসহায় মানুষ। শব!

মনে পড়েছিল সন্ধ্যাটাকে। সৌভাগ্য অযাচিতভাবে ধরা দিতে এসেছিল। গ্রহণ করতে পারেনি। বেইমান বনতে পারবে না। প্রত্যাখ্যান করেছিল।

হয়তো ভুল করেছে। কিন্তু ভুল না ক'রেও পথ নেই। এই ভুলটুকুই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বেইমানী করতে পারবে না!

তাই কি ?

চমকে উঠেছে সফি। একটা তাজা প্রাণ। মনে মনে চিন্তা করেছে সন্তর্পণে।

জমিলার কথা ভেবেছে। জমিলা......

সুখ-স্বপ্ন। সে বাঁচতে চায়। জমিলার নরম দেহটা দূরে থাক্। ওর মা বাঁদী ছিল। রূপ ছিল ব'লে কসবীর জীবন কাটাতে হয়েছে। অনেক টানাটানি, ছেঁড়া-ছিঁড়ি হয়েছে। জন্মেছে জমিলা। ভাগ্য ওকেও বাঁদী করেছে।

ঃ ওর মা নেই, ও আছে। যদি......

ঃ না, তবুও পারবে না সফি!

॥ পাঁচ ॥

পাখির ডাক! দুঃস্বপ্নের রাত্রি প্রভাত হয়েছে!

অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এলো সফি। বাস্তব—সত্য!

পাখির ডাক শুনলো। ভোরের আলো দেখল। পূবের আকাশটা বড় বেশি লাল আর উজ্জ্বল। মানুষের কলিজার খুনের মতো। লাল টক্-টকে—উষ্ণ!

সেই উজ্জ্বল আলোয় আপন দৃষ্টিটাকে কক্ষের মধ্যে নিক্ষেপ করলে সে। সৈফুদ্দীন তখনও গভীর ঘুমে অচেতন, অসহায়।

চকিতে একটা সম্ভাবনা বুকের গভীরে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠল তার। নির্লজ্জ, নগ্ন একটা লোভের ছবি। মানুষের লোভ! লালসা মানুষকে পশু ক'রে তোলে। স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসার স্থান কেড়ে নেয়। স্বার্থ হয়ে ওঠে বড়।

মানুষের স্বার্থ। যে স্বার্থ তাকে দিনে দিনে নীচে নামিয়ে নিয়ে যায়। অনেক—অনেক নীচে। যেখান থেকে উঠে আসতে পারে না। পথ হারায়। অন্ধের মতো ঘুরে বেড়ায় সমাজের বুকে। একাধিপত্য স্থাপন করতে চায়।

ভালো হ'তে চাইলেও পারে না। পশুশক্তি বিবেকবুদ্ধি গ্রাস করে। শুভবুদ্ধির পরাজয় ঘটে। আলোর চেয়ে অন্ধকারই স্পষ্ট। অন্ধকারের বাঁধনে বাঁধা পড়ে। কঠিন নাগপাশের বাঁধন। যে বাঁধন কাটতে পারে না।

ছটফট করে। সমস্ত জীবন। বিবেকের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়। মাথা খোঁড়ে। অন্ধকারের জীবেরা বাঁচতে জানে না, চায় না।

নাসিরুদ্দীন সুলতান বনাতে চায়। সুলতানির স্বপ্নে পাগল হয়েছে সে।

সফি যদি রাজী হ'ত আজকের দিনের আলোয় তার সুলতান হবার বাধা ছিল না! এমনই তো হচ্ছে আজ ক'টা বছর। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আজ সুলতান, কাল শব।

তবু মসনদটাকে ঘিরে নিত্য ষড়যন্ত্র। কে সুলতান বনতে চায়, আর কে যে চায় না দিনের আলোয় বোঝা মুশকিল। রাতের অন্ধকারে স্পষ্ট নয়!

শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীন যে ক্ষমতায় আসতে চাইবে, সুলতান সাজবে—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বরং সে যদি কিছু না চাই তো, সুরা-নারী আর মসনদটা থেকে দূরে থাকতো, তাতেই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

মনে হ'ত সে সহজ স্বাভাবিক নয়। তার দিমাগ ঠিক নেই। আওয়ারা, একটা বেয়াকুফ-বুদ্ধু!

সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজশাহ্‌।

সুলতান বারবক শাহ্‌ তাঁর সুলতানি আমলে যে আশী হাজার হাবশী গৌড়ে নিয়ে এসেছিলেন তাদেরই একজন সৈফুদ্দীন। সৌভাগ্য তাঁর হাত ধরেছে। সুলতান শাহ্‌জাদার হত্যার পর দরবারের আমির-ওমরাহ্‌রা নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবার জন্যে মসনদে বসিয়েছিলেন।

অনেকে অন্য কথাও বলে। বলে: সৈফুদ্দীনই নাকি ভেতরে-ভেতরে ষড়যন্ত্র ক'রে সুলতান শাহ্‌জাদাকে খুন করিয়েছে। খোজা বারবক। বান্দা বারবক মসনদে বসে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পর্যন্ত পায়নি।

তা অবশ্য ঠিক। তাই হয়েছিল। সত্যই নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায়নি বারবক। ক'টা মাসের মধ্যেই খুন হ'ল। আর এই খুনের পেছনে বেগমসাহেবারও নাকি হাত ছিল।

কি ছিল আর কি না ছিল, সঠিক কিছু জানে না সফি। পরস্পরের আলোচনায় কানে এসেছে। শুনে গেছে শুধু। বিশ্বাস করতে মন চায়নি।

বরং দ্বিতীয় কারণটাই সত্য ব'লে মনে হয়েছে। আমির-ওমরাহ্-রাই তাঁকে মসনদে বসিয়েছিল। বসিয়েছিল নিজেদের সুবিধের জন্যে।

কিন্তু কিছুমাত্র সুবিধা যে তাদের হয়নি বা স্বার্থে আঘাত লেগেছে এখন মাঝে মাঝে বেশ বোঝা যায়। সৈফুদ্দীনকে এখন অনেকেই পছন্দ করছে না। প্রকাশ্যে না হ'লেও ভেতরে ভেতরে তাঁকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। বন্ধুরা শত্রু এখন তাঁর। শত্রুতা মনে মনে। প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

এখন জেনেছে সে। মাঝে মাঝে দরবারের আবহাওয়াটা বেশ গরম আর ভারী হয়ে ওঠে। আমির-ওমরাহ্দের সঙ্গে মতান্তর দেখা দেয়।

কিন্তু অনেক দিন আগে এমনটা হবে যেন জানতে পেরেছিল সফি। তখন বুঝতে পারেনি। হেসে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কথাটা।

বাবুর্চি বুড়ো বলেছিল : তোর কম বয়স তাই হাসছিস্। যা বললুম তাই হবে।

সফি বলেছিল : তোর দিমাগ ঠিক নেই।

: ঠিক আছে ব'লেই বলছি।

: তোকে বলেছে কেউ ?

: বলবে কেন ?

: তবে ?

: আমি বুঝতে পারি। তাই হয়।

বুঝতে পারে বুড়ো। কারো দিন ঘনিয়ে এলে ঠিক বুঝতে পারে। ভুল হয় না। বলেছিল : বান্দাটার জান খতমের আগে আমি সমঝাতে পেরেছিলুম।

: কী ক'রে ?

: আমার মন বলেছিল।

: কাউকে বলেছিলি ?

: কাকে বলবো ? বললে শুনবে কে ? আমাকে হয়তো পাগল ভাবতো, নয়তো খতম ক'রে দিত।

: সুলতানকে ব'লে আসিস্‌নি কেন ?

: হারেমে ঘুমোতে পারলে তো !

হারেমে ঘুমোতে পারেনি বাবুর্চি বুড়ো। দূর থেকে শুনেছিল একদিন সুলতান শাহ্‌জাদার খুন হওয়ার কথা।

আর শুধু সুলতান শাহ্‌জাদা নয়, ফতেহ্‌শাহের খুন হওয়ার আগেও বুঝতে পেরেছিল সে। হয়তো সে সময় তার মতো অনেকেই বুঝতে পেরেছিল।

কারণ ফতেহ্‌শাহের কঠোরতা। তাঁর কাছে দোষীর লঘুদণ্ড ছিল না। দোষী সাব্যস্ত হ'লেই প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন তিনি। যারা হয়তো প্রাণে বাঁচতো তাদেরও মূল্য বড় কম দিতে হ'ত না। অঙ্গছেদ ক'রে দেওয়া হ'ত তাদের।

হাবশীরা তখন প্রবল হয়ে উঠেছিল। অনেক সময় সুলতানের আদেশও তারা মানতে চাইতো না। ফলে কঠোর হয়েছিলেন ফতেহ্‌-শাহ্‌। আদেশ অমান্যকারী হাবশীদের কঠোর শাস্তি দিতেন।

হয়তো ফতেহ্‌শাহের হাবশী নিগ্রহ-ই জিন্দিগি খতমের কাল হয়েছিল। হারেমের বান্দা বারবকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল তারা। পাইকের দলও সে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল। কারণ, তাদের ওপরও সুলতান কম অত্যাচার করেননি। বারবককে সুলতান ব'লে মেনে নিয়েছিল তারা।

৮৯২ হিরাতে (১৪৮৭-৮৮ খ্রীঃ) জলালুদ্দীন ফতেহ্‌শাহ্‌ খুন হ'লেন। খুন করলে হারেমের প্রধান খোজা বারবক। খুন করার ইনাম সে নিশ্চয়ই পেয়েছিল। কিন্তু খুশি হ'তে পারল না। মসনদ

তাকে হাতছানি দিল। পুরুষত্বহীন জীবনটা তাকে অস্থির ক'রে তুললো। বঞ্চিতের মর্মজ্বালায় অস্থির আর ক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে আঁকড়ে ধরলো মসনদ। হারেমটাকেও।

ক'টা মাসের সুলতানি! ব্যর্থ মানুষটা ছটফটিয়ে মরল। যাদের বিশ্বাস করেছিল, যারা তাকে সুলতান হ'তে বলেছিল—ভরসা দিয়েছিল—বলেছিল: আমরা আছি! তাদের হাতেই খুন হ'ল একদিন।

আর খুন হওয়ার আগে বুঝতে পেরেছিল বাবুর্চি বুড়ো। কেমন ক'রে যেন বুঝতে পারে। এবারও পেরেছে।

সফিকে বলেছে: এ সুলতানও আর বেশি দিন নয়! খেল খতমের দিন আসছে।

হয়তো তাই। যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথম এবং প্রধান কারণ তিনি খেয়ালী। খেয়ালের অন্ত নেই সৈফুদ্দীনের। হুকুমের নড়চড় হয় না। কিছু করবো বললে তা ক'রে তবে ছাড়েন। কারো কথায় কর্ণপাত করেন না। কিছু শুনতে চান না। হাকিম নড়ে তবু হুকুম নড়ে না তাঁর।

এছাড়া, আরও অনেক কারণ আছে। যে মানুষটার সঙ্গে দেশের, মানুষের এবং রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই,—সেই দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি বড় দরদ তাঁর। অবশ্য তাঁর শাসন-ব্যবস্থায় দেশের মানুষ খুশি। গরীব যারা, অনাহারে যাদের দিন কাটে, পরনে কাপড় জোটে না তারাও খোদা বা ভগবান উভয় দরবারেই সুলতানের দীর্ঘজীবন কামনা করে।

দেশটাকে এবং নিরন্ন মানুষগুলোকে বড় ভালোবাসেন সৈফুদ্দীন। তাদের জন্যে দরদের শেষ নেই তাঁর। বদনামী হয়েছেন। খেয়ালী, বেহিসাবী।

আমির-ওমরাহ্ আর রাজ্যের ধনীদের চোখ নিদ্রাহারা। সুলতানের চোখ বড় বেশি সজাগ আর সতর্ক। তাদের এতোটুকু ত্রুটিতে বড় নির্মম আর কঠোর তিনি।

অন্যদিকে গরীবদের প্রতি মুক্তহস্ত। এইতো কিছুদিন আগেই কি একটা উৎসবে একদিনেই কোষাগারের অনেকখানি সঞ্চয় নিঃশেষ ক'রে দিয়েছিলেন।

ঃ এ কি করছেন জাহাঁপনা? বাধা দিতে চেয়েছিলেন ওমরাহের দল।

ঃ কী করছি? সৈফুদ্দীন যেন তাঁদের প্রশ্নের ধারাটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি।

ঃ এমন করলে যে সর্বনাশ হবে? বলেছিলেন তাঁরা।

ঃ কিসের সর্বনাশ? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

ঃ কোষাগার যে শূন্য হয়ে যাবে!

ঃ তাতে কী? হেসেছিলেন তিনি।

ঃ যদি অর্থের প্রয়োজন হয়? যদি শত্রু এসে হানা দেয়?

ঃ দিলেই বা।

ঃ তখন তো অর্থের প্রয়োজন হবে। এখন যদি কোষাগার শূন্য ক'রে দেন তখন অতো অর্থ পাবেন কোথায়?

ঃ লেকিন, এখন তো পড়ে রয়েছে, কোনো কাজে লাগছে না। তাই একটু কাজে লাগালুম।

ঃ এতে লাভ কী?

ঃ লাভ! গম্ভীর হয়েছিলেন তিনি। যিনি এগিয়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। বলেছিলেন ঃ আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?

ঃ বলুন।

ঃ কোষাগারের এই যে ধনরত্ন, এতো দৌলৎ এসব কার?

ঃ কেন, আপনার!

আমার! হেসে ফেলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন ঃ আমার আগে যিনি ছিলেন তাঁর ছিল নিশ্চয়ই?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ তার আগে যিনি ছিলেন তাঁরও।

ঃ তাই।

ঃ আমার আগের সুলতান ভোগ করতে পারেনি। আগের তিনিও নন। আমিও একদিন ফেলে রেখে চলে যাবো। দিনের পর দিন কোষাগারে শুধু দৌলতের পাহাড় জমা হবে। পড়ে থাকবে। ভোগ করতে পারবে না কেউ-ই। কিন্তু একবার ভেবে দেখেছেন কি এতো দৌলৎ কাদের, কোথা থেকে জমা হ'ল ?

চুপ করেছিল সবাই। কারো সাধ্য হয়নি কথা বলার।

সৈফুদ্দীন বলেছিলেন ঃ সুলতানের ঘরে দৌলৎ। যা কোনো কাজে লাগে না, দিনের পর দিন পড়ে থাকে। আর গরীবের পেটে ভাত জোটে না, পরনে কাপড়ও জোটে না। অথচ এসবের আসল মালিক তারাই। সুলতানের ঘরে তারাই জমিয়েছে দৌলতের পাহাড়।

একটু চুপ করেছিলেন তিনি। রুদ্ধকণ্ঠে আবার বলেছিলেন ঃ সুলতান হয়ে এ হয়তো আমার গুনাহ্, তবু তাদের সঞ্চয় তাদের হাতেই তুলে দিচ্ছি আমি। তারা দু'মুঠো খেতে পাক। পেটের জ্বালা মিটুক তাদের।

এই তাঁর দোষ, অন্যায়। আর এই জন্যেই······

সফি !

সুলতানের ডাকে চিন্তাজাল ছিন্ন হ'ল সফির। মুক্ত দ্বারপথে চেয়ে দেখলে, ঘুম থেকে কখন্ জেগে উঠেছেন তিনি। গবাক্ষের কাছে রক্ষিত আসনটায় বসে আছেন। এ সময় প্রতিদিনই তিনি ওই আসনে গিয়ে বসেন।

মুক্ত গবাক্ষ পথে কখনো আকাশ, কখনো প্রকৃতি নিরীক্ষণ করেন। কি যেন চিন্তা করেন তিনি বসে বসে।

তারপর আহ্বান জানান তাকে। সংবাদ দিতে বলেন মহলে। খোজা ভৃত্যদের সংবাদ দেবার পর ছুটি হয় তার।

আজ কিন্তু কোনো কথা বললেন না তিনি। কোনো আদেশ জানালেন না। পদশব্দ শুনেও ফিরে চাইলেন না তার দিকে। যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন।

কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল সফি। কারণ সুলতানের আজকের এই ব্যবহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সে কাছে গেলে কোনো দিনই তিনি এমন মুখ ঘুরিয়ে থাকেন না। কথা বলেন। সামান্য একজন দেহরক্ষী হ'লেও তিনি যেন একটু স্নেহের চোখে দেখেন তাকে। আর এই জন্যেই তাঁর কাছে সে সহজ, স্বচ্ছন্দ!

তবু আজ কেমন যেন অস্বচ্ছন্দ বোধ করল। নিজের উপস্থিতিটুকু জানাতে পারল না। একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধ—একটু দ্বিধাভাব, নিজেকে আজ তার কেমন যেন অসহায় ব'লে মনে হ'ল। আর সুলতানের আদেশের অপেক্ষায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

এক সময় যেন সম্বিত ফিরে পেলেন সৈফুদ্দীন। সজাগ হ'লেন। দেখলেন তাকে। বললেন: তুম যাও!

কুর্ণিশ ক'রে ফিরে আসছিল সফি। দ্বারের কাছে পৌঁছেও গিয়েছিল, কিন্তু দাঁড়াতে হ'ল।

ডাকলেন: শুনো!

ফিরতে হ'ল। আবার গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল তাঁর মুখোমুখি। যা সে চাইছিল না। মনে পড়ছিল গতদিনের সন্ধ্যাটাকে। তাই সুলতানের কাছ থেকে সে তার অসহজ একটু বা আতংকগ্রস্ত মনটা নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চাইছিল। একটু নির্জনতা খুঁজছিল সে। মানুষের কাছ থেকে দূরে যেতে চাইছিল মনটা।

সৈফুদ্দীন বললেন: আজ দুপুরে শিকারে যাচ্ছি আমি। নাসির আমার সঙ্গে যাবে। তুমিও চল।

মাথাটা বুকের কাছে ঝুঁকিয়ে নীরবে সম্মতি জানালো সফি। দাঁড়িয়ে রইলো আদেশের অপেক্ষায়।

সৈফুদ্দীন বললেন: কী যাবে, তো?

: যাবো।

: চল। ক'টা দিন ঘুরে আসি একটু। লেকিন···একটু থামলেন তিনি। একটু ভাবলেন। তারপর সফির মুখের দিকে চেয়ে বললেন: জানো সফি, সাচ বাত বলতে কি, শিকার আমার আচ্ছা লাগে না। ঝুটা খুন দিলে দর্দ জাগায়। লেকিন, তবু যেতে হবে।

: কেন? এ:তোক্ষণ নীরবে শুনে এসেছে। এবার প্রশ্ন করল। কারণ, সৈফুদ্দীনকে কেমন যেন অন্তরঙ্গ, অসহায় বোধ হ'ল তার। কাছের মানুষ। যে মানুষটার বুকের মধ্যে প্রাণের স্পর্শ অনুভব করা যায়।

সত্যিই তাই। অসহায় কালো মুখটায় সফির প্রশ্নে ক্ষীণহাসির একটা সূক্ষ্ম রেখা ফুটেই মিলিয়ে গেল। মনে হল তাঁর হাসিটা আর্ত্ত-করুণ। তিনি কথা বললেন। প্রশ্ন করলেন: সাচ বলছো তুমি, কিছু বুঝতে পারো না?

: কী? ভীষণভাবে চমকে উঠল সে। প্রশ্নটায় রাজ্যের বিভ্রান্তি!

কি বলতে চান সুলতান! সেই কথা? যে কথা তাকে অনেক দিন আগে বাবুর্চি বুড়ো বলেছিল। নিদারুণ সত্যের রূপ নিয়ে নাসিরুদ্দীন এগিয়ে এসেছিল?

সৈফুদ্দীনও বুঝতে পেরেছেন। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন তিনি। কিন্তু কেমন ক'রে? কে তাঁকে বললে? তাঁর অন্তর? দিলে ঘনিয়ে এসেছে তাঁর সেই কালো ছায়াটা। সফি শুনেছে, বুঝতে পারে সবাই। মৃত্যুর ছায়া ঘনায় সকলেরই অন্তরে। অস্বীকার করে তাই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন সৈফুদ্দীন। চোখ বন্ধ ক'রে বসে রইলেন। এক সময় চোখ মেললেন। সফিকে দেখলেন। কোমল ঠাণ্ডা চোখে। রাতের বেহিসাবী শরাবের নেশার এতোটুকু চিহ্ন নেই। সহজ-সরল। পরক্ষণেই চোখে কাঁপল ভয়, আর্তি, অক্ষমতার স্পন্দন। বললেন: আমি বুঝতে পারছি আমার দিন শেষ হয়ে আসছে। মুর্দা বানতে দেরি নেই আর। কেন, জানো?

সফিকে কিছু বলতে হ'ল না, তিনি নিজেই বললেন। মনের কপাট খুলে দিলেন যেন। আয়ত দুই চোখের দৃষ্টিটাকে শূন্যে মেলে ধরে বললেন: আমার কাজ, চিন্তা-ভাবনা আর খুশি করতে পারছে না সকলকে। গরীবদের নিয়ে আমার দিলের চিন্তাকে আমির-ওমরাহ্‌রা বলছেন, ঝুটা। লেকিন, আমি জানি ঝুটা নয়, সাচ। আমি বোঝাতে পারি না। আমির-ওমরাহের দলই আমার সব। তাঁরা যা বলবেন, তাঁদের ইচ্ছেতেই আমাকে চলতে হবে। তবেই আমার মসনদ ঠিক থাকবে।

আবার চুপ করলেন তিনি। কি যেন ভাবতে লাগলেন। চিন্তার রেখাগুলো স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল তাঁর চোখ-মুখ আর কপালের ভাঁজে-ভাঁজে। দু'চোখের দৃষ্টি চঞ্চল, দিশাহারা।

হঠাৎ তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। কালো মুখখানা অস্বাভাবিক, কঠিন আর ক্রুদ্ধ দেখাল। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে অজস্র ঘৃণা ঝরে পড়ল তাঁর। নিজেকে নিজেই যেন ধিক্কার দিলেন তিনি। বললেন: জানো সফি, তোমাদের এই দেশটাকে লুটতেই আমরা এসেছিলুম। সুলতান বারবক শাহ্‌ অনেক লোভ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে এসেছিলেন। তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। নিজেদের যোগ্যতা গুণে উপযুক্ত পদ পেয়েছি আমরা। লেকিন, যে-লোভ নিয়ে আমরা দেশ ছেড়েছিলুম, সেই লোভের আগুন এতোটুকু নেভেনি আমাদের। তোমাদের দেশকে, দেশের মানুষকে আমরা ভালোবাসতে পারিনি। আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ, স্বীকার ক'রতে লজ্জা নেই, আমিও। আমিও সম্পদের লোভে পাগল হয়েছি। চাই, আরও—আরও চাই। আরও চাইতে চাইতে যা আমি ভাবিনি, হয়তো চাইনি—তাও পেয়েছি। নসিব আমাকে সুলতান বানিয়েছে। মসনদে বসেছি আমি। তোমার দেশের মসনদে। আর জানো, আমার জাতভাই আর তোমার দেশের আমির-ওমরাহের দল ভেবেছিল আমি তাদের ইচ্ছেমতো লুটতে দেব। নিজেও লুটবো। তোমাদের ঘরের ইজ্জৎ নিয়ে ছিনিমিনি

খেলবো। সফি, আমি সাধু-দরবেশ নই। লোভ-লালসা-হিংসা থেকে মুক্ত নয় আমার মন। আমিও বেঁচে থাকতে চাই, ভোগ করতে চাই। লেকিন, গরীবদের মারতে, ঘরের ইজ্জৎ লুটতে মন সায় দেয় না। আমি ভাবি, যাদের ঘর ভাঙবো, ইজ্জৎ লুটবো—সেই ঘর, সেই মা-বহিনের ইজ্জৎ যদি আমার হ'ত? আমাকে মসনদে বসিয়ে যারা তা করবে ভেবেছিল, আজ এতোদিন পরে তাদের ভুল ভেঙেছে। আজ আর তারা চাইছে না আমাকে। আমার জিন্দিগিটা খতম করার কথা ভাবছে। লেকিন......

চুপ করলেন তিনি। তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। একটু যেন লজ্জা পেলেন। অনাবশ্যক হাসলেন। বললেন: শিকার নয়, ক'দিন গা-ঢাকা দিচ্ছি। মসনদ ছেড়ে—হারেম ছেড়ে ক'দিন দূরে চলে যাচ্ছি। দোস্ত জামান খাঁ ব্যবস্থা করেছে। সে থাকবে।

তিনি চুপ করলেন। বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলেন না ব'লেই চুপ ক'রে রইলেন। দৃষ্টিটাকে প্রসারিত ক'রে দিলেন বাইরে।

সকালের আলো তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঝলমলে রোদ্দুরে আকাশটা ভরা। পাখির দল উড়ে চলেছিল দূর নিরুদ্দেশে।

সফি তখন অন্য কথা ভাবছিল। সৈফুদ্দীনের কথা শুনে এতোটুকু চমকায়নি সে। কোনো রকম আশ্চর্য বোধ করেনি বা কিছু একটা করা উচিত ব'লেও মনে হয়নি তার। কারণ, কিছুই অজানা নয় তার কাছে। সর্দার আমির-ওমরাহ্‌দের মনোভাব সম্পর্কে আগেই সাবধান ক'রে দিয়েছে। আরও সতর্ক হ'তে বলেছে।

সফি বলেছিল: আমি তো ঠিক থাকি।

: আরও কড়া নজর রাখ্‌বি। দিনেও দেখ্‌বি সুলতানকে। ......দেশের গরীবদের জন্যে সুলতানের জিন্দা থাকা দরকার।

: কেন? বোকার মতো প্রশ্ন করেছে সে।

সর্দারও সেই কথা বলেছে: বুদ্ধু, কাঁহাকা।

অবশ্য সেটা সর্দারের স্নেহের সম্ভাষণ ছিল। সফি বুঝতে পারে। সর্দারের মনে রাগের লেশমাত্র ছিল না।

সফি কথা বলেনি। সর্দারকে দেখেছিল। নতুন রূপ যেন জামান খাঁর।

ঃ আচ্ছা! কথা বলেছিল সর্দার।

সফি চেয়েছিল তার মুখের দিকে।

ঃ আমরা কী?

ঃ কী?

ঃ তুই, আমি—আমাদের মতো যারা, তারা কী?

ঃ কী? সফি সেই প্রশ্নই করেছিল। কারণ, সর্দার কি বলতে চায় বুঝতে পারেনি।

ঃ ফিন্! একটু যেন রেগে উঠেছিল সর্দার, কিন্তু হেসে ফেলেছিল পরমুহূর্তেই। বলেছিল ঃ তুই তেমনি বুদ্ধু রয়ে গেলি সফি।

না, সফি কোনো প্রতিবাদ করেনি সে কথার। সর্দার চিরটা কালই তাকে বুদ্ধু ব'লে আসছে। কারণ, সে সব কথা না শুনলে বুঝতে পারে না। হেঁয়ালি ক'রে কথা বলা সে পছন্দ করে না। অপ্রিয় সত্য হ'লেও তার ভালো লাগে। সময় সময় ব'লেও ফেলে।

সর্দার বলেছিল ঃ তুই কী?

সে যে কি তা সে জানে না। কারণ, ভাববার অবকাশ তার ঘটেনি, ভাবতে চায়ওনি। বলেছে ঃ আমি কী?

সর্দারের যেন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। বলেছে ঃ আরে বুদ্ধু, মানুষ না জানবার এ বাত পুচছি না।

ঃ তবে?

ঃ আমি বলছি তুই আমির না ফকির?

সফি ভেবেছে সে কথা। শেষে বলেছে ঃ কী জানি।

ঃ জানিস্ না? কথাটা বিশ্বাস করতে পারেনি জামান খাঁ।

ঃ সাচ। সত্যি কথাই বলেছে সে। কারণ, সফি জানে সে

আমিরও নয়, ফকিরও নয়। না-খেতে-পাওয়া একটা প্রাণী। সর্দার তাকে পথ থেকে তুলে খেতে দিয়ে জান বাঁচিয়েছে, জিন্দা রেখেছে। তার বেশি আর কিছু ভাবেনি। ভাবতেও ইচ্ছে করেনি।

আর কথাটা যেন সর্দারের বিশ্বাস হয়েছিল। সফির মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বলেছিল : ঠিক বলেছিস্। লেকিন, আমি জানি তুই কী। আর সেই জন্যেই তোকে আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস ক'রে তোর হাতে সুলতানের সব ভার তুলে দিয়েছি। কেন জানিস্? সুলতান যে আমাদের। গরীবদের জন্যে সুলতানের দুঃখের শেষ নেই।

জামান খাঁ নয় যেন অন্য কেউ! তাই মনে হয়েছিল সফির। কারণ, যে মানুষটা গরীবদের দোহাই দিয়ে তার মন ভেজাতে চেয়েছিল, তার স্বরূপটা সে বেশ ভালো ক'রেই জানে। আপন স্বার্থ আর লোভী মনের একটা জীবন্ত পশু। স্বার্থের এতোটুকু এধার-ওধার ঘটলে জামান খাঁ পারে না এমন কোনো কাজ নেই।

তাই দেখেছে সে। অনেকগুলো দিন মাস আর বছর সে নতুন নতুন পরিচয় পেয়েছে মানুষটার। মনে হয়েছে জামান খাঁ লোকটা মানুষ না অন্য কিছু?

সেদিন সর্দারের মুখে নতুন কতগুলো কথা শুনে মনে নতুন ক'রে আশংকা জেগেছিল। বুকটা কেঁপে উঠেছিল।

আর সে আশংকা যে তার মিথ্যে নয়, গরীবদের জন্যে সর্দারের মনের দরদ যে কোন্ পথ বেয়ে চলতে চেয়েছিল, আজ তা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট। সুলতান আজ সম্পূর্ণরূপে পাইক-সর্দারের হাতের মুঠোয়। জামান খাঁর ইচ্ছেই এবার থেকে সুলতানের ইচ্ছে-রূপেই কাজ করবে।

চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে সর্দার। সুলতানের প্রতি আমির-ওমরাহ্‌দের অসন্তোষের সুযোগটাকে নিজের কাজে লাগাতে চায়। আর সেইজন্যেই হয়তো শিকারের নামে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

নিজের এক্তিয়ার আর সামান্য যে ক'জন বিশ্বাসী মানুষ আছেন, যাঁরা তাঁর ভালো চান, মঙ্গল কামনা করেন তাঁদের কাছ থেকে নিজের কাজে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে আলোচনা হবে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের। পাইক-সর্দার জিন্দা থাকতে ভয় কী! শুধু হিস্যার গরমিল না হ'লেই হ'ল।

নিশ্চয়ই তাই। তার অন্ততঃ তাই মনে হয়। এই তিনটে বছরে হঠাৎ সুলতানের শিকার করার শখ জাগলো কেন? কেন······

: কিঁউ!

: এ্যাঁ! ভীষণভাবে চমকে উঠল সফি।

: ক্যা শোচতা?

: কুছ নেহি।

: তব?

এবার আর কিছু বলতে পারল না। একবার মনে হ'ল বলে: আমির-ওমরাহ্‌রা নয়, শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীনই তাকে সরাতে চায় ছুনিয়ার বুক থেকে। যাকে তিনি সরল বিশ্বাসে শিকারের নামে পাইক-সর্দারের সঙ্গে গোপন আলোচনায় নিয়ে যাচ্ছেন।

নিয়ে যাওয়ার কোনো বাধা যে আছে তা নয়। নাসিরুদ্দীনও তারই মতোই এক হতভাগ্য। হয়তো তার মতো নয়। সফি খেতে পেয়েছে, পরতে পেয়েছে আর কিছু নয়। কিন্তু নাসিরুদ্দীন সব পেয়েছে। সৌভাগ্য হাত ধরেছে তার। নাসিরুদ্দীন পেয়েছে পুত্র-স্নেহ। অপুত্রক সৈফুদ্দীনের সেই তো সব।

সফি শুনেছে, ছুনিয়ায় একমাত্র অকৃতজ্ঞ জীব মানুষ। সময়ে উপকারীর কথা বিস্মৃত হ'তে তার নাকি এক মুহূর্ত লাগে না। কারণ, স্বার্থ। আপন স্বার্থের জন্যে মানুষ সব করতে পারে। তখন সে তার বিবেক, বুদ্ধি, মনুষ্যত্ববোধের এতোটুকু মূল্য দেয় না। নিজের কথা ভাবে, স্বার্থ-সৌভাগ্য! কিন্তু সেই সৌভাগ্যটুকু সে কার দ্বারা অর্জন করেছে, অন্ধকার পিচ্ছিল পথ থেকে কে তাকে আলো দেখিয়েছে সেটুকু সে নিশ্চয়ই ভোলেনি, কিন্তু সেই জীবনদাতার চরম সর্বনাশের

বিনিময়ে সে যদি আরও লাভবান হয় তাহলে সে তার অবশিষ্ট বিবেক বোধটুকুকে গলাটিপে হত্যা করে। জীবনদাতার বুকে ছুরি চালায় হাসতে হাসতে।

কথাটা যেই বলুক, আজ বুঝলো কতোখানি সত্য। কারণ শাহ্‌জাদাও মানুষ। বাপ-মা-হারা অনিশ্চিত জীবন ছিল তারও। সৈফুদ্দীন তাকে পালন করেছেন, সৌভাগ্যের আসনে বসিয়েছেন। অথচ মানুষ এমনই, যিনি তাকে সব দিয়েছেন আজ নিজের স্বার্থের জন্যে তাঁর বুকেই ছুরি চালাতে চায়।

আর সে কাজের ভার দিতে চায় তাকে। আর একজন হতভাগ্যকে। সে নাকি যে-কোনো মুহূর্তে তুচ্ছ কাজটুকু শেষ করতে পারে।

পারে নাকি ?

পারে ?

পারেনি সফি। শাহ্‌জাদাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ইনামের প্রলোভনে মনটা লোভী হয়ে উঠলেও বিবেকের কশাঘাতে নিজেকে সংযত করেছে।

আর ভেবেছে। সমস্ত রাত্রি ছটফট করেছে সে। ঘুমে অচেতন সুলতানকে দেখেছে আর ভেবেছে। একবার মনে হয়েছে ভুল করল, যে ভুলের সংশোধন সমস্ত জীবনে হবে না। আবার ভেবেছে, ঠিকই করল। ভুল করেনি সে।

কিন্তু এখন কর্ত্তব্য কি তার ?

কথাটা প্রকাশ করবে ? সাবধান ক'রে দেবে সুলতানকে !

না, কিছুই করবে না। কারণ, তাতে ফল হবে না কোনো। উপরন্তু বিপদটা হয়তো তার দিকেই এগিয়ে আসবে। সন্তানস্নেহে বিশ্বাসী সুলতান হয়তো সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে নাসিরুদ্দীনকেই প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে বসবেন। হয়তো জানতে চাইবেন, সত্যিই সে মসনদটা চায় কি-না ?

সফি জানে না, হয়তো নাও হ'তে পারে, তবু তার বিশ্বাস না সরুদ্দীন সত্যিই যদি মসনদটা চায় তাহলে হাসিমুখেই তিনি তাকে সুলতানি দিয়ে দেবেন।

এইতো ক'দিন আগে। এমনি একটা সকালে সৈফুদ্দীন তাকে কাছে ডেকেছিলেন। সফি যেতে বলেছিলেন : জানো সফি, সুলতানি আমার আর আচ্ছা লাগছে না।

: কেন ?

: কেন জানি না। বোঝাতেও পারছি না। লেকিন সাচ বল্‌ছি, আমার ভালো লাগছে না আর। আমি হাঁফিয়ে উঠছি। আর ভাবছি...

কি ভাবছেন সেকথা জানতে চায়নি সে।

সুলতান বলেছিলেন : আচ্ছা, সফি !

: বলুন।

এই সুলতানিটা কেউ নেয় না ? এমন কেউ নেই যাকে দিয়ে আমি রেহাই পাই ?

: কী জানি !

হঠাৎ সৈফুদ্দীন বলেছিলেন : তুমি নেবে ?

ভীষণভাবে চমকে উঠেছিল। মনে হয়েছিল যেন ভুল শুনলো। জানতে চেয়েছিল : আমি ?

: হ্যাঁ, তুমি। তুমি নেবে এটা ?

হাসি পেয়েছিল সফির। সৈফুদ্দীনকে দেখে মনে হয়েছিল যেন মাথার ঠিক নেই। শরাবের নেশাটা খতম হ'লেও ভুল বকছেন।

: কি হ'ল, চুপ ক'রে রইলে কেন ?

: কী করবো নিয়ে ? আস্তে কথাটা বলেছিল সফি।

: কেন, সুলতানি করবে। মসনদে ব'সে সুলতান বনে যাবে। সব তোমার হবে।

লোভ দেখাচ্ছিলেন সৈফুদ্দীন। হয়তো ঠাট্টা করছিলেন। সফি বলেছিল : না।

: কেন? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

: আমি বেশ আছি।

সত্যিই তাই। সফি বেশ আছে। কেউ নিতে চাইলে সৈফুদ্দীনও হয়তো মসনদটা দিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তাতো হবে না। পাপের পথ যে বড় জটিল। কলিজার খুনে হাত রাঙিয়ে মসনদে বসায় যে আনন্দ আছে!

: ক্যা, দিমাগ ঠিক নেহি?

সৈফুদ্দীনের প্রশ্নে চমকে উঠল সফি। সহসা তার মুখে কোনো উত্তর যোগাল না।

তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে সৈফুদ্দীন বললেন: শোচতা কিঁউ?

: না-না!

: তব? হাসিমুখে চাইলেন তিনি।

বিব্রত বোধ করলে সফি।

হাসলেন সৈফুদ্দীন। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন: যবতক তুম ওয়াপস হ্যায়, তবতক হামারা কই ডর নেহি। ঔর হাঁ—শুনো, মেরা সাথ তুমকো জানা নেহি হোগা।

সফি চুপ ক'রে রইলো।

হাসলেন তিনি। বললেন: ওখানে জামান খাঁ থাকছে। যদি প্রয়োজন বোধকরি তোমাকে ডেকে পাঠাবো। ক'দিন বিশ্রাম নাও। লেকিন···

সফি তার মুখের দিকে চাইলো।

: তুমি যাও। বললেন তিনি।

বিদায় দিলেন। রাতের প্রহরীর ছুটি হ'ল।

॥ ছয় ॥

বাইরে বেরিয়ে এলো সফি।

আর প্রাসাদের দেউড়িতে পৌঁছোতেই অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে। অথচ তার সঙ্গে দেখা না হওয়াই উচিত ছিল। সরে যেতে চেয়ে ছিল—পারল না।

সুলতানের কাছ থেকে আজ খুশি মনে বিদায় নিতে পারেনি সফি। সঙ্গে যাবে ভেবেছিল। একবার সর্দারের সঙ্গে দেখা করা। তাকে সব কথা জানিয়ে দেওয়া। কিন্তু শেষমুহূর্তে সৈফুদ্দীনের সিদ্ধান্ত সবকিছু ওলট-পালট ক'রে দিল। আবার কবে যে সর্দারের সঙ্গে দেখা হবে, জানে না।

নাসিরুদ্দীনকে দেখে থমকে দাঁড়াল সফি। নাসিরুদ্দীনও চাইলো তার দিকে। একটু যেন হাসলও। সফির মনে হ'ল হাসি নয়, যেন চুরির ফলা।

ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছে নাসিরুদ্দীন। সকালেই যাচ্ছে সে। দুপুরে যাত্রা করবেন সুলতান।

শাহ্‌জাদার ঘোড়াটা নতুন। আরবী ঘোড়া, তেজি বলবান্। পিঠে সওয়ার চাপলে স্থির থাকতে পারে না। বন-বাদাড় ভেঙে ছোটে। যতোক্ষণ ক্লান্ত না হয় থামে না।

ঘোড়াটার প্রকৃতি অজানা নয় সফির। কারণ, ওর পিঠে জিন পরাবার প্রথম সৌভাগ্য তারই।

ক'মাস আগে আরব থেকে বণিকের দল এসেছিল গৌড়ে। প্রতি বছরই আসে তারা। নানান সামগ্রী নিয়ে হিন্দুস্থানে ব্যবসা ক'রে যায়। বিনিময়ে নিয়ে যায় মসলিন, হাতীর দাঁতের কাজ-করা নানান জিনিস। ছোরা-ছুরি-তলোয়ার।

দিল্লীর মসনদে এখন বাবর শাহ্। হিন্দুস্থানের মালিক তিনি। সফি শুনেছে তাঁর দরবার নাকি দেখার মতো। শুধু আরবী বণিক নয়, দুনিয়ার কোন্-কোন্ মুলুক থেকে বণিকের দল আসে।

বাদশাহ্ খুশি হ'লে, তাঁকে খুশি করতে পারলে বণিকের দলকে হিন্দুস্থানের আর কোথাও তাদের সওদা বিকোতে ছুটতে হয় না। দিল্লী থেকেই ফিরে যায়।

কিন্তু গৌড়ে আসে। আসে মসলিনের জন্যে। মসলিনের লোভ টেনে নিয়ে আসে এখানে। হয়তো এতো মুনাফা আর কিছুতেই লোটা যায় না ব'লে। শাহের হারেমে মসলিনের কদর বড় কম নয়।

গত বছর যখন বণিকের দল এসেছিল তখন দরবারে সফিও ছিল। সুলতানের একটা ঘোড়াও পছন্দ হয়নি। বলেছিলেন: ঘোড়া নেহি, বকরি মালুম হোতা। আচ্ছা জিনিস লাইয়ে।

তবে ফেরাননি তিনি। ঘোড়াগুলো নিয়ে নিয়েছিলেন। বণিকের দল ভালো ঘোড়া দিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিল।

এবার দিয়ে গেছে। এক নজরেই পছন্দ হয়েছিল সুলতানের। খুশি হয়েছিলেন। বকশিষ দিয়েছিলেন বণিকদের।

ঘোড়াটাকে পছন্দ হয়েছিল নাসিরুদ্দীনের। সৈফুদ্দীনের উপহার। কিন্তু উপহার দেওয়া প্রাণীটির স্বরূপ প্রকাশ পেতে খুব বেশি দেরি হয়নি। অনেকে জখম হয়েছিল। জখম হয়েছিল নাসিরুদ্দীন। চোট খেয়ে বাঁ হাতটা ভেঙে গিয়েছিল তার।

সেদিন এই দেউড়ির কাছেই ঘটনাটা ঘটেছিল। রাতের প্রহরা শেষ ক'রে আস্তানায় ফিরছিল সে। হঠাৎ একটা হৈ-হৈ চিৎকারে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দেখেছিল সে দৃশ্য। আর সে দৃশ্য দেখে সেও যদি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো তাহলে হয়তো নাসিরুদ্দীনের জানটা নিয়েও টানাটানি চলতো। কারণ ঘোড়াটা তখন ক্ষেপে গেছে।

সফি দাঁড়ায়নি। নিজের কথাটা একবারও মনে হয়নি তার।

ছুটে গিয়ে নাসিরুদ্দীনকে উদ্ধার করেছিল। তার জান বাঁচিয়েছিল।

সেই থেকেই পরিচয়। একটু বা অন্তরঙ্গতা। নিজের মহালেও ক'বার নিয়ে গেছে তাকে।

ঘোড়াটাকে দেখল সফি। ছাই-ছাই, পাঁশুটে। শাহ্‌জাদার মুখের রঙটাও যেন ঈষৎ পাংশু। চিন্তাক্লিষ্ট। একটু যেন ক্লান্ত ভাব।

চোখাচোখি হ'ল দু'জনের। নাসিরুদ্দীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মুখটা নীচু ক'রে নিল সফি। যেন সেই অপরাধী।

সপাং ক'রে চাবুকের শব্দ হ'ল। চমকে মুখ তুললো সে। দেখতে পেল সওয়ার নিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়েছে ঘোড়াটা।

নাসিরুদ্দীনের মনটা বড় বেপরোয়া। জীবনটাও। শুধুমাত্র বেঁচে থাকাটাও তার কাছে কিছুই নয়, তাই ভোগ আর বিলাসের প্রতি বড় বেশি ঝোঁক তার।

সফি জানে এ সত্য নয়। নাসিরুদ্দীনকে বেপরোয়া জীবন যাপনে বাধ্য করাচ্ছে তার ইয়ার-দোস্তের দল, তার মন্ত্রণাদাতারা। তারা তাকে বুঝিয়েছে স্বাধীনতা এবং সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে না পারার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

প্রধান মন্ত্রণাদাতা হাবশ খান। নাসিরুদ্দীনের শিক্ষাগুরু তিনি। জীবনের প্রথম পাঠ সে তাঁর কাছেই নিয়েছে।

প্রবীণ ব্যক্তি। শ্বেতশুভ্র মাথার চুল। জরাজীর্ণ দেহটা বয়েসের ভারে অনেকখানি নুয়ে পড়েছে সামনে দিকে। মুখে হাসি। হাসি ছাড়া কথা বলেন না। কাউকে কড়া কথা বলার দরকার হ'লেও তিনি হাসতে হাসতেই বলেন।

কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তাঁর কালো মুখের অমায়িক হাসির অন্তরালে কি ভয়ংকর ক্রূরতার প্রকাশ। প্রাসাদের মানুষ নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করে, শাহ্‌জাদা হাবশ খানের খেলার

পুতুল! বৃদ্ধ শকুনটা বড় সাংঘাতিক। ছানিপড়া চোখ দু'টোতে কারো ভালো দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই।

আর সিদিবদর?

মানুষটাকে সব সময় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে সফি। কখনো যদি সামনে পড়ে—মুখোমুখি হয়, কেমন যেন গাটা ছমছম ক'রে ওঠে তার। একটা সীমাহীন রুক্ষতা, ভয়ংকরের প্রকাশ লোকটার মুখে। হাবশী শরীরে শয়তান যেন!

শয়তানির শেষ নেই সিদিবদরের। শাহ্‌জাদা সহায় ব'লে যখন তার যা ইচ্ছে ক'রে বেড়াচ্ছে। কারো পরোয়া করে না। আদেশ মানা-না-মানার তোয়াক্কা রাখে না। আর, খোদ সুলতানও যেন সিদি-বদর সম্পর্কে কিছুটা দুর্বল। তিনি যেন ওই শয়তানটাকে কিছুটা সমর্থনও করেন।

সিদিবদরের প্রতি সুলতানের এই পক্ষপাতিত্ব বা দুর্বলতাটুকু সমর্থন করতে পারে না সফি। তার মনে হয়, শুধু মনে হয়ই বা কেন, তার দৃঢ় বিশ্বাস সুলতান যে-কোনো কারণেই হোক সিদিবদরের প্রতি পক্ষপাতে দুষ্ট। আর এজন্যে তাঁর মনে অশান্তি-আতংক জেগে থাকে।

কথাটা সিদি বদর প্রসঙ্গে একদিন ব'লে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন বেগম। রাতের প্রহরী সে, তার কানে এসেছিল।

নাসিরুদ্দীন সম্পর্কে কথা বলেছিলেন বেগম। সুলতানকে বলে-ছিলেন: শাহ্‌জাদাকে এবার একটু সামাল দিন!

: কেন? শান্তকণ্ঠেই বেগমের কথার শেষে জানতে চেয়েছিলেন সৈফুদ্দীন। যেন কিছুই জানেন না, কথাটা নতুন শুনলেন।

: আপনি কি কিছুই জানেন না? বেগমের কণ্ঠটা উষ্ণ শুনিয়েছিল।

: কী জানি? শেষ চেষ্টা করেছিলেন যেন তিনি।

: আপনার কানে কোনো কথা আসে না?

: আসে।

: তবে?

: কী ?

সুলতানের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়েছিলেন বেগম। কি যেন দেখেছিলেন। ওদিকে দেখবে না ভেবেও না দেখে পারেনি সফি। কক্ষের আব্ছা আলোতেও বেগমের মুখটা কঠিন দেখিয়েছিল।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বেগম বলেছিলেন : শাহ্জাদাকে আপনি শাসন করুন।

: শাসন। যেন চমকে উঠেছিলেন সৈফুদ্দীন।

: হ্যাঁ, শাসন। তাকে সাফ জানিয়ে দিন এবার থেকে সে যেন সংযত হয়। আপনার মান-সম্মান যাতে ক্ষুণ্ণ হয় তেমন কাজ যেন না করে। আর তা যদি সে না পারে, আপনার হুকুম যদি না শোনে, তা'হলে…

: কী ?

একটু চুপ করেছিলেন বেগম। একটু ভেবেছিলেন। সুলতানের সেই কিছু না-জানা, জানতে চাওয়া ভাবটা আর মুখের অবস্থাটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন। তারপর শান্ত অথচ জ্বালাভরা কণ্ঠে বলেছিলেন : শাহ্জাদার পেয়ারের দোস্ত সিদিবদর দিন দিন কি ক'রে বেড়াচ্ছে তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ?

: দেখছি তো।

: তবে ?

: কী ?

: একটা কিছু করুন। না হ'লে…। না, বেগম তাঁর কথাটা শেষ করেননি। সুলতানের মুখের দিকে আবার তিনি তাকিয়ে ছিলেন। এবার তাঁর মুখটা ফ্যাকাশে দেখিয়েছিল। তিনি প্রতিকার কামনা করেছিলেন। মনের আতংকটা গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেননি।

সুলতানের কণ্ঠটাও ফিস্‌ফিসিয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর মনের অশান্তি আর আতংকটাকে গোপন করতে চাননি। বেগমের মুখের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন : আমিও ভেবেছি। লেকিন…

: কী : জানতে চেয়েছিলেন বেগম। তাঁর কণ্ঠে ব্যাগ্রতা প্রকাশ পেয়েছিল। একটু কাছে সরে এসেছিলেন।

: কিছু একটা করতে হবে। বলেছিলেন সৈফুদ্দীন। এইভাবে নাসিরের দোস্ত যদি অশান্তি বাধায় ক্ষতি আমারই। বদনামী হয়ে যাচ্ছি আমি। আমার জবান মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে! মানুষ আমাকে বেইমান ভাবছে। আমি যে তাদের কথা দিয়েছিলুম, তাদের ভালো করবো। ক্ষতি যে করতে যাবে তার কলিজা ছিঁড়ে নেব।

: তাহলে ?

বেগমের এই প্রশ্নের উত্তর সহসা দিতে পারেননি তিনি। চিন্তা করেছিলেন। অনেকক্ষণ নীরবে বসেছিলেন। তারপর বলেছিলেন : বড় মুশকিলে পড়েছি আমি।

: কি মুশকিল ?

: শাহ্‌জাদা বা তার দোস্ত যে মানুষের ঘর জ্বালাচ্ছে তার যে প্রমাণ নেই।

: প্রমাণ ?

: হ্যাঁ।

: কি প্রমাণ চান ?

: আমি চাই না। তারা যে একাজ করছে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। চুপি চুপি নিজেদের কাজ হাসিল করছে তারা। মানুষকে জানবার সুযোগ দিচ্ছে না, সাবধান হ'তে দিচ্ছে না। জানছি পরে। তারা তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

: লেকিন, তারাই যে করছে এ তো মিথ্যে নয় ?

: তা হয়তো নয়।

: তবে ?

: কী ?

: সব তো বুঝতে পারছেন ?

: তা পাচ্ছি। সকলেই পাচ্ছে। তারা ভিন্ন অমন সাহস যে কারো হবে না তাও ঠিক। তবু···

: কী ?

: ধরতে না পারলে কিছু করা যাবে না।

: তারা যাতে ধরা পড়ে, শাস্তি পায়—তার ব্যবস্থা কিছু করেছেন কি ?

: না।

: তাহলে কেমন ক'রে ধরা পড়বে তারা ? বরং আপনি তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন, অন্যায়কে সমর্থন করছেন। সাহসী হচ্ছেন না কিছু করতে।

: না-না !

: না নয়, হ্যাঁ। কথাগুলো জোরের সঙ্গেই উচ্চারণ করেছিলেন বেগম সাহেবা। উত্তেজনায় থর-থর ক'রে কেঁপেছিল তাঁর সর্ব-শরীর। সুলতানের চোখের দিকে স্পষ্টভাবে তাকিয়েছিলেন।

সৈফুদ্দীন কথা বলেননি। বেগমের অভিযোগের প্রতিবাদও করেননি। তখন তাঁকে কেমন যেন মনে হয়েছিল। অসহায়, দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। তিনি চোখের কাছে বাঁ হাতটা তুলে ধরেছিলেন। আলোটুকু আড়াল করতে চেয়েছিলেন যেন।

হঠাৎ চুপ ক'রে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে বেগমের কণ্ঠটা কানে এসেছিল। ধীর মৃদুকণ্ঠে তিনি বলেছিলেন : আমার কথায় রাগ কোর না তুমি।

: তুমি ঠিকই বলেছো। লেকিন······

: তুমি সুলতান।

: হ্যাঁ।

: দেশের মানুষ তোমাকে পেয়ার করে।

: আমি জানি।

: তাদের ঘর ভাঙতে দিও না।

সুলতান কিছু বলেননি। তাঁর কণ্ঠস্বরটা আর শোনা যায়নি। বেগমও নীরব ছিলেন। আলোটা ম্লান হয়েছিল। সরে এসেছিল সফি।

সিদিবদর সম্পর্কে সত্যই সুলতানের মনটা কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত। সিদিবদর বেপরোয়া। আর সেইজন্যেই বোধহয় নাসিরুদ্দীন আজ সাহসী হয়ে উঠেছে। মসনদ তাকে পাগল করেছে। জীবনের ঋণকে সে অস্বীকার করতে চায়।

সফিও নিরুপায়। তারও কিছুই করার নেই। তবু সে সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে। যদি কোনোদিন সিদিবদর বা হাবশ খানকে নাগালে পায়, তাহলে তার নির্ভুল লক্ষ্য ব্যর্থ হ'তে দেবে না। আর সেইজন্যেই সে তার তূণে ক'টা বিষাক্ত ফলাও সঞ্চয় ক'রে রেখেছে। কিন্তু সেদিন কবে আসবে, আদৌ আসবে কি-না, তা সে জানে না।

নানা চিন্তায় আচ্ছন্ন মনটা নিয়ে সেনানিবাসে ফিরে চললো সফি।

॥ সাত ॥

সমস্ত দিনটাই আজ একরকম শুয়ে-বসেই কেটেছে সফির। অন্য দিন প্রাসাদ থেকে ফিরে শুয়ে পড়ে। শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখের পাতায় নেমে আসে রাজ্যের ঘুম। ঘুমিয়ে পড়ে সে।

ঘুম ভাঙায় বাবুর্চি বুড়ো। গাল-মন্দ দিতে দিতে ঘুম থেকে জাগায়। রোজই খাবার জন্যে ডেকে তুলতে হয়।

কিন্তু আজ কি যেন হয়েছে তার। সমস্ত দিনে দু'চোখের পাতা এক ক'রতে পারেনি। বারবার চোখ বুজে এসেছে। ঘুমের ঢল নামতে চেয়েছে সমস্ত দেহ-মন জুড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা এসে কেড়ে নিয়েছে ঘুমটুকু।

বিরক্তি বোধ করেছে। মন থেকে চিন্তা দূর করতে চেয়েছে। পারেনি, ব্যর্থ হয়েছে। মনে পড়েছে বিগত সন্ধ্যাটাকে। শাহ্‌জাদা

নাসিরুদ্দীনকে। মসনদের লোভে ক্ষিপ্ত-জ্ঞানহারা একটা মানুষ। আর অসম্ভব প্রলোভনের কথাটা।

ইচ্ছে করলে সে পারে। পারে যে-কোনো মুহূর্তে। সে রাজী না হ'লে কেউ-না-কেউ নিশ্চয় খতম করবে সৈফুদ্দীনকে। শত চেষ্টাতেও রক্ষা করতে পারবে না। সুলতান সৈফুদ্দীনের ইন্তেকাল আসন্ন। জিন্দা থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

আপসোস হয় তার। অনেকবার নিজের মনে চিন্তা করেছে সে। দুনিয়াটা বড় আজব জায়গা। ভালো মন নিয়ে, ভাল মানুষ হয়ে এখানে কেউ বেশিদিন বাঁচতে পারে না।

আজ সফিও বাঁচতে চায়। মুক্তি তার কাম্য। বর্তমানের এই যে জীবন এ-জীবনটা তার কাছে আজ অসহ্য বোধ হচ্ছে। বন্দী জীবন! দাসত্ব! পরাধীনতার গ্লানি! অন্যের ইচ্ছেই আজ তাকে চালিত করছে।

আর সেইজন্যেই মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় পালিয়ে যায়। দূরে অনেক দূরে। কোথায়—তা সে জানে না।

জমিলাও বুঝি তাই চায়। ওর মনের কথাও বুঝি তাই। মুখে কিছু না বললেও মনে হয় সফির। কসবীর মেয়ে জমিলা সুস্থ জীবন কামনা করে।

না, জমিলাকে সে ঘৃণা করে না। ওর পুষ্ট দেহটা বা যৌবনের অবুঝ মনটার জন্যে নয়। ওর কথা অনেক ভেবেছে। পেয়ার—দয়া বা মমতা নয়। ওর জন্মটাও মনে রেখাপাত করেনি।

একদিন ভাবতে ভাবতে কথাটা মনে হয়েছিল তার। একটা নতুন কথা। মানুষের জন্মটা একই সূত্রে গাঁথা। কামের দাসত্ব ছাড়া তো জন্ম সম্ভব নয়। নিষ্কাম পেয়ার মিথ্যে, মনুষ্যত্বের অবমাননা।

শুধু জমিলা কেন, জমিলার মতো যারা—সে ছেলে বা মেয়ে যেই হোক না কেন, তাদের বেজন্মা বলার কোনো অধিকার আমাদের নেই। আমাদের সকলের জন্মই তো এক। আমরা সকলেই তো কামজ সন্তান।

যারা অসামাজিক পরিবেশে, দুর্ঘটনায় বা পঙ্কিল আবর্তের মাঝে সূর্যের আলো দেখে, লজ্জা, ঘৃণা, হেনস্তা ভোগ করে—তাদের সুস্থ জীবন এবং নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য। মানুষের কর্তব্য।

তাই সফি ভেবেছে। মনে মনে স্থিরসংকল্প সে। যদি সম্ভব হয়, তাহলে ওই মেয়েটাকে নিয়েই ঘর বাঁধবে। ওকে কোনোদিন বুঝতে দেবে না ওর জন্ম-পঙ্কিলতাকে, জীবনের চরম লজ্জাকে ঢেকে দেবে তার প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে।

ওকে ভালোবাসবে। ওর অধিকার স্বীকার ক'রে নেবে। সুখ-শান্তি, সম্মানে ওকে পূর্ণ ক'রে তুলবে। নীড়ের সার্থক স্বপ্নে ওকে বিভোর ক'রে রাখবে।

সমস্ত দিন আরও অনেক অসম্ভব চিন্তায় মনটা ভরেছিল তার। নাসিরুদ্দীনের কথা মনে করবে না ব'লেই অনেক বাজে কথা ভেবেছে। ক্লান্ত হয়েছে। অসহ্য বোধ করেছে।

কখনো উঠে পায়চারি করেছে। ঘাড়ে মাথায় জল দিয়েছে। শুয়ে ঘুমোতে চেয়েছে। ঘুম আসেনি। ঘুমোতে পারেনি আজ।

দুপুরে সেনানিবাসটা শূন্য পড়ে থাকে। দরজা-জানালাহীন ঘরগুলোতে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। মানুষগুলো আপন আপন নানান কাজে ব্যস্ত। ঢাল, বল্লম, সড়কি নিয়ে কেউ ঘোড়ায়, কেউ বা পায়ে হেঁটে গৌড়ের পথে-বাজারে টহল দিয়ে ফেরে। ফিরে আসে সন্ধ্যায়। খায়-দায় আর ঘুমিয়ে পড়ে বা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করে। কেউ বা চুপি চুপি বদ মতলবেও বেরোও।

অনেকেই তার পরিচিত। অসদ্ভাব কারো সঙ্গেই নেই। তবে ওদের সঙ্গে গল্প ক'রে সময় কাটানো বড় একটা ঘটে না তার। কারণ, ওদের নির্দিষ্ট কাজের সময় আছে, আছে ছুটি, কিন্তু সফির কিছু নেই। ছুটি যে কি জিনিস তা সে জানে না।

এই যে ক'দিন সুলতান প্রাসাদে থাকবেন না। তবু তাকে তাঁর

কক্ষটি রাতে পাহারা দিতে হবে। এর আগেও হয়েছে। তার কারণ যদি তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে দুশমনের দল কোনো ফাঁদ পেতে রাখে।

আজও কেউ ছিল না। ঘরগুলো শূন্য পড়েছিল। দুপুর পার হওয়া বাঁকা রোদ্দুরটা এসে পড়েছিল কোথাও-কোথাও।

সফির ঘরটায় সারাদিনে একটু রোদ্দুরের মুখ দেখা যায় না। সব সময় ছায়া-ছায়া অন্ধকার, ভ্যাপসা গন্ধে পূর্ণ হয়ে থাকে। অন্যদিন সমস্ত রাত্রি জাগরণ ক্লান্ত দেহটা শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে। আলো-বাতাসহীন অন্ধকার আর ভ্যাপসা গন্ধটা এতোটুকু ব্যাঘাত ঘটায় না ঘুমের। আজ ঘটিয়েছে। ঘুমোতে পারেনি, অসহ্য বোধ করেছে। একটা শিরশিরে যন্ত্রণা। মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে।

শুয়ে থাকতে পারেনি। ঘরটা ছেড়ে বাইরে এসেছিল। ঘুরে বেড়িয়েছিল অন্য ঘরগুলোতে। যে ঘরগুলো অন্যদিন দুপুরে পড়ে থাকে। আজ মানুষের পদচিহ্ন পড়েছিল। দুপুরের রোদ্দুরে ছায়া কেঁপেছিল একটা মানুষের।

ঃ কিরে কি হ'ল আজ তোর? একটা ভাঙা ভাঙা কর্কশ কণ্ঠের প্রশ্ন তাকে থামিয়ে ছিল এক সময়। বাবুর্চি বুড়োকে দেখতে পেয়েছিল। জীর্ণ দেওয়ালটায় পিঠ দিয়ে ঝিমুচ্ছিল বুড়ো।

সফি বলেছিল ঃ ঘুরে দেখছি।

ঃ কেন রে?

ঃ এমনি!

ঃ ঘুমোবি না?

ঃ ঘুম আসছে না। সত্যি কথাটাই বলেছিল। গতকাল সন্ধ্যার পর থেকে কেমন আপনজন ব'লে মনে হয়েছে লোকটাকে।

বাবুর্চি বুড়ো একটু দেখেছিল তাকে। কথাটা শুনে একটু অবাক হয়েছিল বুঝি। কারণ, যাকে রোজই অচেতন হয়ে ঘুমোতে দেখে হঠাৎ কি এমন হ'ল যাতে এক রাতেই ঘুম ছুটে গেল চোখ থেকে। প্রশ্ন করেছিল তাই ঃ কেন রে?

ঃ কী জানি! সফির গলাটা অসহায় শুনিয়েছিল।

ঃ সত্যি বলছিস্।

ঃ সত্যি।

ঃ আমার একটা কথা শুন্‌বি?

ঃ কি কথা?

ঃ যদি শুনিস্ তাহলে ঘুম আসবে।

ঃ আসবে? সাগ্রহ জেগেছিল তার কণ্ঠে। কারণ, সফি ঘুমোতে চাইছিল। সমস্ত রাত্রির জাগরণের ক্লান্তি অসহ্য বোধ হচ্ছিল তার। সে জেগে থাকতে পারছিল না, কষ্ট হচ্ছিল।

বুড়ো ছানিপড়া চোখ দু'টো পিটপিট করে দেখেছিল। ছোড়াটা তারই মুখের দিকে 'হাঁ' ক'রে চেয়ে আছে। বলেছিল ঃ শুন্‌বি আমার কথা?

ঃ শুনবো। যে-কোনো কথাই সে শুনতে রাজী। সে ঘুমোতে চায়। চিন্তার হাত থেকে মুক্তি চায়। নাসিরুদ্দীনের ইনামের লোভটা তাকে অস্থির ক'রে তুলছিল।

ঃ সাদি কর্, দেখ্‌বি ঠিক ঘুম আসবে। হাসতে হাসতে কথাটা বলেছিল বুড়ো ঃ মেয়েমানুষের ওম্ না পেলে জোয়ান বয়েসে এমনি হয়, বুঝ্‌লি?

বাবুর্চি বুড়োর কথাগুলো খারাপ। অন্য সময় হ'লে দু'চারটে কথা হয়তো শুনিয়ে দিত। কিন্তু তখন বোকার মতোই জানতে চেয়েছিল ঃ কেন?

ঃ বুদ্ধু কাঁহাকা! খিঁচিয়ে উঠেছিল বুড়ো। তুই একটা মাদি কুত্তি, যা ভাগ।

আরও অনেকগুলো অশ্লীল গালি দিয়েছিল বুড়ো। আর তখন সফির এমনই মনের অবস্থা তার প্রতিবাদ পর্যন্ত করেনি। চলে আসছিল চুপচাপ।

বুড়ো ডেকেছিল ঃ এই ইধার আয়।

ফিরেছিল সফি।

বুড়ো বলেছিল : কী হয়েছে তোর ?

: ঘুম আসছে না।

: কেন ?

: কি জানি।

চিন্তিত হয়েছিল বুড়ো। বলেছিল : কাল রাতে ঘুমিয়েছিলি ?

: না।

: তাহলে রাতভোর জেগেও ঘুম আসছে না কেন ?

: কি জানি !

: ঠিক ক'রে বল্।

সফি চুপ করেছিল। একবার ভেবেছিল বলে। সত্যি কথাটা প্রকাশ করে। হয়তো মনটা হাল্কা হবে। ভারমুক্ত হ'লে ঘুম আসবে।

পারেনি। কথাটা কাউকেই হয়তো বলা যায় না। তাই চুপ করেছিল।

গম্ভীরভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে অনেকক্ষণ ভেবেছিল বুড়ো। কুতকুতে চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল বারবার। যেন বিশ্বাস করতে চাইছিল না মনটা। তাই জিজ্ঞাসা করেছিল : সাচ বলছিস্, ঘুমোতে চাস্ তুই ?

: হ্যাঁ।

: একটা কাজ কর্‌বি ?

: কী ?

: শরাব খাবি ?

: শরাব ?

: হ্যাঁ।

: কেন ?

: ঘুম আসবে। ঘুমোতে পারবি। এখনি ঘুমিয়ে পড়বি।

: না।

: কেন রে ?

: শরাব খেয়ে ঘুমোতে চাই না আমি।

: তাহলে এমনি জেগে থাকবি ? ছটফট করবি ? বলিস্ তো দিয়ে দিই। আমার কাছে আছে। একটু খেলেই হবে।

: না।

: ভেড়ুয়া কাঁহাকা ! তেড়ে উঠেছিল বুড়ো : যা ভাগ—ভাগ। একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিল। গালির বন্যা ছুটিয়েছিল। চলে এসেছিল সফি। এসে শুয়েছিল আবার।

ঘুম আসেনি।

এখন বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো সফি। চোখ দু'টো জ্বালা-জ্বালা করছে। মুখটা বিস্বাদ, একটু তেঁতো-তেঁতো : দেহটা আলস্যে ভরা। আর গাঁটে-গাঁটে কেমন ব্যথা অনুভব করল।

এসময় কোনোদিনই নিজেকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখে না। কিন্তু আজ আর কোথাও বেরুতে ভালো লাগল না। বাইরে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে পেল, দিনের সূর্যটা তখনও বেশ উজ্জ্বল। গোধূলির আবিরে আল্পনা আঁকার তখনও দেরি আছে।

আকাশের আলো, রঙ আর পাখিদের ডাক শুনতে শুনতে হঠাৎই এক সময় ক্লান্ত দেহ-মন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সফি। তারপর গত সন্ধ্যায় দুঃস্বপ্ন দেখার স্থানটার দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে।

আকাশের রঙ মুছে গেল এক সময়। ধূসর সন্ধ্যা। নিস্তব্ধ নিঝুম। পাখিদের কাকলি ধ্বনি। ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছে। লাল আবিরের মাঝে কালো ওড়নায় মুখ ঢাকছে গোটা আকাশটা। আশ-পাশের বাবলা, আসশেওড়া আর বাঁশের বনে শেয়ালগুলোর চিৎকার আর ছোটাছুটি শুরু হয়েছে।

গাটা ছমছম ক'রে উঠল সফির। একটা অজানা আতংক।

বুকের মধ্যে প্রাণটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। ফিরেও আসছিল। বাধা পেল। বাধা দিল শাহ্‌জাদার খাস বান্দা, খোজা বাহারাম।

ডেকে থামিয়ে কাছে এলো। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকটা দেখে নিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো : এত্তেলা পাঠিয়েছেন ওস্তাদ।

: এত্তেলা! বিস্মিত হ'ল সফি।

: হাঁ-হাঁ।

: কৌন ?

সফির এই প্রশ্নে হাসি ফুটলো বাহারামের মুখে। ইস্পাতের মতো কঠিন পেশীবহুল শরীরটা সেই নীরব হাসিতে বুঝি একটু কেঁপেও উঠল। সে বুঝতে পারল না বুদ্ধুর মতো এই প্রশ্নটা কেমন ক'রে তাকে করতে পারল সফি।

গৌড়বাসীদের কাছে শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীন তার দুর্নামের জন্যে যেমন পরিচিত, তেমনি নাসিরুদ্দীনের খাস বান্দা বাহারামও কম পরিচিত নয়।

হারেমের খোজার দল দিনে-রাতে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। বাইরের মানুষজনের মাঝে তাদের যাওয়া-আসা ঘটে না বললেই চলে। বাঁদীদের মতো বন্দী জীবন যাপন করতে তারাও বাধ্য হয়।

কিন্তু শাহ্‌জাদার খাস বান্দা খোজা বাহারাম একরকম মুক্ত বললেই চলে। মুক্ত এই অর্থে যে, সে তার ইচ্ছেমতো বাইরে বেরুতে পারে। এমহাল-ওমহাল ক'রে। পথে বেরোয়।

সফি তার পরিচিত। আরবী ঘোড়ায় সওয়ার হ'তে গিয়ে শাহ্‌জাদার সেই দুর্ঘটনার পর আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে তারা। ঘটনাস্থলে সেদিন বাহারামও উপস্থিত ছিল। উপস্থিত ছিল অনেকেই। কিন্তু নাসিরুদ্দীনের জান বাঁচিয়ে ছিল সফি। নিজের বিপদ তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে গিয়েছিল, শাহ্‌জাদাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে এনে বশে এনেছিল ঘোড়াটাকে। আর সেই থেকেই বাহারামের চোখে সে ওস্তাদ।

বাহারামেরও কিছু-কিছু দুর্নাম আছে। সফি শুনেছে নাসিরুদ্দীনের জন্যে সে নাকি এগ্রাম-ওগ্রাম ঘুরে বেড়ায়। গৃহস্থের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে।

তবু বাহারামকে তার খারাপ লাগে না। লোকটা অদ্ভুত চালাক আর ধূর্ত হ'লেও কেমন যেন অসহায়। একটা অসুখী লজ্জা ওকে ঘিরে রাখে। চোখে-মুখে ম্লান ছায়া। ব্যর্থ জীবনের বিড়ম্বিত পথ চলা। ইচ্ছে নয়, বাধ্যতা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। নীরবে নতমস্তকে আদেশ পালন করে। কারণ করতে ও বাধ্য।

একদিন বলেও ছিল সেকথা। সেদিন রাতের শেষে ফিরছিল। দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। অন্যদিন দেখা হ'লে দাঁড়ায়, একটা-দু'টো কথা বলে। কাজের খুব তাড়া থাকলে একটু হেসেও যায়।

সেদিন কিছুই করেনি। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল।

তখন একটু কেমন বোধ হ'লেও সারাদিনে কথাটাকে মনে রাখেনি সফি। ভুলে গিয়েছিল। প্রতিদিনকার জীবনটা সহজভাবেই বহে চলেছিল।

সন্ধ্যায় সুলতানের কাছে আসছিল সফি। দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল বাহারামকে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

সফি নিজের মনেই এগিয়ে এসেছিল। বাহারামকে দেখেছিল। হেসেছিল বাহারাম।

ঃ ক্যা হুয়া? জানতে চেয়েছিল সফি।

ঃ কুছ নেহি।

ঃ তব খাড়া হ্যায় ক্যাহে?

ঃ আপকো ওয়াস্তে।

ঃ হামারা ওয়াস্তে? অবাক হয়েছিল সফি। বুঝতে পারেনি বাহারামের কথাটা।

ঃ জী হাঁ। বলেছিল বাহারাম ঃ হামারা কসুর মাপ কর দেনা।

ঃ ক্যা কসুর? কথাটা যেন বিশ্বাস হয়নি তার। বাহারাম তার

কাছে কোনো অপরাধ করেছে, এমন কোনো কথা মনে হয়নি তার। বলেছিল : ক্যা, দিমাগ ঠিক বা ?

: জী।

: হামারা মালুম হোতা কি, জরুর তোমারা দিমাগ কুছ না কুছ গড়বড় হুয়া।

: ম্যায় সচ বলতা।

: ম্যায় ভি ?

: মাপ কর দেনা।

: লেকিন, কিস লিয়ে মাফি মাংতা মেরা সমঝ মে অ্যাতা নেহি।

বাহারাম সকালের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিল। মুগ্ধ হয়েছিল সফি। বাহারামকে বড় ভালো লেগেছিল তার। দু' হাতে ওর একটা হাত জড়িয়ে বলেছিল : এইসি মত বোল।

: সচ্চাই বোলতা ওস্তাদ। বলছিল বাহারাম : কিন্তু আমি আর পারছি না।

: কি পারছো না ? জানতে চেয়েছিল সফি।

: এই জীবনটাকে বহে বেড়াতে।

: কেন ?

: এ জীবটা যে কি যারা এ-জীবনের অধিকারী নয় তারা বুঝতে পারবে না। এ-জীবনটার কথা কাউকে ব'লে বোঝানো যাবে না।

: খুব কষ্ট ? সফির কণ্ঠে সমব্যথীর সুর বেজেছিল।

: কষ্ট ! বাহারামের মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটেই মিলিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল : না, ওস্তাদ কষ্ট নয়। তবে দুঃখ, লজ্জা, ঘৃণা সবকিছু মিশে আছে এ-জিন্দিগিটায়। খোজা নয়, জানোয়ার। মানুষের অধিকার হারা একটা জীব ভিন্ন আর কিছুই নই আমরা। মানুষ ব'লে কেউ মনে করে না, মানুষের ব্যবহারও কেউ করে না আমাদের সঙ্গে।

কান্না শুনেছিল সফি। বাহারামের কণ্ঠে আকুল আর্তনাদ।

মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু ওকে বোঝায়, সান্ত্বনা দেয় এমন ভাষা খুঁজে পায়নি।

বাহারাম বলেছিল। সফিকে প্রশ্ন করেছিল। উত্তর শুনতে চেয়েছিল : আচ্ছা ওস্তাদ, আমাদের এই অবস্থার জন্যে দায়ী কে? আমাদের গুণাহ কোথায়?

উত্তর দিতে পারেনি সফি। উত্তর তার জানা ছিল না। আজও জানে না।

শুধু গৌড়ে নয়, বাংলায় নয়, সারা হিন্দুস্থানে—তামাম দুনিয়াটাতেই খাদ্যের অভাব। ধনীর ঘরে প্রাচুর্য আর গরীবের ঘরে দু'বেলা দু'মুঠো ক্ষুধার অন্ন জোটে না। ধনী-গরীবের ব্যবধান চিরকালের। গরীবেরা অন্নের অভাবে, পেটের জ্বালা মেটাতে কোলের সন্তানকে বিক্রি ক'রে দেয়। জহ্লাদের দল নির্মমভাবে শিশুকে খোজা করে। খোজার মুল্য যে ধনীর ঘরে অনেক। খোজা সব পায়—হারায় মানুষের অধিকার। জানোয়ারের অধম হয়ে কাটাতে হয়ে জিন্দিগিটাকে।...এছাড়া কিছু শয়তানের দল আছে। হয় চুরি করে, নয় লুটে নিয়ে আসে মায়ের কোল থেকে শিশুকে। খোজা বানিয়ে সম্পদ বাড়ায় তারা।

বাহারামের কিছু মনে নেই। পুরানো কথা কিছুই মনে করতে পারে না সে। জানে না কেমন ক'রে তার এমন অবস্থা হ'ল। কে দায়ী এর জন্যে।

বলেছিল : আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো ওস্তাদ?

: কী?

: শেষ হয়ে যাই, জিন্দিগিটাকে নিজের হাতে খতম ক'রে দিই।

: কেন?

হেসেছিল বাহারাম। বলেছিল : জিন্দা থেকে লাভ কি?

: তবু...। সফি যেন শেষ চেষ্টা করেছিল। বোঝাতে চেয়েছিল।

তেমনি হেসেছিল বাহারাম। বলেছিল : সত্যিই কোনো লাভ নেই ওস্তাদ!

সফির সেই প্রশ্নটা শুনে নিঃশব্দে একটু হেসেছিল বাহারাম। তারপর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে এনে চুপি চুপি বললে : নজরবিবি সেলাম দিয়েছে ওস্তাদ!

: কৌন? চমকে উঠল সফি।

: নজরবিবি। বললে বাহারাম।

: নজরবিবি!

সফির বুকের মধ্যেটা কেমন যেন শিরশির ক'রে উঠল।

একটু অপেক্ষা করল যেন বাহারাম। বললে : পয়ছন্তা নেহি?

বাহারামের প্রশ্নটায় 'না' বলতে পারল না সে। 'হ্যাঁ' বলাও সম্ভব হ'ল না তার পক্ষে। মনে করবার চেষ্টা করল নজরবিবিকে।

মনে পড়ল।

নাসিরুদ্দীনের সেই দুর্ঘটনার পর তাকে যখন তার হারেমে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তখন সফিও সঙ্গে গিয়েছিল। যেতে হয়েছিল তারই অনুরোধে।

মহালে খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল আগেই। অনেকেই ভিড় ক'রে এসেছিল দেখবে ব'লে। বান্দার দল ধরাধরি ক'রে নাসিরুদ্দীনকে পৌঁছে দিয়েছিল নজরবিবির কক্ষে।

হেকিম এসেছিল। সুলতান ছুটে এসেছিলেন সংবাদ পেয়েই। সেদিন সকলের ভিড়ে একসময় চলে এসেছিল সফি।

বিদায় দিয়েছিল বাহারাম।

শাহ্‌জাদার মহাল থেকে বেরিয়ে আসার মুখে পেছনে ডাক শুনেছিল। ফিরে দেখেছিল বাহারাম।

বলেছিল : চলে যাচ্ছেন ওস্তাদ?

: ওস্তাদ! সম্বোধনটা নতুন শুনিয়ে ছিল। বলেছিল : হ্যাঁ।

: বাহারাম একটু চুপ করেছিল। কি বলবে যেন ভাবছিল সে।

: সফি বলেছিল : চলি।

: বহুৎ মেহেরবানি আপনার।

দাঁড়াতে হয়েছিল। বলেছিল : কেন ?

: আপনি শাহ্‌জাদার জান বাঁচিয়েছেন।

: তাতে কী ? সহজভাবেই বলেছিল সফি।

বাহারাম বলেছিল : কেউ বাঁচাতো না।

: না-না।

: হ্যাঁ ওস্তাদ! বলেছিল বাহারাম : নিজের জানের পরোয়া কেউ না ক'রে এগিয়ে যাবে এমন কেউ ছিল না।

সফি চুপ করেছিল। বাহারামের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উত্তরে কিছু বলতে পারেনি।

: মেহেরবান খোদা আপনার ভালো করবেন। চুপি চুপি বলেছিল বাহারাম।

চলে এসেছিল সফি। বাহারাম সেলাম জানিয়েছিল।

কিন্তু যেতে হয়েছিল আবার। ক'দিন পরেই।

সেদিনের রাতের পাহারা শেষ ক'রে আস্তানায় ফিরছিল। ছুটতে ছুটতে কাছে এসেছিল বাহারাম। ডেকেছিল : ওস্তাদ!

সফি দাঁড়িয়েছিল।

বাহারাম বলেছিল : চলুন।

: কোথায় ? অবাক হয়েছিল সফি।

: শাহ্‌জাদা ডাকছেন আপনাকে।

কথাটা যেন হঠাৎ মনে পড়েছিল সফির। জিজ্ঞাসা করেছিল : কেমন আছেন তিনি ?

: ভালো আছেন। বলেছিল বাহারাম : ক'দিন ধরে খুঁজছেন তিনি আপনাকে। আমাকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। লেকিন, আপনাকে খুঁজে পাইনি।

: কেন, আমার আস্তানা জানো না ?

: তাতো জানি।

: যখন হোক গেলেই আমাকে পেতে।

: ওরে বাব্বা! সভয়ে চমকে উঠেছিল বাহারাম।

অবাক হয়েছিল সফি। জানতে চেয়েছিল : কী হ'ল ?

: শয়তান বুড়ো আছে ওখানে।

: বাবুর্চি বুড়ো ?

: জী হাঁ। বহুত বদমাশ আদমী। বহুৎ গালি দেতা। তারপরেই তাড়া দিয়েছিল : চলুন, চলুন।

: কিন্তু আমাকে ডাকছেন কেন ?

: আপনি তাঁর জান বাঁচিয়েছেন !

বাধা দিয়েছিল সফি। বলেছিল : আমি নই, খোদা তাঁকে রক্ষা করেছেন।

: আমি মানি না।

: কেন ?

: আমি যে সেখানে ছিলুম, দেখেছি।

: না-না।

হ্যাঁ, ওস্তাদ। খোদা যদি শাহ্‌জাদাকে বাঁচাতেন, তাহলে আমিই তো এগিয়ে যেতে পারতুম। বাহারাম একটু চুপ করেছিল। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল : সত্যি কথা বলতে লজ্জা নেই ওস্তাদ। সেদিন শাহ্‌জাদার অবস্থা দেখে নিজের জানটার জন্যে বড় ভয় হয়েছিল। ছুটে পালিয়ে যেতে পারিনি। লেকিন, চোখ বন্ধ ক'রে নিজের জানটার জন্যেই খোদাকে ডেকেছিলুম।

বাহারামের সরল স্বীকারোক্তিতে হেসে ফেলেছিল সফি। বলেছিল : চল।

: চলিয়ে।

সফিকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল বাহারাম।

শয্যায় আধশোয়া অবস্থায় বসেছিল নাসিরুদ্দীন। তাকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল : এসো, দোস্ত !

বিস্মিত হয়েছিল সফি। নাসিরুদ্দীনের সম্বোধনটা অবাক করেছিল তাকে। সে ভেবে পায়নি কেমন ক'রে শাহ্‌জাদার দোস্ত হ'ল সে! অবাক দৃষ্টিতে নাসিরুদ্দীনের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

: কি হ'ল ? এসো ! ডেকেছিল নাসিরুদ্দীন।

এগিয়ে ছিল সফি।

: বসো। আবার বলেছিল নাসিরুদ্দীন।

বসতে হয়েছিল। আর শাহ্‌জাদার পাশ থেকে উঠে এসে তার সামনেই গভীর কৃতজ্ঞতায় সফির হাতদু'টো জড়িয়ে ধরেছিল নজরবিবি। অনেক কথাই বলেছিল। কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় শোনার মতো মনের অবস্থা তখন ছিল না তার। নাসিরুদ্দীনের দিকে অপরাধী চোখে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিল, নজরবিবির কাণ্ড দেখে মৃদু মৃদু হাসছে সে। যেন কৌতুক অনুভব করছে।

আর সেদিন নজরবিবির কথাগুলো না শুনলেও নজরবিবির সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছে। জানে তার সত্য পরিচয়।

শাদি করা জরু নয়, বাজারের নাচনেওয়ালী কসবী নজরবিবি। শাদিকরা জরুদের সঙ্গে নাসিরুদ্দীন তাকে এক মহালেই রেখেছে।

অনাচার দেখে প্রতিবাদ জানিয়েছিল একজন। শাহ্‌জাদার বড় পেয়ারের বিবি ছিল সে। কিন্তু তারপরই তার যে কি হ'ল কেউ পাত্তা করতে পারেনি। একদিন সকালে উঠে কেউ আর দেখতে পায়নি তাকে।

বিচিত্র এখানকার দুনিয়াটা। সুলতানি দুনিয়া। মেহেরবান খোদার খেয়ালী সৃষ্টি !

জীবন মূল্যহীন। ন্যায় আর অন্যায়ের পরোয়া নেই। ক্ষমতা আর দম্ভ। গোলামির দাসখৎ।

সবচেয়ে আশ্চর্য হয় সফি এই কথা ভেবে, সুলতান সৈফুদ্দীন যেখানে

মানব-দরদা, হিন্দু আর মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যাঁকে জেন্দা পারের মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করে—নিজে কলুষমুক্ত না হ'লেও অপরের জাবনকে কলুষিত করতে চান না, সেখানে তাঁরই ঘরে রক্তসম্পর্কহীন একটা উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে প্রশ্রয় দেন কেমন ক'রে?

নজরবিবিকে নাসিরুদ্দীন যখন হারেমে এনে তোলে তখন জেনেছিলেন তিনি, কিন্তু একটিদিনের জন্যেও কোনো কথা বলেননি। সমর্থন করেছিলেন তিনি।

সিদিবদর যে অত্যাচারের বন্যা বহিয়েছে, ইচ্ছেমতো ঘর ভাঙছে, ইজ্জৎ লুটছে এখানেও তিনি নীরব। হয়তো তাঁর অক্ষমতা বা ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেওয়া!

ভয় পান সৈফুদ্দীন।

সেইজন্যে যার যা ইচ্ছে তাই ক'রে চলেছে।

হয়তো বা তা নয়। সে যা ভেবেছে তা সত্য নয়।

বারবার ভেবেছে সে। উত্তর পায়নি। প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

: ওস্তাদ!

: এঁ্যা!

বাহারামের ডাকে সংবিত ফিরে পেল যেন সফি। বিস্মিতভাবে তার মুখের দিকে চাইলো।

: ক্যা বোলেগা?

: কী?

: বিবিজী যব......

বাহারাম চুপ করল। কথা বলল না সফি। ভেবে পেল না কি বলবে। যাবে কি-না।

: চলিয়ে না? একটু পরে বললে বাহারাম।

: যাবো? যেন জানতে চাইলো সফি।

: জী, হাঁ।

: লেকিন, বোলাতা কাঁহে ?

: ম্যায় জানতা নেহি।

: তব ?

সফির এই জবাবদিহির জন্যে হয়তো প্রস্তুত ছিল না বাহারাম। সে হয়তো ভাবতে পারেনি, এই ধীর-স্থির-ঠাণ্ডা প্রকৃতির অস্বাভাবিক সাহসী যুবকটা তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করবে একের পর এক।

তাই একটু চুপ ক'রে থাকার পর বাহারাম বললে : বিবিজী ম্যায়নে বোল দিয়া আপকো পরেশন না হো তো একদফে মেহেরবানি করকে যাইয়ে গা। আউর......

: ক্যা ?

: বোলা বহুৎ জরুরী বাত হ্যায়।

বাহারামের শেষের কথাটায় সহসা সন্দেহের দোলায় দুলে উঠল সফির মনটা। কৌতূহল জাগলো। মনে পড়ল গত দিনের সন্ধ্যাটাকে।

কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। বললে : তুমি এখন যাও বাহারাম।

: যাইয়ে গা! অধীর শোনাল বাহারামের কণ্ঠটা।

: যাবো।

: তব চলিয়ে।

: লেকিন......

: ক্যা ?

: আভি নেহি।

: তব ?

: যখন যাবো জানাবো তোমাকে। সত্যি কথাটাই প্রকাশ করলে সফি। বললে : আমি একটু ভেবে দেখি।

: কেন ?

: ভেবে দেখার কারণ আছে।

ঃ কী?

ঃ শাহ্‌জাদা এখন এখানে নেই।

ঃ তাতে কী?

ঃ তাতেই সব। সে তুমি বুঝবে না। তোমার বিবিজীকে গিয়ে বলো যেতে পারলুম না ব'লে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

কথা ক'টা ব'লে আর দাঁড়াল না সফি। বাহারাম কি বলে সে কথা শুনতে চাইলো না। দ্রুত পা চালিয়ে চলে এলো।

আজ আর কোনো কাজ নেই। অখণ্ড অবসর। ছুটি। সফির ছুটির দিন শুরু আজ থেকে। সৈফুদ্দীন ফিরে না আসা পর্যন্ত শুধু খাওয়া আর ঘুম।

বাবুর্চি বুড়ো দেখতে পেয়ে বললে: কি রে গিল্‌বি নাকি?

ঃ না।

ঃ কেন, হারেমে যাবি না?

'না' বলতে গিয়েও 'না'বলতে পারল না সফি। হঠাৎ কি যেন মনে হ'ল তার। মনের কোণে একটা মুখের ছবি ভেসে উঠল।

বাবুর্চি বুড়ো বললে: কি রে, চুপ ক'রে রইলি কেন?

সফি তার জবাব দিল না। যেমন গিয়েছিল তেমন বেরিয়ে পড়ল আবার।

॥ আট ॥

একটু ঘুরে বেড়াল এধার-ওধার। ক'বার ভাবলে যাবে কি-না। তারপর সোজা প্রাসাদে চলে এলো।

হাজির হ'ল সুলতানের শয়ন কক্ষটার সামনে। অনেকেই তাকে লক্ষ্য করলে, কিন্তু কেউ-ই কিছু বললে না। যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত।

কক্ষদ্বার ভেজান ছিল। মৃদু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। মুক্তদ্বার পথে কক্ষে প্রবেশ করল সে।

মাঝারি আয়তনের কক্ষটি। ছোটই বলা চলে। মধ্যে পালংক। প্রতিদিনের মতো আজও পরিপাটি ক'রে শয্যা বিছানো। শিয়রে পাত্রে রাখা সুগন্ধি ফুলের গুচ্ছ।

সুলতান নেই তো কি হয়েছে! যে যার প্রতিদিনের কাজটুকু সমাধা ক'রে চলেছে! এতোটুকু ত্রুটি নেই কোথাও। তিনি যে আছেন তারই সাক্ষ্য সর্বত্র।

সবকিছুই লক্ষ্য করলে সফি। গবাক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আসমানটাকে দেখলে। সন্ধ্যাটা গাঢ় হচ্ছে। একটা ধূসর রঙের ছায়া ক্রমশঃ গাঢ় রূপ নিচ্ছে। পাখিদের কাকলি ধ্বনি শোনা যাচ্ছে না আর। আসমানের কালো বুকে সবেমাত্র একটার পর একটা ক'রে সিতারাগুলো উঁকি মারতে শুরু করেছে। সাপের মাথার মণির মতো জ্বলছে আর নিভছে।

ভালো লাগছিল সফির। আজ অনেকদিন পরে ভালো লাগছিল তার। মুক্ত বাতায়ন পথে আপন দৃষ্টিটাকে অন্ধকার আকাশের বুকে নিবদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল সে। খানিক আগে সন্দেহের দোলায় দুলে-ওঠা মনটা এখন শান্ত, স্থির। চিন্তাশূন্য মনটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। কর্তব্য আর মনুষত্ববোধটা জাগ্রত হচ্ছিল ধীরে ধীরে।

সে সুলতানের কথা ভাবছিল। হাবশী সুলতান সৈফুদ্দীন। কোন্ সুদূরে যাঁর আপন ঘর। জন্মস্থান। যেখানের ফলে-জলে পুষ্ট হয়েছে দেহ। শুধুমাত্র লোভের হাতছানিতে এতোদূরে এসেছিলেন। আসতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু......

রুক্ষতা পেয়েছে কোমলতার স্পর্শ। বাংলার শ্যামল মাটি তাঁকে মায়ায় ভুলিয়েছে। মানুষ তাঁকে আপন ক'রে নিয়েছে। আর তিনিও এ-দেশকে—মানুষকে আপন ক'রে নিয়েছেন। ভালো বেসেছেন। একাত্মা হয়ে গেছেন।

বন্ধু তিনি। শুভার্থী। শেষ নেই তার মহানুভবতার। গরীবের প্রতি—নিরন্নের প্রতি তাঁর দয়া, দান, দাক্ষিণ্যের অন্ত নেই।

যাদের একজন সে নিজে। নিরন্নদের দলভুক্ত।

একদিন খেতে না পেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াত। আয় ব'লে কাছে ডাকার, দু'টি খেতে দেওয়ার কেউ ছিল না। যাদের অনেক আছে তারা ফিরেও চাইতো না। দুয়ারে গেলে দুর-দুর ক'রে তাড়িয়ে দিত। অযথা নির্যাতনের শেষ ছিল না।

চিরকালই ধনীর চক্ষুশূল গরীব। ধনীরা ভাবে গরীবরা আপদ। পথের জঞ্জাল। স্বচ্ছন্দ জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী।

একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে সে। সত্যে উপনীত হয়েছে। গরীবের মর্মজ্বালা আর ধনীর মর্মপীড়া দুই-ই তার কাছে স্পষ্ট। এতোটুকু অস্বচ্ছতা নেই আজ আর।

কারণ, একদিনের সেই জীর্ণ মৃতপ্রায় কংকালসার দেহের অধিকারী কিশোর আর বলিষ্ঠ যুবক। সুলতানের কাছের মানুষ ব'লে অনেকেরই সে শ্রদ্ধা বা হিংসার পাত্র। যারা একদিন তাকে একমুঠো ক্ষুধার অন্ন না দিয়ে আঘাত হেনেছে, আজ তাদের অনেকেই তাকে নিয়ে গর্ব করে। যদি কখনো কদাচিৎ কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, কাছে এসে ডেকে কথা বলে। খবরাখবর নেয়। কৃতার্থ হ'তে চায়।

অতীতকে স্মরণ ক'রে সফি তাদের আঘাত হানে না। কথা বলে। আর ভাবে, সংসার—দুনিয়া আর মানুষ। সত্য আর স্বার্থ। আমরা স্বার্থপর। লোভের ছায়া আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। প্রতিটি রক্ত কণিকায়। আপন স্বার্থ ছাড়া আমরা কিছু করি না।

সেখানে মুষ্টিমেয় ক'জনের স্বার্থকে অস্বীকার ক'রে সুলতানের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি, গরীবদের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা, তাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা তার অন্তরে একজন সত্যকার মানুষের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাঁকে। মানব-দরদী সৈফুদ্দীনের জন্যে আজ সব পারে সফি।

আরো অনেক কথাই ভাবছিল সে। পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতি মনে পড়েছিল তার। অতীতের দুঃস্বপ্নের দিনগুলো তার মনটাকে ম্লান বিষণ্ণ ক'রে তুলছিল।

অনেকদিন পরে মায়ের কথা মনে পড়ল। তার আম্মাজান। যদিও আম্মাজানের ছবিটা আজ আর স্পষ্ট নয়। অনেক মনে করার পরেও মায়ের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তবু ভাবতে ভালো লাগছিল। মনে করতে চেষ্টা করছিল। একটা মধুর স্পর্শ বুকের গভীরে কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

সফির মনে পড়ল। সেই ছোটবেলার দিনটাকে। একটা ছোট্ট শিশু আর তার হতভাগিনী মায়ের ছবিটা।

একটু-একটু ক'রে উজ্জ্বল হ'ল সে ছবিটা। স্পষ্ট হ'ল। মূর্ত হয়ে উঠল হারানো অতীতের ক'টা দিন।

একটা ছোট্ট শিশু, তার মা আর একখানা জীর্ণ হেলেপড়া কুঁড়ে ঘর। কেউ সহায় ছিল না, ছিল না কোনো সম্বল। ভরসা ছিলেন একমাত্র খোদা। সফির মনে পড়ে তার জন্যে খোদার দরবারে দয়া ভিক্ষা ক'রে প্রায় প্রতিদিনই কাঁদতো মা। কাঁদতো লুকিয়ে লুকিয়ে। রাত গভীরে। যখন সে মায়ের বুকের কাছে ঘুমিয়ে থাকতো।

কিন্তু হঠাৎ এক সময় স্বপ্ন দেখে বা ভয়ে ঘুম ভেঙে যেতো শিশুর। মাকে খুঁজতো। দেখতে পেত ক্রন্দনরতা মাকে।

অবাক হ'ত শিশু। বুঝতে পারতো না মায়ের কান্নার কারণ। কার জন্যে কাঁদছে মা।

মাও দেখতে পেতো তাকে। কাপড়ে চোখের জল মুছে বলতোঃ কি রে, বাপজান!

ঃ তুমি কাঁদছো আম্মা?

ঃ হ্যাঁ, বাপজান!

ঃ কেন আম্মা?

: না কাঁদলে যে তাঁর দোয়া হয় না। না কেঁদে ডাকতেও জানি না। তাই কেঁদে তাঁকে ডাকি।

: কাকে ডাকছো, আব্বাজানকে ?

: না বাপজান, খোদাকে ?

: খোদাকে ডাকলে খোদা আসবে ?

: ডাকার মতো ডাকতে পারলে নিশ্চয়ই দোয়া হবে তাঁর।

ভাবতো শিশু। ছোট্ট মনটায় তার অনেক চিন্তা ভিড় ক'রে আসতো! মনে পড়তো বাপজানের কথা। কবে, কতোদিন আগে বাপজানকে খোদা ডেকে নিয়ে গেছে। আম্মার কাছেই শুনেছে কথাটা। আর সকলের মতো তারও আব্বাজান ছিল। খোদা নিয়ে গেছে ব'লেই নেই।

বলেছে : আম্মা, খোদাকে ডাকছো কেন ?

: তাকে যে বড় দরকার বাপজান।

: কী দরকার ?

: আমি যে একলা তোকে দেখতে পাচ্ছি না। যতো দিন যাচ্ছে ততো ভয় পাচ্ছি আমি। তাই তাঁকে ডাকছি, তাঁর দোয়া ভিক্ষা করছি।

: খোদা আমাকে দেখবে ?

: তিনি যে সবাইকে দেখার মালেক। তার দোয়াতেই তো আমরা বেঁচে আছি। গোটা দুনিয়াটা যে তাঁর।

: আমরাও ?

: হ্যাঁ, বাবা।

: তুমি—আমি ?

: আমরা সবাই।

শিশু চুপ করেছিল। আবার চিন্তা শুরু হয়েছিল তার ছোট্ট মনটায়। অসীম শক্তিধর খোদা সম্পর্কে কৌতূহলের শেষ ছিল না তার। খোদার নাম অনেক শুনেছে সে। সব সময় মা'র মুখে

খোদা-খোদা! তাই খোদাকে দেখতে তার বড় ইচ্ছে মনে। কেমন দেখতে তিনি!

মাকে বলেছে : আম্মা, খোদাকে দেখেছো তুমি?

: সেইজন্যেই তো তাঁকে ডাকি।

: খোদা ডাক শুনতে পায়?

: নিশ্চই পায় বাবা।

: তবে আসে না কেন?

: সময় হ'লেই আসবেন!

: কবে? অধৈর্য প্রশ্ন তার।

মা বুকে টেনে নিত। মাথায় গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলতো : আসবেন, তিনি নিশ্চই আসবেন।

কিন্তু আসেননি তিনি। দয়া ক'রে সেদিন সেই ছোট্ট শিশুর তাঁকে দেখার দুর্বার কৌতূহলটুকু মেটাননি।

মাকে ডেকে নিয়েছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে খোদার ডাক শুনে মাও চলে গেলেন।

যাবার আগে মায়ের বুকের ওপর কেঁদে লুটিয়ে পড়েছিল শিশু। প্রশ্ন করেছিল : কোথায় যাচ্ছো আম্মা?

মৃত্যু পথযাত্রিণী মায়ের ওষ্ঠে একটু হাসি ফুটেছিল। বলেছিল : খোদার কাছে বাপজান।

: আমি কার কাছে থাকবো?

: খোদা তোকে দেখবে বাপজান।

: না-না।

: ভয় কি বাবা! মালেক তো রইলেন।

তারপর সে একা। দুনিয়াটায় কেউ ছিল না তার। কেউ ডাকেনি।

আম্মা বলেছিল : খোদা রইলেন। দীনদুনিয়ার মালেক তাকে দেখবেন। তিনি থাকতে ভয় কী তার!

দেখেননি। তিনিও মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন। হয়তো দেখতে পাননি। তার মতো একটা ছোট্ট প্রাণ রইলো কি গেল তা দেখবার সময় কোথা তাঁর!

হয়তো তা নয়। তিনি দেখছিলেন কিন্তু করার কিছু ছিল না তাঁর। তার নসিবে যা লেখা আছে তা তো ঘটবে। কপালের লিখন খণ্ডানো যায় না। মানুষের সাধ্য কি কিছু করে!

তাই হয়েছিল। ছোট্ট ছেলেটা সর্বহারা হয়ে পথে পথে ঘুরেছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গাছতলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কোনো দিন ঘুম ভেঙে গেছে গভীর রাতে। পেঁচার কর্কশ চিৎকারে জেগে উঠেছে। ভয় পেয়ে চিৎকার করতে গেছে। পারেনি। এতোটুকু আওয়াজও বেরোয়নি।

আর এমনি ভয় পেতে পেতে একদিন ভয়শূন্য হয়েছে মনটা। ঘরে ফেরার কথাটুকু ভুলে গেছে। পথে পথে কাটিয়েছে দিন। রাতে খোলা আসমানের নীচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্তে। মায়ের কথা মনে পড়েছে। খোদাই যে জীবনের মালেক। তাঁর ইচ্ছেতেই আমাদের মরণ-বাঁচন।

তবে?

আর কেন? কি হবে মিথ্যে এক জায়গায় পড়ে থেকে মৃত্যুর দিন গুনে। ছোট্ট ছেলেটা বেরিয়ে পড়েছে। পথে পথে দিন কেটেছে তার। পার হয়েছে ক'টা দীর্ঘ বছর।

একদিন গৌড়ে এসেছে। সুলতানি দুনিয়া। এখানের মানুষজন আলাদা। আচার-ব্যবহার সব কিছু। ধনীর মেলা। সম্পদের ছড়াছড়ি। দিনরাত ব্যস্ততা আর কোলাহল। মানুষগুলো দিনে-রাতে ঘুমোয় না যেন। ঘুম নেই গৌড়ের মানুষগুলোর চোখে।

সফি যখন গৌড়ে এসেছিল মসনদে তখন শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ্। ছ'টা বছর সুলতানি করেছিলেন তিনি—১৪৭৬-৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

অবাক চোখে ঘুরে ঘুরে দেখেছে সুলতানের দুনিয়াটাকে। দেখেছে মানুষগুলোকে।

হাতী আর ঘোড়ার শোভাযাত্রা। রঙ-বেরঙের পোশাক পরে ঢাল-তলোয়ার-বর্শা হাতে সৈন্যদের যাতায়াত। বাজারে থরে থরে নানান জিনিসের মেলা। কেনাবেচার বিরাম ঘটতো না কখনো।

মানুষ ফেলে-ছড়িয়ে খেয়ে দিন কাটতো। দেখতো ছেলেটা। কেউ চাইতো না তার দিকে। কেউ ডাকতো না। অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটতো তার। রাতে পথের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। খোদাকে ডাকতো। ক্ষিদের জ্বালায় চোখে জল আসতো।

শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহ্ গত হ'লেন। গৌড়ের মানুষগুলো সেদিন হায় হায় করেছিল। আক্ষেপ ঝরে পড়েছিল তাদের কণ্ঠে।

পথের পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছিল ছেলেটা। মানুষের সমুদ্র সেদিন ভেঙে পড়েছিল গৌড়ে। শুনেছিল তাদের কথা।

শামসুদ্দীনের মতো সুলতান নাকি আর হবে না। উচ্চশিক্ষিত, ধর্মপ্রাণ, শাসনদক্ষ সুলতান ছিলেন তিনি। তাঁর শাসনে মানুষ শান্তিতে ছিল, সুখে ছিল। সুখের দিন শান্তির দিন শেষ হয়ে গেল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

আবার ভিন্ন সুরে—ভিন্ন কথাও আলোচনা করেছিল কেউ কেউ। ছেলেটা সেই মানুষের সমুদ্র ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিল। কানে এসেছিল আলোচনা।

ভিন্ন সুরের আলোচনাকারীর দল বলেছিল: এতোদিন তো যা হোক মন্দিরগুলোর ওপর দিয়েই যাচ্ছিল। মন্দিরকে মসজিদ ক'রেই আমাদের রেহাই দিচ্ছিল সুলতান। এবার কি যে হবে নারায়ণই জানেন।

ছেলেটা বুঝেছিল ওরা হিন্দু। সুলতান নিশ্চয়ই ওদের মন্দিরকে মসজিদ-মিনার বানিয়েছেন। কিন্তু বাঁচতে দিয়েছেন ভালোভাবে।

ভেবেছিল সে। এমন কেন হয়? কেন এমন করে মানুষ? কিসের আশায়? কোন্ স্বার্থে?

ভেবে পায়নি। বোঝার মতো বুদ্ধিও তার ছিল না। সে শুধু দেখেছে। বেশ লেগেছে তার। মানুষের সমুদ্রে হারিয়ে যেতে, মিশে যেতে বড় ভালো লেগেছে।

তারপর জলালুদ্দীন ফতেহ্ শাহ্। বড় হয়ে শুনেছে ফতেহ্ শাহের আগে শামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর আরও একজন মসনদে বসেছিল। তার নাম সিকন্দর শাহ্। শামসুদ্দীনের আত্মীয় ছিল সে।

কিন্তু বেশিদিন বসতে পারেনি। ক'টা মাসের মধ্যেই তার সুলতানির খেল খতম হয়েছিল। তাকে মুর্দা বানতে হয়েছিল কি-না তা সে জানে না।

ফতেহ্ শাহের সময়েই জামান খাঁ তাকে পথ থেকে তুলে এনেছিল।

সেদিনটা আজও স্পষ্ট মনে আছে তার। সেদিন সে গৌড় ছেড়ে চলে-যাবে ভেবেছিল। কারণ গৌড়ের মানুষ তাকে বাঁচতে দেয়নি। কোথাও কাজ চেয়েও পায়নি। পথের কুকুরের সঙ্গে ভুক্তাবশিষ্ট নিয়ে ঝগড়া পর্যন্ত করতে হয়েছে। ভিখারীর দলও দূর—দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে। কেউ ডাকেনি তাকে।

চলে যাচ্ছিল সে। কোথায় যাবে জানে না। জানতো সামনে পথ। সেই পথ ধরে সে এগিয়ে যাবে। যতোক্ষণ চলার ক্ষমতা থাকবে—চলবে। তার পরের কথা সে ভাবেনি, ভাবতে চায়ওনি।

এগিয়ে চলেছিল ছেলেটা।

গ্রীষ্মের দিন। মাথার ওপর জ্বলন্ত সূর্য। বাতাসে আগুনের উত্তাপ। সামনে সীমাহীন মুক্ত প্রান্তর। এতোটুকু আচ্ছাদন নেই।

এগিয়ে চলেছিল সে। অভুক্ত পেটে ক্ষুধার জ্বালা ছিল না, ছিল সর্বশরীরে অসহ্য যন্ত্রণা।

পা কাঁপছিল। কণ্ঠতালু শুকিয়ে উঠেছিল।

মৃত্যু!

এই কি মৃত্যু! এই নিষ্ঠুর-নির্মম-নিষ্করুণ তার রূপ! ভাবতে পারেনি সে। খোদার নামও মনে আসেনি।

শেষবার চোখ মেলে দেখেছিল সামনে সমুদ্র! নীল সমুদ্রের হাতছানি কাছে ডেকেছিল তাকে।

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল।

শেষবারের মতো চোখ মেলতে গিয়েছিল। অন্ধকারের পর্দাটা ভারী হয়ে চেপে ধরেছিল তাকে।

তারপর!

মৃত্যু? না, মৃত্যু নয়। জীবন! নবজন্ম হয়েছিল তার।

চোখ মেলে দেখতে পেয়েছিল একটা মুখ তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে আছে। তাকে দেখছে।

: কে, খোদা! তুমি আছো, তুমি এসেছো?

চোখ বন্ধ করেছিল। মনটা ভরে উঠেছিল গভীর প্রশান্তিতে। কোনো কষ্ট অনুভব করেনি আর।

একটু পরেই একটা প্রশ্ন শুনেছিল : তোমার নাম কি?

চোখ মেলেছিল সে। নিজের নাম বলেছিল।

: কোথায় যাবে?

চুপ করেছিল সে।

: বাড়ি কোথা?

এবার কথা বলেছিল। বলেছিল : নেই।

: কে আছে?

: কেউ না।

: আব্বা, আম্মা?

: মরে গেছে।

একটু চুপ করেছিল লোকটা। কি যেন চিন্তা করেছিল। তারপর জানতে চেয়েছিল : এখানে থাকবে?

: কোথায়?

: আমার কাছে।

: খেতে দেবে?

: দেব।

: আমার খিদে পেয়েছে।

খেতে দিয়েছে জামান খাঁ। পেট ভরে খেতে দিয়েছে। ফিরিয়ে দিয়েছে জীবন।

আরও অনেক কথাই ভাবল সফি। জমিলার কথাও মনে পড়ল।

জমিলা!

প্রেম! যা সে জানতো না। হয়তো আজও ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না। ভেবে পায় না এমন কেন হ'ল। মেয়েটাকে দেখা মাত্র সবকিছু ভুলে গেল কেমন ক'রে!

কর্তব্য! কঠিন কর্তব্যপালনের গুরুদায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। সেই কর্তব্য সে অবহেলা করেছে। জমিলার সঙ্গে লুকিয়ে আশনাই করে। যদিও জানে, ধরা পড়লে কঠিন দণ্ডভোগ করতে হবে। বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে জিন্দিগি খতম হওয়াও বিচিত্র নয়। জামান খাঁ নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন না তাকে।

তবু ওই ম্লানমুখী মেয়েটার প্রতি আকর্ষণ এতোটুকু কমেনি। দুঃসাহসী মনটা ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে। অসম্ভব কল্পনা করেছে।

কিন্তু তা বুঝি হবার নয়। দুনিয়ার মালিক খোদা—যিনি জগৎ-সংসার, মানুষের ভাগ্যবিধাতা। যাঁর ইচ্ছেয় সংসার চলছে, মানুষ তার নিত্যদিনের কর্তব্যকর্ম সমাধা করছে। ন্যায়-অন্যায়, বিচার-বিবেক, যা মানুষের ব'লে পরিচিত সবই তাঁর আজ্ঞাধীন। আমরা যতোই বলি না কেন, আমি করছি—আমরা করছি, কিন্তু তিনি করাচ্ছেন ব'লেই না আমরা করছি। তাঁকে অস্বীকার ক'রে কি ক্ষমতা আমাদের কিছু করার।

সুলতানি দুনিয়া। হারেম। সেখানকার মানুষ। সবকিছুই তাঁর ইচ্ছাধীন। তাঁরই নিয়মানুসারে সম্পন্ন হচ্ছে সবকিছু।

কেউ বিলাস-ব্যসনের স্রোতে গা ভাসাচ্ছে। জীবনকে কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করছে। অনাচার, ব্যভিচার আর অত্যাচারের প্রকাশ ক্ষমতা আর দম্ভে। জীবনের উচ্চাসনের অধিকারীর স্বেচ্ছাচারিতা।

আবার কেউ-বা চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে। অতিষ্ঠ হয়ে জীবন শেষ করছে। নীরবে নতমস্তকে দিনের পর দিন সয়ে যাচ্ছে অত্যাচার। প্রতিবাদ বা প্রতিকার নেই। একদল মারছে আর একদল নীরব কান্না বুকে চেপে মার খেয়ে যাচ্ছে।

এই দুনিয়া! সুলতান দুনিয়ার নগণ্য এক বাঁদীর পক্ষে মুক্তির স্বাদ পাওয়া, প্রাচীর বেষ্টনী ভেদ ক'রে জীবনের তটে দাঁড়িয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া অলীক কল্পনা-বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নয়।

জমিলা তার জীবন থেকে কোনোদিনই মুক্তি পাবে না। সাধ্য কী তার! সফির ক্ষমতা কোথায় তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার!

সফিও তো একজন বান্দা। সুলতান সৈফুদ্দীনের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। সুলতানের হারেমের কঠিন নাগপাশের বাঁধন কেমন ক'রে কাটবে?

পারবে না। কোনোদিনই পারবে না সে।

জমিলা কাঁদবে। লজ্জা আর ব্যর্থতায়। নারীত্বের অবমাননায়। সফি নামের পুরুষটা তাকে অপমান করছে। তাকে…

না-না, সত্যি নয়। মিথ্যে-মিথ্যে।

ভুল।

কিন্তু…

ভাবতে পারে না। বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করে। কষ্ট হয়। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠতে চায় প্রাণটা।

ভাবে। সফির চিন্তা আজ বাস্তবের পথ ধরে।

ভাবে, মিথ্যের পেছনে ছুটে লাভ কী? জীবনের গ্লানি আর বাড়াবে না। জমিলার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেবে। ফিরেও চাইবে না আর।

তবু যদি কাছে আসে, বুঝতে না চায়, আঘাত হানবে। কঠিন আঘাত। নগ্ন সত্যকে তুলে ধরে ওর সুন্দর মুখখানায় কালি মাখিয়ে দেবে। লজ্জা আর অপমানের যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দেবে অন্তরটা।

কঠিন প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিজ্ঞা আগেও করেছে। নিজেকে বারবার প্রস্তুত করেছে। আঘাত হানার জন্যে তৈরি হয়েছে।

ব্যর্থ হয়েছে প্রতিবারই।

জমিলা কাছে এলেই ভুলে গেছে। সবকিছু ভুলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। যে মুখ সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের শুভ্রতা-লাবণ্য-নির্মল-সৌন্দর্যে পূর্ণ। ভালোবাসা আর সরলতায় মাখামাখি।

ভুলে গেছে সবি। সবকিছু বিস্মৃত হয়েছে মুহূর্তে। সব ভুলে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থেকেছে। সৌন্দর্যপিপাসু মনটা দুই লোভী চোখে পান করেছে সেই অনাঘ্রাত ফুলের সৌরভ, যৌবনের মোহিনী-রূপ। যে-যৌবন কামনা জাগায় না, ভালোবাসতে শেখায়।

বারেবারে ভালোবাসতে শিখিয়েছে তাকে। ভালোবেসে কামনা করেছে। ওর দেহ, মন, যৌবন,—সবকিছু। কিছু বাদ দিয়ে কিছু পেতে সে চায়নি।

আর সেই জন্যেই এই জ্বালা—দাহ, যন্ত্রণাবোধ। বুকভরা ভালো-বাসা জড়ানো হাহাকার।

রুদ্ধ দ্বারে মাথা খোঁড়া।

দ্বার খোল! হে জীবন দেবতা, হে নিষ্ঠুর খোদা—মেহেরবানি করো! মানুষকে তার অধিকার ফিরিয়ে দাও। তোমার সত্যের মাঝে প্রেমের জন্যে এতোটুকু করুণা কী তুমি করতে পার না?

একটা কসবীর মেয়ে ঘৃণ্য বাঁদীর জীবন থেকে যদি সুস্থজীবন লাভ করতে পারে তাকি তোমারই জয়যাত্রা নয়?

তুমি তো মহান্, করুণাময়! জগদীশ্বর তুমি। তুমি তো সব পার। আমিরকে ফকির বানাও, ফকির কে আমির। তোমার তো খেয়াল-খেলার অন্ত নেই। তবে?

শুধু ভালোবাসার জন্যে এটুকু তুমি পার না?

সুলতানের শূন্যকক্ষে মুক্ত গবাক্ষ পথে দাঁড়িয়ে অন্ধকার আসমানটার দিকে চেয়ে জমিলার জন্যে খোদার কাছে সফি তার অন্তরের আকূতি জানালো। বারবার করুণা ভিক্ষা করল।

আর এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার দু'চোখে নেমে এলো তন্দ্রার ছায়া। তবু সে দাঁড়িয়ে রইলো স্থির হয়ে।

একটা মৃদু আলোর তীর্যক রেখা কক্ষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই চমকে উঠল সফি। মনে হ'ল সে যেন ঘুমিয়ে আছে, স্বপ্ন দেখছে।

স্বপ্ন নয়, সত্য। সত্যই সে এসেছে। আকুল প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছে। অন্তরের কামনা অন্তর উপলব্ধি করেছে। ছুটে এসেছে।

জমিলা !!

জমিলার হাতটাও বুঝি একটু কেঁপে উঠেছিল। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়েছিল। আর হঠাৎই পাংশুমূর্তি ধারণ করেছিল তার মুখ। শক্ত হাতে বাতিদানে বাতি রেখে ফিরে যাচ্ছিল সে।

: তুমি! পুরুষকণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময় আর মুগ্ধতা ঝরে পড়ল।

দ্বারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল জমিলা। ইচ্ছে করলে সে অন্তর্হিত হ'তে পারতো। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াল সে।

কাছে এগিয়ে গেল সফি।

জমিলার ঠোঁট দু'টি বারেক কেঁপে উঠল। কি যেন বলতে গিয়েও চুপ ক'রে গেল।

: তুমি! আবার সেই মুগ্ধতা প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে।

জমিলা শুধুমাত্র চোখ দু'টি বারেক তুলেই মুখটা নত করল।

: তুমি বাতি জ্বালাও? জানতে চাইলো সে।

: আজ জ্বালালুম।

: আজ?

: হ্যাঁ, বাতি-বুড়ির বিমার হয়েছে তাই।

: কাল জ্বালাবে ? জানার জন্যে সে অধীর। আগামী দিনের সম্ভাবনার ছবিটা তার বুকে। সে জানতে চায়। আজ অপ্রত্যাশিত—আগামী দিনের নিশ্চিন্ততার খোঁজ !

: জানি না তো ! হয়তো জানে, তবু জানাতে চায় না। নারীর চিরন্তন কৌতুক।

: কেন ?

: আমি তো জ্বালাই না। জমিলা সহজ হচ্ছে।

: বুড়ির বিমার যদি না ছাড়ে ? কামনা করছে সে।

হাকিম দাওয়াই দিয়েছে। জমিলার কণ্ঠে কৌতুকের ছোঁয়া। ভয় পাওয়াতে চায় সে। আগামী দিনের চিন্তায় লাভ কী !

: জমিলা ! তার কণ্ঠে গভীরতার স্পর্শ।

: বল। জমিলা জানতে চায়।

: জমিলা ! ভালোবাসায় সোচ্চার হয় সে।

: কী ? জমিলা মুগ্ধ।

: জমিলা ! জমিলার একটা হাত ধরলো সে। মনটা মুহূর্তে মাতাল হয়ে উঠল। পুরুষের আকাঙ্ক্ষা। কাছে টানতে চাইলো।

: কি হচ্ছে ? বাধা দিল জমিলা। যেন বিদ্রূপ করতে চায়।

: জমিলা, তুমি···

: আমি কী ? আবার সেই কৌতুকের প্রকাশ।

: আমি তোমাকে পেয়ার করি জমিলা ! সে তার অধিকার জানাতে চাইলো। বললে : আমি তোমাকে···। হঠাৎ অশান্ত হয়ে দুই বাহুর বেষ্টনীতে কাছে টেনে নিতে যাচ্ছিল।

বাধা দিল জমিলা। সাবধানী কণ্ঠে বললে : করছো কী, এই দেখ।

: জমিলার হাতে জ্বলন্ত প্রদীপ। ব্যগ্র যৌবনকে সে বাধা দিল।

: ওটা দাও। বললে সে।

: কেন ? জমিলা বিস্মিত।

: রেখে দেব।

: না। অস্বীকার করতে চাইলো জমিলা।

: হ্যাঁ।

: উঁহু! হাসলো জমিলা।

: জমিলা!

: এখন না।

: তবে?

: জানি না।

: কেন?

: জানি না।

: জমিলা!

: বল।

: তুমি আমার।

: উঁ! মুখ নত করল জমিলা।

: তোমাকে আমি আমার ক'রে পেতে চাই। আমার ঘরনী, গৃহিণী, আমার সন্তানের জননীরূপে। জমিলা, বল—চুপ ক'রে থেক না। তুমি আমার হবে?

কথা বললে না জমিলা। বলতে পারল না। সে কাঁপছে। মৃদু হাওয়ায় কাঁপন-তোলা লতার মতো তার হাতে-ধরা প্রদীপের শিখাটা থরথর করছে। দুই আঁখি বন্ধ!

সফি দুই হাতে তার মুখটা তুলে ধরলো। সেই সুন্দর মুখখানাকে দেখলো। কি যেন বলতে গেল।

কিন্তু হঠাৎই ভয়-পাওয়া-হরিণীর মতো স্থান ত্যাগ ক'রে ত্রস্তে ছুটে পালিয়ে গেল জমিলা।

আর বিস্মিত সফি জমিলার গমন পথের দিকে চেয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল।

সামনে দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে এক বোরখাধারিণী। ধপ্ধপে সাদা দু'খানি পায়ের পাতা। চিনতে পারল সে। বেগমসাহেবা।

দুরন্ত ভয়ে সফির সর্বশরীর থরথর ক'রে কেঁপে উঠল।

বোরখাধারিণী ঘুরলেন। ফিরে যাচ্ছেন তিনি।

বেগমসাহেবা! ককিয়ে উঠল তার কণ্ঠটা।

দাঁড়ালেন তিনি।

: বেগমসাহেবা!

: বোল।

কিছুই বলতে পারল না সে। মাথাটা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

: চুপ কিঁউ? তাঁর কণ্ঠটা তীক্ষ্ণ।

: জী।

: এ্যায়সা ফিকির আচ্ছা নেহি।

: জী। স্বীকার করল সে।

: তব?

আবার চুপ করে রইলো সে। কোনো উত্তরই জোগাল না তার মুখে। কিছুই বলতে পারল না।

: এহি তুমহারা কাম হ্যায়?

: জী।

: কামকে এন্তেজার করো। ঔর···

: জী।

আর দাঁড়ালেন না। ফিরে গেলেন তিনি। তাঁর শেষ কথাটা শেলের মতো বুকে এসে বিঁধল: ম্যায় সব কুছ জানতা হুঁ!

তিনি সব জানেন। সবকিছু। কিছুই অজানা নেই। সকলের চোখকে ফাঁকি দিলেও তাঁকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়নি। ধরে ফেলেছেন তিনি। হাতে-হাতে ধরা পড়ে গেছে তারা।

সফি ভাবতে পারল না। বেগম চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ সে শূন্যদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলো। তাঁর কথাগুলো বারবার কানে বাজতে লাগল।

নিজের চারপাশে শূন্যতা অনুভব করল সফি।

কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু অতলস্পর্শী অন্ধকার। সহস্র বাহু বিস্তার ক'রে সেই অন্ধকারের নাগপাশ তাকে যেন গ্রাস করল।

ভেসে উঠল সর্দারের মুখটা। সর্দার বলেছিল : বেইমানী করার চেষ্টা কর্‌বি না।

সেই বেইমানীই সে করল! ধরা পড়ে এই প্রথম বুঝতে পারল সুলতানের কাছে সর্দারের কসম খাওয়া কতো মূল্যহীন। মানুষকে বিশ্বাস করাটাও কতো বড়ো মিথ্যে! মানুষ অবিশ্বাসী, বেইমান।

· আপন স্বার্থে ভুলে গেল জীবনদাতার ঋণের কথা। যে তাকে জীবনের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে এলো আজ তার মুখটাই সে অন্ধকারে ভরিয়ে দিল।

প্রেম নয়, স্বার্থ। একটা নারীদেহের প্রতি লালসা। পুরুষের প্রয়োজন! জমিলার দেহটাই তাকে ভুলিয়ে ছিল, লোভী ক'রে তুলে-ছিল। ভোগের নেশায় অন্ধের মতো শুধু নিজের নয় আর একজনেরও চরম সর্বনাশ করল।

খোদার নামে কসম খাওয়া মিথ্যে হয়ে গেল। কতো বড়ো মিথ্যে!

ভাবতে পারল না সফি। মাথাটা দুলে উঠল তার। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুষড়ে উঠল প্রাণটা।

দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে শূন্যকক্ষের মাঝে বসে পড়ল সে।

॥ নয় ॥

নজরবিবির কাছ থেকে আবার ডাক এলো। খোজা বাহারাম এলো ডাকতে।

সফি বসেছিল চুপ ক'রে। মনটা এলোমেলো। চিন্তাশক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে। ভয়-আশংকা-দুর্ভাবনায় মনটা উদ্‌ভ্রান্ত।

সেদিন সুলতানের কক্ষে সেই ঘটনার পর দু'টো দিন-রাত্রি পার হয়ে গেছে। দু'টো দিন-রাত্রি পার হয়ে তৃতীয় দিনের সন্ধ্যা।

অনেকক্ষণ আগেই সন্ধ্যাটা ঘন আঁধারের রূপ নিয়েছে। দিনের আলো কখন্ মুছে গেছে, পাখিরা ফিরে গেছে আপন কুলায় কিছুই দেখেনি সে। দেখতো অন্যদিন। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে। দেখতে বড়ো ভালো লাগে তার। দু'দিন আগেও দেখেছে।

এই দু'দিন দেখেনি। কোনো সুর-গান-ভাষা কানে আসেনি তার। কানে এলেও মর্মে পশেনি। দু'টো দিন শুধু ভেবেছে। চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে। পরিত্রাণের উপায় ভেবেছে, কূল খুঁজেছে, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয়নি।

মনে হয়েছে কোথাও পালিয়ে যায়। অনেক—অনেক দূরের কোনো অজানা নিরুদ্দেশে। যেখানে কেউ কোনোদিন খুঁজে পাবে না তাকে। পড়তে হবে না লজ্জায়। নিষ্কৃতি মিলবে সুলতানের সামনে অপরাধী হয়ে দাঁড়ানোর হাত থেকে। শাস্তি গ্রহণ করতে হবে না তাকে।

কিন্তু মনের এ-যুক্ত মেনে নিতে পারেনি। নিজেকে ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল ব'লে বোধ হয়েছে। তার চেয়েও বড়ো কথা সুলতান নয়, বেগমের ভয়ে পালিয়ে যেতে চাইছে সে।

শুধুমাত্র প্রাণের ভয়! জামান খাঁর নুন-খাওয়া একটা মরদ বেইমানী করেছে। যে জামান খাঁ সাচ্চা ধারণায় খোদার নামে কসম খেয়েছিল তার জন্যে। সুলতানকে কথা দিয়েছিল। সুস্থ স্বাভাবিক পৌরুষের অধিকারী হয়েও হারেমে প্রবেশের অধিকার লাভ করেছিল। সৈফুদ্দীন নিজের জীবনকে নির্ভাবনায় তুলে দিয়েছিলেন তার হাতে।

সেই বিশ্বাসের পাত্র অবশেষে সত্যিসত্যিই বেইমানী করল! সর্দারের কসমের মূল্য মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। আর এজন্যে হয়তো জামান খাঁকে কম ক্ষতি স্বীকার করতে হবে না। সত্যিই যদি পালিয়ে যায় জামান খাঁ আর কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।

কিন্তু সত্যিই কি সে বেইমানী করেছে?

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সুলতানের সঙ্গে?

না-না! আর্তকণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রে উঠেছে সফির সমস্ত অন্তরাত্মা। বেইমানী সে করেনি। বেইমানী সে করবে না।

তবে?

ভাবতে পারেনি সফি। চিন্তাশক্তি তার লোপ পেয়েছে। দু'খানি করুণ আঁখি, একটি ম্লানমুখের ছবি ফুটে উঠেছে চোখের সামনে।

জমিলা!

জমিলাকে ভালোবেসেছে সফি। কিন্তু এ-ভালোবাসার জন্ম একদিনে নয়। দিনের পর দিন ওকে দেখেছে। কাছে পেতে চায়নি, দূরে ঠেলে দিয়েছে। সাবধান হয়েছে। নিজের কর্তব্য, সুলতানের বিশ্বাস আর সর্দারের সতর্কতা সাবধান করেছে।

নারী নয়, নাগিনী। ওদের নিঃশ্বাসে বিষ, স্পর্শে জ্বালা। নারী নরকের দ্বার। সব ভুলিয়ে দেয়। টেনে নিয়ে যায় ধ্বংসের পথে। সাধ্য কি সেখান থেকে ফিরে আসা!

ফিরতে চেয়েছে সে। ভুলতে চেয়েছে। হারেমের কুৎসিত আবহাওয়ার মাঝে সুস্থ রাখতে চেয়েছে নিজের মনটাকে। অক্ষত রাখতে চেয়েছে বিবেক আর মনুষত্ব বোধটাকে।

আর বিবেক আর মনুষত্বের অধিকারী ব'লেই চিরদুঃখিনী, লাঞ্ছিতা মেয়েটাকে একদিন কাছে টেনে নিয়েছে। মুছিয়ে দিয়েছে ওর চোখের জল। আশ্বাস দিয়ে বলেছে : আমি তো আছি।

খোদা ভিন্ন যার কেউ ছিল না একদিন, আজ তার জীবনে এসেছে বন্ধু। ম্লানমুখে হাসি ফুটেছে। ভুলেছে লজ্জা আর অপমানের অতীত আর ভুলেছে নির্যাতনের বর্তমান। বুকে মাথা রেখে ভুলতে চেয়েছে সবকিছু। চিরন্তনী নারী-মন স্বপ্ন দেখেছে ভবিষ্যতের। যে স্বপ্ন চির মধুরের।

তরুণ প্রাণটি বিস্মৃত হয়নি নিজেকে, ভোলেনি কর্তব্য—জীবনের পথপরিক্রমায় তুলে নিয়েছে নারীকে।

এতে ভুল কোথায়? কোথায় পায় অন্যায়, বেইমানী?

না, সফি কোনো অন্যায়, কোনো পাপ করেনি। তবু…

সুলতানি দুনিয়া। বিচিত্র এখানের নর-নারী। নর সুলতান—একজন ভাগ্যবান। নারী অসংখ্য বঞ্চিতা দুর্ভাগিনীর দল। নসিব যাদের পাপের পঙ্কে ঠেলে দিয়েছে। সুখ-সম্পদ্ নয়, নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে।

সুলতান সৈফুদ্দীন তো মহৎ, মহান্। দয়ার শেষ নেই তাঁর। তাঁর বিচারে সবাই সমান। তবে? তবে কেন তিনি হারেমের নরকে বন্দিনী ক'রে রেখেছেন অসংখ্য দুর্ভাগিনীকে। কেন তিনি ফিরিয়ে দিলেন না ওদের সুস্থজীবন, বাঁচার পথ, মুক্তির আলো।

পারেন না? অক্ষম তিনি? হারেমের দুর্ভাগিনীদের মুক্তি দেওয়ার, বাঁচার নেই অধিকার—ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো সাধ্যই তাঁর নেই—নেই অধিকার!

হয়তো তাই। এই সত্য। তবু মনটা তার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কঠিন করেছে নিজেকে। অন্তর্হিত হয়েছে সবটুকু ভয়, দুর্ভাবনা।

সে পালাবে না। সুলতানের বিচারে সত্যিই যদি সে অপরাধী

হয় শাস্তি গ্রহণ করবে। পাপ না ক'রেও করবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত। দেখবে শেষ কোথায় !

সে প্রস্তুত। নিজেকে সহজ ক'রে তুলেছে। মন থেকে দূর করেছে মিথ্যে চিন্তা। তার দৃঢ় বিশ্বাস, সুলতান তাঁর বেগমকে যথেষ্ট পেয়ার করেন। হয়তো বেগমের কোনো কথাই তিনি অবিশ্বাস করবেন না। একটু আশা, আলোর ক্ষীণ রশ্মিও যেন দেখা যায়। বেগমের সব কথা বিশ্বাস করা সত্ত্বেও নিশ্চয়ই তিনি বিনা বিচারে তার শাস্তি বিধান করবেন না। অপরাধীর কিছু বক্তব্য আছে কি-না শুনতে চাইবেন।

তখন স্পষ্ট ভাষায় সবই জানাবে সে। লজ্জা-সংকোচ-দ্বিধাকে মনে ঠাঁই দেবে না। বলবে, হারেমের বাঁদী মেয়েটাকে সে পেয়ার করে। শুধু পেয়ার নয়, ওকে এই নোংরা জীবনটা থেকে মুক্ত করতে চায়। কসবীর মেয়ে দিনের আলো, সুস্থজীবনের স্বপ্ন দেখে, বাঁচতে চায়।

আর তা জানে ব'লেই দেখতে চায়, সেই জীবনকে ও মেয়ে কেমন ভাবে গ্রহণ করে ! ওর দেহের প্রতি একটা মিষ্টি মোহ থাকলেও লোভ নেই। সে যদি লোভী হোত, ব্যভিচারের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতো, তাহলে এতোদিন এতোগুলো দিন-মাস, তিনটে বছরে তার বলিষ্ঠ যৌবনের মোহে হারেমের অনেক সুন্দরীর যৌবনকেই উপভোগ করতে পারতো সে। পারেনি শুধু কর্তব্যের জন্যে। মন তার কর্তব্য ক'রে গেছে, ভালোবেসেছে হৃদয়।

আরও অনেক কথাই ভেবেছে সফি। দু'টো দিনের সমস্ত সময় চিন্তা করেছে। আশা-নিরাশার দোলায় ক্ষণে ক্ষণে দুলে উঠেছে মন।

এক-একবার মনে হয়েছে, সে বুঝি পাগল হয়ে গেছে। তার দিমাগের ঠিক নেই। মাথাটা বিগড়ে গেছে। তাই এতো ভাবছে। ভয় পাচ্ছে। জানের ভয়টা তাকে পাগল ক'রে তুলেছে।

জানের ভয় ! হাসি পেয়েছে তার। একটা পাইক জানের ভয়ে

পাগল হয়ে গেছে। যে ভয়টা তাদের প্রথমেই দূর করতে হয়। মন থেকে মুছে ফেলতে হয় নিজের জানের কথাটা।

তাই তো শিখিয়েছে, শিখেছে, ভাবতে বলেছে সর্দার। বলেছে : পাইক তার জানের কথা ভাবলে চলবে না। পাইক যদি তার জানের কথা সব সময় ভাবে, ভীত হয়, তাহলে জিন্দা থাকা তার পক্ষে খুব মুশকিল। কারণ, নিজের জানের কথা ভাবতে ভাবতে অপরের জানের কথাটাও মনে পড়ে যায় তার—যাকে হয়তো সে খতম করতে যাচ্ছে। আর এমনি যদি হয়, তাহলে অন্যকে খতম করা তো দূরের কথা নিজেকেই মুর্দা বনতে হবে।

সর্দারের কথাটা হয়তো সত্যি। সত্যি কথা হয়তো বলেছে জামান খাঁ। দেখেছেও অনেক। হামেশাই তো ঝুট-ঝামেলা, খুনোখুনি লেগে আছে। কথায় কথায় মারামারি। যে এইমাত্র জিন্দা আছে, খানিক পরে সে যে জিন্দা থাকবে, আল্লাও হয়তো শোচতে পারেন না।

গৌড় মসনদে সৈফুদ্দীন বসে আছেন। সুলতান তিনি, কিন্তু খোদার মতো একমাত্র তিনি তো নন। অনেকে আছেন। ছোট-বড়ো অনেক—অনেক রাজা-মহারাজ, জমিদার। সৈফুদ্দীনের মতো এতো শক্তি, লোকবল, অস্ত্রবল হয়তো তাঁদের নেই, কিন্তু শক্তিহীন তাঁরা নন। সুলতানের প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করলেই ঝামেলা বাধে। ছুটতে হয় পাইকের দলকে। আবার কখনো তাঁরা দলবল নিয়ে ছুটে আসেন। মারতে আসেন, মরতে আসেন। আর এমনই তাজ্জব কাণ্ড যে, কোনো সংবাদ আগে জানা যায় না। হঠাৎ রে-রে শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমস্ত তছনছ ক'রে দেয়।

এছাড়া, আছে দস্যুদলের হানা। মগ-বোম্বেটেদের অত্যাচার। সম্পদের লোভে প্রায়ই তারা হানা দেয়। কখনো রাতের অন্ধকারে কখনো বা দিনের আলোয় মানুষের কাজের সময়।

সেইজন্যেই পাইকদের কে কখন্ জিন্দা থাকবে আর থাকবে না

বলা মুশকিল। সাবধান হয়ে না থাকলে বিপদ ঘটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

তাছাড়া, মানুষের জীবন-মৃত্যুর কথা কে বলতে পারে! যতো সাবধানে, যতো ভয়েই থাক না কেন সময় হ'লে ঠিক ছিনিয়ে নিয়ে যাবে মৃত্যু। মৃত্যুকে রোধ করার সাধ্য কারো নেই।

কিন্তু এ-ভয় তো সে-ভয় নয়! মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে সে প্রস্তুত। জানের পরোয়া তার নেই। তবু ভয়! একটা অজানা আতংক তাকে অষ্টপ্রহর সমস্ত সময় ঘিরে ধরে আছে। কে যেন বারবার সাবধান হ'তে বলছে। আর সেইজন্যেই সে উদ্‌ভ্রান্ত, দিশাহারা।

আর তার দিশাহারা ভাবটা যে মিথ্যে নয় সে নিজে বুঝতে না পারলেও বাবুর্চি বুড়ো পেরেছে। বুড়োর ছানিপড়া চোখে ধরা পড়ে গেছে সে। সন্দেহের চোখে তাকিয়েছে। বলেছে: কি রে, কি হয়েছে তোর?

চমকে উঠেছে সফি। সাবধান হয়েছে। পাশ কাটিয়ে বলেছে: কিছু হয়নি।

: জরুর কিছু হয়েছে। চেপে ধরেছে বুড়ো।

: কী আবার হবে? বিরক্তি বোধ করেছে সে।

: বসে রয়েছিস্ কেন চুপচাপ? জানতে চেয়েছে বুড়ো।

: বসে না থেকে উপায় কি? সফি তার বসে থাকার, ক্লান্তি প্রকাশের চেষ্টা করেছে। অভিনয় করেছে। ধরা পড়তে চায়নি।

সফলও হয়েছে। বিশ্বাস করেছে বুড়ো। চোখটিপে হেসে জানতে চেয়েছে: সাচ বলছিস্ কিছু করার নেই তোর?

: থাকলে বসে থাকি?

হুঁ! একটু চুপ ক'রে মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছে বুড়ো। তারপর খেঁকিয়ে উঠে গালি দিয়ে বলেছে: তুই একটা বুদ্ধু। জোয়ান মরদ চুপচাপ বসে আছিস্। জানানা বনে গেছিস্ নাকি?

: জানানা বনবো কেন ?

: তাই তো দেখছি। দু'টো দিন চুপচাপ বসে শোচচিস্। বুঝ্‌লি বুদ্ধু, জোয়ান উমরটা চুপচাপ বসে থাকবার জন্যে নয়।

: জাহান্নামে যেতে বলছিস্ ?

: তুই যাবি ? খিক্-খিক ক'রে হেসেছে বুড়ো। বলেছে : তুই যাবি কী ? মালেক পাঠাবে তব না ?

চুপ ক'রে থেকেছে সফি। কথা বলতে ইচ্ছে করেনি।

বাবুর্চি বুড়ো এক সময় বলেছে : তুই বড়ো ভালো।

বাবুর্চি বুড়োর ভালো বলাটা বড়ো খারাপ আর তিক্ত শুনিয়েছিল তার কানে। বলেছে : আমি ভালো তো তোর কী ?

: তুই দিওয়ানা।

: ফিন্!

: তোর দিমাগ বিলকুল গড়বড় হয়ে গেছে।

রুক্ষ হয়ে উঠেছে সফি। তেড়ে উঠেছে। বেগতিক দেখে সরে গেছে বুড়ো।

আর সফি ভেবেছে, সত্যিই সে একটা বুদ্ধু। একটা জ্ঞান-বুদ্ধিহীন নিরেট বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। দিনের পর দিন নিজের জিন্দিগিটাকে শুধু বরবাদ ক'রে চলেছে। লাভ-লোকসানের কথা ভাবেনি। ভবিষ্যতের কথা একটা দিনের জন্যেও চিন্তা করেনি।

অথচ মানুষ, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের কথা ভাবে। বর্তমান ভাবতে শেখায় ভবিষ্যতের কথা। অনাগত দিন, যা আসবে। বর্তমান তো এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের পথে। আজকের ভবিষ্যৎ তো আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

সেই ভবিষ্যৎকে এতোদিন অস্বীকার করেছে সে। ভবিষ্যতের দিকে ফিরে চায়নি, বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে সব সময়। সামনে নয়, পেছনের দিকে ফিরে চেয়েছে বারবার। নিষ্ঠুর অতীতটা বড়ো যন্ত্রণাময় তার কাছে। বর্তমানের জীবনে সে তাই খুশি।

সত্য আর সততা। মিথ্যেকে সে ঘৃণা করে। লোভ—পাপ। জীবনের অপমৃত্যু। সে বাঁচতে চায়।

নিজের কথা সে ভাবে না। সে শুধু এইটুকু মনে রেখেছে একদিন তার দিন কেটেছে পথের কুত্তার মতো। আজ সে বেঁচে আছে। আর সেইজন্যেই সাধ্যমতো সকলের দিকে দৃষ্টিপাত। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রাণে আঘাত হানে। আনন্দ দেখলে ভাবে দুনিয়ার সব মানুষ যদি এমনি খুশি থাকতো? আর সেইজন্যেই মানব-দরদী সুলতান সৈফুদ্দীনের জন্যে তার মন সজাগ। মুঠো-মুঠো আশরফির প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে। নিজের সুখের জন্যে সকলের সর্বনাশ তার কাম্য নয়।

তবু যদি তাকে বিনা অপরাধে শাস্তি গ্রহণ করতে হয়, করবে। কিন্তু নীরবে নয়, মানব-দরদী সুলতানকে জানাবে তার মনের কথা। হারেমের দুর্ভাগিনীদের মুক্তির প্রার্থনা জানিয়ে যাবে। ওরা যে সবার চেয়ে দুঃখী!

খোজা বাহারাম অনেকক্ষণ হ'ল চলে গেছে।

যখন সে এসেছিল তখন দিনের আলো কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। এখন পরিপূর্ণ অন্ধকার। আলো নেই কোথাও।

সফির মনে পড়ল নজরবিবির কাছে যাবে ব'লে বাহারামকে কথা দিয়েছে।

কথা যখন দিয়েছে যাবে সে। কিন্তু নিজেকে বড় দুর্বল মনে হ'ল তার। মনে হ'ল তাকে ঘিরে যেন চক্রান্তের জাল বিস্তার শুরু হয়েছে। বেগমও যেন আছে এর মধ্যে।

জমিলার সঙ্গে এই যে ঘনিষ্ঠতা, মেশামিশি এটা দু'-একদিনের নয়। হারেমের অনেকেই হয়তো জানে।

জমিলাও এ-সম্বন্ধে দু'-একবার বলেছিল। সফি সাবধান হয়েছে আরও। সাবধান করেছে জমিলাকে।

জমিলা বলেছে : জানো, বোধহয় ধরা পড়ে গেছি!

: সে কী? চমকে উঠেছে সে।

: হ্যাঁ! জমিলার মুখটা একটু পাংশু দেখিয়েছে। বলেছে : আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল।

: কী?

: আমাদের কথা। ওরা সন্দেহ করেছে।

: কী বললে?

: বলেছি মিথ্যে কথা। পেয়ার নয় পয়জার দিই তোমাকে আমি। লেকিন···

: কী?

: ওরা বিশ্বাস করেনি।

: কেন?

: ওরাও যে জানানা। আমরা বুঝতে পারি। আমাদের চোখ ধরতে পারে সব। গলতি কিছু দেখলেই আমরা ধরে ফেলি।

: কেমন ক'রে?

: তা জানি না। আমরা বুঝতে পারি না কেমন ক'রে হয় এমনটা। বুরা কামের দিকে সব সময় নজর আমাদের।

হয়তো সত্যি কথাই বলেছিল জমিলা। মেয়েদের মন বা চোখকে হয়তো ফাঁকি দেওয়া যায় না।

তবু ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সাবধান হয়েছে আরও বেশি ক'রে।

তবু ধরা পড়ে গেল। ধরে ফেললেন বেগম!

কিন্তু তিনি কি এই প্রথম দেখলেন? তাঁর চোখে কি ধরা পড়া এই প্রথম?

চকিতে একটা কথা বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে গেল সফির মাথায়। সন্দেহটা দৃঢ় হ'ল মনে। পরপর দু'টো ঘটনা। একটা অদৃশ্য যোগাযোগ যেন···

ভাবতে পারল না সফি। তার মাথাটা ঝিম্-ঝিম্ ক'রে উঠল। প্রৌঢ় নির্বিরোধী সুলতানের প্রধানা বেগম তরুণী, সুন্দরী। আর বেগম হবার আগে তাঁর পরিচয়, তিনি কোথা থেকে এলেন কেউই জানে না। যদি তেমন কিছু হয়···

না-না, তাই বা কেমন ক'রে সম্ভব। শাহ্‌জাদা সম্পর্কে সুলতানের কাছে বেগমের স্পষ্ট অভিযোগ শুনেছে সে। শাহ্‌জাদাকে শাসন করার, তাকে শাস্তি দেওয়ার আর্জি পেশ করেছেন। সুলতানের বদনামী বন্ধ করতে বলেছেন।

তবে কি সবই মিথ্যে, ভুল, অভিনয়! মসনদে সুলতানের দীর্ঘ দিনের স্থায়িত্বই কি এর কারণ?

হয়তো তাই! সন্দেহের দোলায় যা সত্য ব'লে মন মেনে নিতে চাইছে না তাই হয়তো সত্যি। নিষ্ঠুর সত্যি।

শিউরে উঠল সফি। বুকের মধ্যে আবার সেই যন্ত্রণাটা উপলব্ধি করল। কেউ ভালো নয়। বেইমানীর ছুরি শানাচ্ছে সবাই। শুধু মাত্র বসিয়ে দেবার অপেক্ষা।

আকাশটার দিকে চাইলো। অন্ধকার। এতোটুকু আলো নেই। অন্যদিন তারা থাকে। আজ তাও নাই। একটু যেন মেঘের ভাব। জমাট কালো আস্তরণ। মধ্যবসন্তে ঝড়ের পূর্বাভাস। বৃষ্টিও নামতে পারে। তৃষ্ণা আকণ্ঠ!

একবার—শুধু একটিবার সফি চলুক। নজরবিবির বড় প্রয়োজন তাকে। বিশেষ দরকার। বারবার এই একটি কথাই বলেছিল বাহারাম।

ঃ কাহে? জানতে চেয়েছিল সে।

ঃ আমি জানি না।

ঃ তাহলে? রীতিমতো চিন্তিত হয়েছে সফি।

ঃ আপনি চলুন। অনুনয় করেছে বাহারাম।

ঃ লেকিন, দরকারটা কী? এবার বিরক্তিবোধ করেছে সে।

ঃ কী জানি! বিবিজী বলেছে বহুৎ-বহুৎ জরুরী।

: জরুরী !

: হ্যাঁ, ওস্তাদ।

: লেকিন···। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল সে।

: আপনি চলুন। হাতদু'টো চেপে ধরেছে বাহারাম।

: বেশ যাবো। কথা দিয়েছে সফি। বলেছে : লেকিন, তোমার বিবিজীকে গিয়ে বলবে ফালতু বাত আমি শুনতে চাই না।

: না-না। বলেছিল বাহারাম। জিজ্ঞাসা করেছিল : আভি যাবেন ?

: না, এখন নয়।

: তবে ?

: আজ বা কাল। একটু ভেবেছিল সফি, তারপর বলেছিল : সময় মিললেই যাবো।

: লেকিন ··

: কী ?

: বিবিজী বলছিলেন আজই···

: আমার কাজ আগে। শক্ত হয়েছিল সফি। বাহারামকে বলেছিল : তুমি এখন যাও।

চলে গিয়েছিল বাহারাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়েছিল যেতে। সফি ভেবেছিল। নানান চিন্তা জট পাকিয়ে উঠেছিল মনে। ভেবেছিল, যাবে ব'লে কথাটা না দিলেই পারতো। কাজটা উচিত হ'ল না।

ভয় ! হাসি পেল সফির। নজরবিবির কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে সে। সেইজন্যে চিন্তা করার জন্যে সময় নিয়েছে। ভাববে ! ভেবে দেখবে তার যাওয়া উচিত হবে কি-না !

একটা জানানাকে ভয় করে সফি। জানানার ভয়ে সফি নামের মরদটা দিশাহারা !

এখন উঠল সফি। নজরবিবির কাছেই যাবে। কৌতূহল যে নেই তা নয়। তাকে বড় প্রয়োজন নজরবিবির।

কিন্তু কেন ? তার কাছে কি প্রয়োজন থাকতে পারে তার ? বুঝতে পারল না।

সামান্য পথ। একটু ঘুরেই ভাগীরথীর দিকে যেখানে মোড় নিয়েছে রাস্তাটা—তার পাশেই নাসিরুদ্দীনের প্রাসাদটা। উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বিরাট প্রাসাদ। একলাই ভোগ করে নাসিরুদ্দীন। দাসী-বাঁদী আর রাজ্যের জানানার ভিড়। ইচ্ছেমতো বেছে-বেছে এনে তুলেছে।

সহায় সিদ্দিবদর। সেই উচ্ছন্নে পাঠিয়েছে নাসিরুদ্দীনকে। তার ইচ্ছেতেই চলে শাহ্‌জাদা। নাসিরুদ্দীনের পেয়ারের দোস্ত সে।

সফি এগুচ্ছিল। যদিও আকাশে তারা ফোটেনি, চাঁদ ওঠেনি, মেঘের ভারে থমথমে ভাব, তবু পথে আলো ছিল। সে আলো ম্লান। আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি…শুধুমাত্র মানুষ চেনা যায়। কিন্তু সফির দেরি হচ্ছিল। পা উঠছিল না। দূরত্বের পরিমাণ অনেকখানি মনে হচ্ছিল। বুকের মধ্যে একটা সর্বনাশা আলোড়ন। কে যেন সাবধান করছিল। ফিরে যেতে বলছিল। সফির অতিক্রমের পথকে দূরত্বে পৌঁছে দিচ্ছিল।

আর ঠিক এমনি সময়। তার দ্বিধাগ্রস্ত পথঅতিক্রমে হঠাৎই বাঁ চোখটা কেঁপে উঠল ক'বার।

নজরবিবি তার কেউ নয়। কোনো সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে। তবে ? কেন যাবে নজরবিবির ডাকে। থাক্‌না প্রয়োজন। তার কি এসে যায় !

দাঁড়িয়ে পড়ল সফি। সে যাবে না।

ফিরতেও পারল না। ফিরতে দিল না তাকে খোজা বাহারাম। সে যেন ওৎ পেতে তার আগমন প্রতীক্ষা করছিল। থমকে দাঁড়াতেই কোথা থেকে কাছে এলো। চাপাস্বরে ডাকল : ওস্তাদ !

: তুমি ! বিস্ময়ের যেন শেষ নেই সফির।

: আপকে লিয়ে। দাঁত বার ক'রে হাসলো সে।

: কেন ?

: বিবিজীকা ফরমাশ।

: আমার ওপর নজর রাখতে বলেছে? যেন চিৎকার ক'রে উঠতে চাইলো সফি।

: নেহি-নেহি।

: তব? সফি কঠিন হ'তে চাইলো। বাহারামের ওপর রাগ হচ্ছিল তার। ইচ্ছে করছিল তার ওপর নজর রাখার জন্যে বান্দাটাকে একটা চড় কশায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, ওর কি দোষ! ও তো নজরবিবির আদেশ পালন করছে।

বাহারাম বললে: বিবিজী বললে আজ আপ জরুর আইয়ে গা।

: ম্যায় বোলা?

: নেহি-নেহি।

: তব? সফির কেমন যেন মনে হ'ল। সে তো আসবে না বলেছিল। তারপর হঠাৎই খেয়াল হ'তে চলে এসেছে। কিন্তু নজরবিবি কেমন ক'রে তার মনের কথা জানলো? জানতে পেরে বাহারামকে রাখল। কেমন ক'রে···কেমন ক'রে, ভেবে পেল না সে।

আর একটা কথা মনে হ'ল সফির। নজরবিবি নয়, নাসিরুদ্দীনই বাহারামকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে নির্দেশ দিয়ে গেছে। তা যদি না হবে তাহলে শাহ্‌জাদা তার পেয়ারের বান্দাকে, যাকে ছাড়া তার এক মুহূর্ত চলে না তাকে রেখে গেল কেমন ক'রে।

নজরবিবির তাকে জরুরী প্রয়োজন এ অজুহাতটা মিথ্যে। আসলে তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার হয়েছে। যে-কোনো উপায়েই হোক··

: ওস্তাদ! বাহারাম চিন্তাস্রোতে বাধা দিল।

সফি তার দিকে চাইলো। ম্লান আলোয় বাহারামের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। কোনো কথা বললে না।

: উনকো পাশ আপকা পৌঁছানা বহুৎ জরুরী হ্যায়।

: ক্যাহে? আবার সেই প্রশ্ন।

: ও ম্যায় বোলনে নেহি সক্‌তা। সেই একই উত্তর।

: তব তো ম্যায় নেহি যাউঙ্গা।

: ওস্তাদ! মিনতি ঝরে পড়ল বাহারামের কণ্ঠে। বললে: ম্যায় মাফ মাংতা, আপ চলিয়ে।

: লেকিন, যানে কা বাদ বেইমানী করেগা তো? তীক্ষ্ণকণ্ঠে কথাটা জানতে চাইলো সফি।

: খোদা কসম!

খোদা! হাসি পেল সফির। কারণ, খোদার নাম নিয়েই তো এতোদিন মসনদটাকে ঘিরে বেইমানীর খেলা চলছে। সাচ্চা আদমা খোদার কসম খায়। বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করে। রাখতে না পারলে জান পর্যন্ত দেয়। কসম খায় শয়তানেও। খোদার নাম নিয়ে বিশ্বাসকে ধূলায় লুটিয়ে দেয়। দেখেছে সফি। চোখ খুলে গেছে তার। যেটুকু অন্ধকার-অস্পষ্টতা ছিল তা উজ্জ্বল পরিষ্কার। স্বার্থই সত্যি। মানুষ নিজের স্বার্থে অন্ধ। স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় ঘটলে ভুলে যায় সবকিছু। সেই সর্বশক্তিমান অদৃশ্য খোদার কথা তখন বিস্মৃত হ'তে একমুহূর্ত লাগে না।

হয়তো ভুলে যাওয়া, অস্বীকার করার শাস্তি তারা পায়। কিন্তু একজনের বেইমানীতে হাজার জনের সর্বনাশ এড়ানো সম্ভব হয় না।

বাহারাম বললে: আমি ঝুটা বলছি না ওস্তাদ। আমি জান কবুল করলাম।

আরও সাবধান হ'ল সফি: জিন্দা রাখলে তো?

: ঝুটা বলছি না। ঝুটা বলতে আমি শিখিনি। খোজা বাহারাম অনেক ঝুটা কাম করেছে। মালেকের জন্যে গুনাহের শেষ নেই আমার। লেকিন, আজ তক কোনোদিন ঝুটা বাত বলিনি।

: সাচ? মনটা মেনে নিতে চাইছিল না, আবার অবিশ্বাস করতেও পারল না।

: সাচ, ওস্তাদ!

সেই আবছা অন্ধকারে সফির বুকে হাত রাখল বাহারাম।

বললেঃ আপনার সঙ্গে কোনোদিন বেইমানী আমাকে যেন না করতে হয়।

এবার আর অবিশ্বাস করতে পারল না সফি।

॥ দশ ॥

সফির জন্যেই বুঝি অপেক্ষা করছিল নজরবিবি। শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীনের পেয়ারের বুলবুল। একদিন যাকে নিয়ে ঝড় উঠেছিল গৌড়ে। বাজারের একটা কসবীকে ঘরে ঠাঁই দিতে কেউই রাজী হয়নি। আমির-ওমরাহের দল অভিযোগ জানিয়েছিলেন সুলতানের কাছে। সৈফুদ্দীন বুঝিয়ে ছিলেন নাসিরুদ্দীনকে। ত্যাগ করেনি সে এই কসবী মেয়েটাকে। বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু মিটে গিয়েছিল একদিন সব বিরোধ, মেনে নিয়েছিলেন সকলেই।

সফিকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে নজরবিবি বললেনঃ আইয়ে জনাব!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সফি। নজরবিবির হাসি, আর অভ্যার্থনার ভঙ্গীটা তার ভালো লাগল না। কান দু'টো গরম হয়ে উঠল। তবু সে থতমত কণ্ঠে বললেঃ আমাকে ডেকেছেন?

ঃ জী!

ঃ কেন?

ঃ বসবে না?

নজরবিবির দিকে এক মুহূর্ত চোখ তুলে চেয়েই মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল সফি। নজরবিবির রূপটা বড় উগ্র, মাদকতা-মাখা। জ্বালা ধরায়। আগেও ক'বার দেখেছে, কিন্তু অবগুণ্ঠনহীনা মুখ দেখা এই প্রথম!

ঃ বসবে না? আবার বলল নজরবিবি।

এবার বসলো সফি। ফরাশ পাতা ছিল, তার একধারে বসলো।

লক্ষ্য করল নজরবিবি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকে দেখছে। অশ্বস্তি বোধ করল। কপালে ঘাম দেখা দিল।

: বাহারাম! একটু দূরেই দাঁড়িয়ে ছিল বাহারাম। কাছে আসতে নজরবিবি বললে: সরবৎ লাও।

বাহারাম চলে যেতে নজরবিবির অবগুণ্ঠন মুখের দিকে চেয়ে বললে: সরবৎ কী হবে?

: তুমি খাবে।

: না।

: কেন?

সফি এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। মাথাটা নীচু করল।

: ভয় নেই! নিজের মনেই কথাটা বলল নজরবিবি। সফির কানে এলো ঠিকই। সে মুখ তুলে চাইলো।

নজরবিবিও তাকালো তার দিকে। চোখে চোখ রাখল। বললে: পিয়াস লাগেনি?

: না। মাথা নাড়ল সে।

: তবে?

: কী?

: ছেলেমানুষ! আবার নিজের মনেই আস্তে কথাটা উচ্চারণ করল নজরবিবি। শব্দ ক'রে হাসলো। মুখটা ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে।

সফি দেখলো হাসলে টোল পড়ে নজরবিবির সুন্দর মুখের নরম মসৃণ গালে। ভালো দেখায়।

নজরবিবির দৃষ্টিটা অন্যদিকে। বাইরে আসমানের দিকে তুলে ধরেছে মুখটা। কি যেন ভাবছে। চোখে চিন্তার ছায়া। কপালের রেখায় স্পষ্ট ছাপ।

হঠাৎ সফির মনটা লোভী হয়ে উঠল। দেখলো নজরবিবিকে। চোরের মতো ভয়-দ্বিধা-আতংক জড়ানো মনে। তবু না দেখে পারল না।

সুন্দর একটা নারীদেহ। চাঁপার মতো গায়ের রঙ। উন্নত বক্ষ,

ক্ষীণ কটি, গুরু নিতম্ব। শ্রাবণের মেঘের মত একমাথা ঘনকৃষ্ণ কেশ। পিঠ আর বুকের একাংশে এলায়িত। সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। লোভনীয় ক'রে তুলেছে। যে লোভে একদিন মানুষের দল ছুটে যেত। যেমন একদিন সংবাদ পেয়ে ছুটে গিয়েছিন শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীন।

সফির মনটা নজরবিবির সঙ্গে জমিলার তুলনা করল। পুরুষদের মন! যে-মন নিত্যনতুন সন্ধানে ব্যস্ত। ভুল করে—ভুলে যায়। সে-মনের মনে হ'ল জমিলার যেন কিছুই নেই। জমিলা নিস্ব, রিক্ত। শুধু দু'টি চোখ। ব্যথা-বেদনায় স্থির-ম্লান।

কিন্তু······

না-না, আছে। সফি দেখেছে। তার ভালোবাসার মনটা উপলব্ধি করেছে। নিস্ব রিক্ত মেয়েটারই স্থির-ম্লান চোখ দু'টোতে দেখেছে কখনো বিদ্যুৎচ্ছটা, কখনো বা স্বপ্ন-কাঁপন। প্রাণে সাড়া তুলেছে। দু'টি সরল চোখ সফি নামের দুরন্ত যৌবনটাকে কঠিন বাঁধনে বেঁধেছে।

জমিলা কিশোরী। নারীত্বের আমন্ত্রণে সদ্য জাগ্রত। তার ঘুম ভাঙার, ফুল ফোটার বেলা। সুন্দর তার বিকাশ। স্নিগ্ধ তার পাপড়ি বেলার কাল। জ্বালা ধরায় না, আমন্ত্রণ জানায়। উজার ক'রে দিতে চায়।

নজরবিবি পরিপূর্ণা নারী। যৌবন তার আগুনের জোয়ার। ভোগের পিপাসা বাড়ায়। কামনার আগুনে দগ্ধ করে।

সেই আগুন যেন তার মনেও সঞ্চারিত হচ্ছিল। তার সংকোচ, তার জড়তা, অপরাধী মনোভাব ক্রমশঃ দেহের প্রতি আকর্ষিত করছিল।

কথা বলছিল নজরবিবি। গবাক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে নানাভঙ্গীতে সফির মনটাকে প্রলুব্ধ করতে চাইছিল। হয়তো বা নরম করতে চাইছে তার মনটাকে। ছলনাময়ী নারী তার ছলনার জাল বিস্তার করতে চাইছে ধীরে ধীরে। দেহের আকর্ষণে।

কেন? ভাবলে সফি। মনটাকে কঠিন করল সে। সুন্দর নারী-দেহের প্রতি লোভী-হওয়া-মনটাকে নিজের চিন্তায় সতর্কতার মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

সুলতানের রক্ষাকর্ত্তা সে। রাতের প্রহরী। সুলতানের জান তার হাতে। সে যদি ইচ্ছে করে······

হয়তো তাই।

তা যদি না হবে তাহলে কেন তাকে নিয়ে আসা? বৈকালিক রূপসজ্জার আড়ালে দেহটাকে যতদূর সম্ভব অনাবৃত রাখার চেষ্টা! বোঝে সফি। সবই বুঝতে পেরেছে। সমস্ত অভিসন্ধি। দেহের প্রলোভনে নিশ্চয়ই তাকে জড়াতে চায়। হয়তো······

হাসি পেল তার। আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠল মনটা। নারীর লোভ পুরুষকে কি সত্যিই অন্ধ করে দেয়? ভুলে যায় সবকিছু?

না, সফি ভোলেনি। ধরতে পেরেছে সে নজরবিবির চাতুরীটুকু। আর সেইজন্যেই সে শেষটুকু দেখবে। ছলনা করবে। আর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে ··

ছিঃ—ছিঃ, এসব কি ভাবছে সে? নিজেকে তার হীন ছোট মনে হ'ল। ধিক্কার দিল নিজেকে। সে-না জোয়ান মরদ! একটা জানানাকে খতম করার কথাটা তার মনে এলো কেমন ক'রে? সুলতানের পাহারাদার বলে কি? আপন বিবেক-বুদ্ধিটুকুও লোপ পেল নাকি?

ঃ হাসতা কিঁউ?

ঃ এ্যাঁ! নজরবিবির আচমকা প্রশ্নটায় ভাবণভাবে চমকে উঠল সফি। মনে করতে পারল না সত্যিই সে হাসছিল কি-না। বললেঃ আমি?

ঃ জী হ্যাঁ! নজরবিবিও ঠোঁট টিপে একটু হাসলো। বললেঃ কেন?

নিজেকে মুহূর্ত্তে সামলে নিয়ে সফি বললেঃ ও কিছু নয়!

ঃ তবে?

ঃ একটা কথা ভাবছিলুম। হয়তো সেইজন্যেই······

ঃ খুশির বাত?

ঃ না, তা নয়।

: তবে ?

নজরবিবি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। শুনতে চায় তার কথা।

আরও সাবধান হ'ল সফি। বললে : যার কথা ভাবতে ভাবতে হেসেছি, সে কিন্তু একদিন খুবই কেঁদেছিল। আঁখির পানিতে বুক ভাসিয়েছিল। যদিও তার কান্না আমার আচ্ছা লাগেনি। কারণ তাকে আমার বুদ্ধু ব'লে মনে হয়েছিল।

: কেন ?

একটু চুপ ক'রে রইলো। যেন ভাবতে চেষ্টা করল কারণটা। বললে : সে না কেঁদে হাসতেও পারতো।

: কী ক'রে ?

আবার চিন্তা সত্যিই চিন্তা করল সফি। বললে : শুধু একটু সমঝে চললেই কাঁদতে হতো না। সে ভুল করেছিল। লোভী হয়ে উঠেছিল। নিজের জিন্দিগিটায় খুশি থাকতে পারেনি। সেই তার ভুল।

: ওঃ! কথাটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল নজরবিবি। আর কিছু প্রশ্ন করল না। জানতে চাইলো না। তার মুখটাও যেন বিবর্ণ দেখালো একটু।

মনে মনে আনন্দ অনুভব করল সফি। যাদের গল্প শুনিয়েছে সেই দলেরই একজন নজরবিবি। নজরবিবিকে ঠকানো কঠিন নয়।

বললে : আমরা বড় বুদ্ধু বিবিজান!

: কেন ? যেন শিউরে উঠল নজরবিবি।

সফি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে নিজের মনেই বললে : আমরা সবাই। খোদা আমাদের বুদ্ধু ক'রে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। লেকিন, আমরা বুঝতে চাই না, বুঝতে পারি না। ভাবি, বড় চালাক আমরা। আর সেই জন্যেই অশান্তি। দিলে এতোটুকু সুখ নেই। আপনি বলুন ?

নজরবিবি কিছু হয়তো বলতো। হয়তো সফির কথাটা অস্বীকার করতে চাইতো। তার আগেই সরবতের পাত্র নিয়ে এগিয়ে এলো বাহারাম।

: এতনা দেরী কিঁউ? তাকে ধমকে উঠল নজরবিবি।

: জী! থমকে গেল বাহারাম। এমন ব্যবহার সে হয়তো আশা করেনি।

তার হাত থেকে পাত্রটা নিল নজরবিবি। সফিকে দিল। বললে : খাও।

বাহারাম বাইরে চলে গেল। দেখলে বেচারা মাথানীচু ক'রে গেল। বললে : বিবিজীর মেজাজ কি শরিফ নেই?

: না-না। বিব্রত বোধ করল নজরবিবি।

সরবতটা যখন নিয়েছে তখন খেতে হয়। বাহারামের সঙ্গে নজরবিবি যদি না অমন ব্যবহারটা করতো হয়তো সরবতের পাত্রটা নিত না। সেই কথাই ভেবেছিল। এখন মন সায় না দিলেও খেতে হ'ল। বললে : আচ্ছা হয়েছে।

: ভালো লাগল? হাসিমুখে জানতে চাইলো নজরবিবি।

: হ্যাঁ। হাসলো সফি। বললে : জিন্দিগিতে এই প্রথম খেলুম। এবার বলুন!

সফির ব্যবহারে ক্ষণপূর্বের মেঘটা কেটে গেছে। হাসিমুখে তার সামনে ফরাশের একধারে বসলো নজরবিবি। জানতে চাইলো : কী বলবো?

সফিও দেখলো নজরবিবিকে। সমস্ত মুখখানা খুশির ছোঁয়ায় উজ্জ্বল। বুঝতে পারল না এ-খুশির কারণ কি! বিপদে পড়ে নিশ্চয়ই তাকে ডাকেনি নজরবিবি। জরুরী প্রয়োজনটা মিথ্যে। ওকথা ব'লে তাকে ডাকিয়ে এনেছে শুধু। আর সেইজন্যেই আরও সাবধান হ'ল সে। বললে : কেন ডেকেছেন?

সফি যে ক'টা মুহূর্ত চিন্তা করছিল নজরবিবি লক্ষ্য করছিল তাকে।

এখন প্রশ্নটা শুনে ঠোঁট দু'টে ঈষৎ উল্টে বললে : এই কথা ? তারপর অকারণে হেসে উঠল হঠাৎ। কৌতুকের হাসি। যে হাসিতে আনন্দ পাওয়া যায়। তারপর হাসতে হাসতেই বললে : তোমার ঘর এখানে ?

ঘরের খবর দেওয়ার জন্যে সফি আসেনি। সেদিনের সেই ঘটনার পর মনটা যদি এমন বিক্ষিপ্ত হয়ে না থাকতো তাহলে নজরবিবির ডাককে সে উপেক্ষা করতো। সুলতান ভিন্ন কারো ডাকেই সে সাড়া দিত না। স্পষ্ট মুখের ওপর সাফ জবাব দিয়ে দিত।

আজ সম্পূর্ণ অন্য পরিস্থিতি। যতোই মনকে সান্ত্বনা দিক না কেন, মনে মনে একটু ভয় পেয়েছে বৈকি! জমিলার জন্যে ভয়টা দানা বেঁধেছে মনে। মেয়েটাকে হয়তো অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হবে। আর দোষী সে নিজে। তার জন্যেই কষ্ট পাবে জমিলা।

সেইজন্যেই ছুটে এসেছে। নজরবিবির ডাকটা উপেক্ষা করতে পারেনি। মনে হয়েছে এখানে এলে পথের সন্ধান পাবে।

নজরবিবি ভিন্ন সুরে কথা বলছে। যদিও সে সুরের মধ্যে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা আছে। আবার আছে সর্বনাশা ইঙ্গিত। ক'দিন আগের সেই দুঃস্বপ্নের ছোঁয়া। লোভের অদৃশ্য ছায়াটাও যেন কাঁপছে কোথায়!

সেইজন্যেই সাবধান হ'ল সে। চুপ ক'রে রইলো। এমন ভাব দেখালো যেন নজরবিবির কথাটা সে শুনতে পায়নি।

নজরবিবি কিন্তু চুপ ক'রে রইলো না। আবার প্রশ্ন করল : তোমার ঘর কোথায় ?

এবার কথা বলতে হয়। কিছু না-বলাটা খারাপ দেখায়। বললে : নেই।

: সাচ ? যেন কথাটা বিশ্বাস হ'ল না নজরবিবির।

: হ্যাঁ।

: কে আছে তোমার ?

: কেউ নেই।

: শাদি করোনি ?

: না।

: কেন ?

এই প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সফির মনটা আবার কঠিন হয়ে উঠল। কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলো।

: কী হ'ল ? একটু পরে মৃদুকণ্ঠে জানতে চাইলো নজরবিবি।

: কী ? কঠিন মুখেই নজরবিবির দিকে চাইলো সফি।

: শাদি করোনি কেন ?

: কেন ডেকেছেন ? তার কণ্ঠে রুক্ষতা প্রকাশ পেল।

বাঁকা চোখে তাকাল নজরবিবি। হাসি হাসি মুখ। হালকা সুরে বললে : একটা কথা শুনলাম।

সফি চুপ ক'রে রইলো।

হাসলো নজরবিবি। বললে : কথাটা কিন্তু তোমাকে নিয়েই !

: আমি যাই।

উঠতে যাচ্ছিল সফি। ওঠা হ'ল না। নজরবিবির পরের কথাটা শুনে বসে পড়ল।

একটু অবজ্ঞা আর ঘৃণা মিশ্রিত সুরে নজরবিবি বললে : তুমি নাকি একটা বাঁদীর সঙ্গে আশনাই করার সময় সুলতানের বেগমের কাছে ধরা পড়ে গেছ ?

সফি ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে নজরবিবির মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কোনো কথা জোগালো না তার মুখে। একটা দুরন্ত ভয়ের ছায়া গ্রাস করল তাকে। তার চারদিক ঘিরে জমাট-বাঁধা কালো অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই সে তার নসিবটাকে দেখতে পেল। পরিণতি ! সে বুঝতে পারল কিছুই গোপন নেই। তার ধরা পড়ার সংবাদ অনেকেই জেনেছে।

কিন্তু কেমন ক'রে তা সম্ভব হ'ল। সুলতানের কক্ষে সে, জমিলা

আর বেগমসাহেবা ছাড়া আর কেউ ছিল না। অন্য কারো সেখানে প্রবেশের এক্তিয়ারও নেই। তবে ?

তবে কি বেগমসাহেবা…

তাই বা কেমন ক'রে হয় ! কথাটা কেন প্রচার করবেন তিনি ?

ভাবতে পারল না সফি। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ ক'রে উঠল। অশক্ত শরীরে হঠাৎ যেমন রক্তের চাপ দেখা দেয়, তেমনি অবস্থা হ'ল তার। নজরবিবির সামনে একটা অসহায় ভয়-পাওয়া জন্তুর মতো বসে রইলো সে।

উঠে দাঁড়িয়ে ছিল নজরবিবি। একটু দূরে সরে গিয়েছিল। সেখানে বিপুলায়তন আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল। নানান ভঙ্গীতে। সেই লোভনীয় এক অনাবৃত যৌবনের ভঙ্গিমা দেখার মতো মানসিক অবস্থা তার ছিল না। তবু সে বুঝতে পারছিল দূরে সরে গিয়ে নিজেকে নিরীক্ষণ করার ছলে তাকেই দেখছে নজরবিবি। চেষ্টা করেছিল সে নিজেকে স্বাভাবিক ক'রে তুলতে, ধরা পড়ার ভয় ঢাকতে, পারছিল না।

হঠাৎ হেসে উঠল নজরবিবি। হাসির দুরন্ত বেগে ভেঙে পড়তে চাইছে যেন। রঙ্গিণী নারী আপন মনেই হেসে উঠেছে। সফি দেখতে পেল বুকের ওড়নাটা মুখে চাপা দিয়েছে। তবু হাসি কি বন্ধ হ'তে চায় !

উঠে দাঁড়াল সফি। তার অসহ্য বোধ হচ্ছিল। পালিয়ে যেতে চাইছিল সে। কিন্তু সারা শরীর তার কাঁপছে। মাতালের মতো পা দু'টো টলছে।

নজরবিবি দ্রুত কাছে এলো। হাত ধরতে চাইলো। একটু সরে যেতে চাইলো সফি।

: চললে ? জানতে চাইলো নজরবিবি।

সফি উত্তর দিল না।

: বেগমসাহেবার খিদমত করো। যেন বোঝাতে চাইলো।

: কেন ?

: সুলতান বড় জাদা পেয়ার করেন বেগমকে।

: ওঃ।

: তোমার জন্যে বেগমের অনেক অসুবিধা।

: আমার জন্যে ? আশ্চর্য হ'ল সে। কথাটা এই প্রথম শুনলো। বিশ্বাস করতে মন চাইলো না।

: হ্যাঁ, তোমার জন্যে! গম্ভীরভাবে বললে নজরবিবি: কি অসুবিধা বুঝতে পারনি ? আমি জানি। বেগম তোমাকে চায় না।

: কেন ?

: কেন ? হাসি ফুটলো নজরবিবির ওষ্ঠে। বাঁকা ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মতো। তার চোখের দিকে চেয়ে একটা কটাক্ষ হানলো। চুপি চুপি বললে: সুলতান অশক্ত। জাদা উমর তাঁর। জওয়ানী চায়···

: তোবা-তোবা! কথাটা শেষ করার আগেই আর্তনাদ ক'রে উঠল সফির কণ্ঠটা। আর দাঁড়াল না। শুনতে চাইলো না। বাইরে বেরিয়ে এলো। ছুটে পালিয়ে যেতে চাইলো বেইমানী আর বিশ্বাসঘাতকতার দুনিয়াটা থেকে। সুলতানি দুনিয়া। খোদার আজব সৃষ্টি। বড্ড বেশি নোংরা আর অপরিচ্ছন্ন। পঙ্কিলতার আবর্তে নিমজ্জিত। মানুষ আছে, মন নেই। দেহটাই সব। দেহের ক্ষুধায় সবাই পাগল।

সে নিজেও। মন নয়, তারও দেহের ক্ষুধা।

সেও পাগল। সুলতানি দুনিয়াটাতে সেও পাগল হয়ে গেছে।

: ওস্তাদ। ছয়ার মতো মিশে কাছে এলো বাহারাম।

দাঁড়াল সফি। তার মুখের দিকে চাইলো।

: আমি সব শুনেছি!

সফি অবাক হ'ল না। বললে, জানি।

: বিবিজী তোমার জান বাঁচাতে পারে ওস্তাদ। একটু পরে বললে বাহারাম।

: কী! সফি যেন বুঝতে পারল না কথাটা। তার মনের চিন্তার কথাটা বাহারাম জানলে কেমন ক'রে? এখানকার সবাই কি জাহু জানে? তা যদি না জানবে এমন হচ্ছে কেমন ক'রে?

: ওস্তাদ।

: বল?

: আমার মনে হয় সুলতান হু'চার রোজ বাদ ফিরে এলেই বেগম সব বলবেন তাঁকে।

: তাতে কী? সফি যেন নির্বিকার হ'তে চাইলো।

: তোমার জান যাওয়া বিচিত্র নয়।

: কেন? মূর্খের মতো প্রশ্ন করল সফি। বেশ জানে সুলতান ফিরলেই তাকে শাস্তি নিতে হবে। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি। বেই-মানীর শাস্তি। সব জেনে-শুনেও জানতে চাইলো কেন!

একটু চুপ ক'রে রইলো বাহারাম। পরে মৃত্নকণ্ঠে বললে: বেগম চান না তুমি সুলতানকে জিন্দা রাখ।

: আমি জিন্দা রাখি?

: সবাই তাই বলে। তোমার জন্যেই সুলতান জিন্দা রয়েছে। বুড্ডা সুলতানকে বেগমসাহেবার পছন্দ নয়।

: কে বললে?

: জানে সবাই। সেইজন্যেই ডর। তোমার জান যাতে যায় সেই ব্যবস্থাই করবেন বেগমসাহেবা। আর···। কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল বাহারাম।

: কী? জানতে চাইলো সফি।

: বিবিজী তোমাকে বাঁচাতে পারে।

: কেমন ক'রে? অসহায় চোখে তার দিকে চাইলো সফি।

: আমি জানি না।

: তাহলে ?

: বিবিজী সব পারে। বিলকুল।

বললে বাহারাম। আর দাঁড়ালো না। যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। অন্ধকারে হারিয়ে গেল একসময়।

সফির চিন্তাশক্তি নিঃশেষিত। কিছু ভাবতে পারল না। আর ভাবতেও চাইলো না। সেই অন্ধকারে একাকী ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলো শুধু।

মনে হ'ল শেষ হয়ে গেছে সে। সফি নামের তরুণটার ইন্তেকাল আসন্ন।

অথচ সে বাঁচতে চেয়েছিল। খোদার দুনিয়ায় বাঁচার লোভ বড় কম ছিল না তার মনে।

॥ এগারো ॥

: কৌন হো ?

আচমকা প্রশ্নটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল। গলাটা শুনে চিনতে কষ্ট হ'ল না প্রশ্নকারীকে। রুক্ষকণ্ঠে উত্তর দিল: তুমহারা জড়ুভাই !

: এই সামাল কে। কথাটা বলতে বলতে কাছে এগিয়ে এলো সিদিবদর।

: ক্যাহে তুমহারা ডর সে !

: জরুর।

: সালাম জাঁহাপনা। গোস্তাফি মাফ্ কর্ দেনা। আপ্‌কো ম্যায় পয়ছনা নেহি। ম্যায় মাফি মাংতা। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে সফির কণ্ঠটা ঝলসে উঠল হঠাৎ। সিদিবদরকে আঘাত দিতে পেরে মনে মনে খুশি হ'ল।

আর যা ভেবেছিল তাই। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নীচে নামল সিদিবদর। দাঁড়াল মুখোমুখি। চিৎকার ক'রে বললে: ফিন্ বোল।

: ক্যা জনাব ?

: শালে কুত্তে।

সিদিবদরের গালিটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কোমরে গোঁজা ছুরিটা খুলে বুকে ধরলো সফি। সাবধান হওয়ার অবকাশ দিল না।

সফির ব্যবহারে প্রথটায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল সিদিবদর। পরক্ষণেই রাগে ফেটে পড়ল। কিন্তু ছুরিটা সরিয়ে দেওয়ার সাহস হ'ল না।

সফি বললে : খতম কর্ দেগা ?

: ক্যা ? যেন ভয় পেল সিদিবদর। সফির মুখের দিকে চেয়ে তাকে অবিশ্বাস করতে পারছিল না। ছেলেটা ইচ্ছে করলে হয়তো পারে। কারণ আগে অনেকদিন অনেকবার অপমান করেছে। আজ সুযোগ পেয়ে সাবধান হ'তে দেয়নি।

সফি কঠিন কণ্ঠে বললে : ম্যায় তুমহারা কা কিয়া ?

: কুছ নেহি।

: তব হামেশা পিছে লাগতা কিঁউ ?

: কৌন ?

: শালে তুম্।

: এ্যাই।

: চুপ। চিৎকার ক'রে উঠল সফি। বললে : তুম্ কেয়া করতা ম্যায় সব কুছ জানতা। তুম্ শয়তান হো।

: আউর তুম্ ?

: ম্যায় !

: হাঁ, তুম্। ম্যায় ভি সব্ কুছ জানতা।

: কেয়া ?

: হারেম মে একঠো বাঁদী সে তুম্ মহব্বৎ কিয়া। উস্‌কো ধোঁকা দেকর ইজ্জৎ লুঠা। নজরবিবিকে ভি ··

: না-না। হাতটা কেঁপে উঠল সফির। ছুরিটা নেমে এলো।

সেই অবসরে একটু দূরে সরে দাঁড়াল সিদ্দিবদর। বললে: ক্যা, ম্যায় ঝুটা বোলা?

: বিলকুল।

: বেগম তুম্‌কো পাকড়ায়া নেহি?

: কৌন বোলা?

: বোলা নেই। হাসলো সিদ্দিবদর। বললে: হামারা সাথ আও।

: কাঁহা?

: আও।

এগিয়ে চললো সিদ্দিবদর। সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে। লালের আবীর মাখান হচ্ছে আকাশ-প্রকৃতিতে। পাখির দল শূন্য আকাশ পথে ফিরে যাচ্ছে তাদের কূলায়।

সামনে ভাগীরথী। গেরুয়া জলে কুলু-কুলু স্রোতের ধ্বনি। নৌকার সারি এগিয়ে চলছে বন্দরের পথে।

একটা নির্জন জায়গায় পৌঁছে সিদ্দিবদর বলল: বৈঠো।

বসলো সফি। বাধ্য হ'ল বসতে। তার সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। সে কিছু ভাবতে পারছিল না। বুঝতে পারছিল তাকে নিয়ে যে-ষড়যন্ত্রের জালটা বিস্তার হয়েছে ব'লে তার মনে হয়েছিল এখন দেখলে তা কতো সত্যি। শুধু শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীন নয়, সিদ্দিবদরও এর সঙ্গে জড়িত।

সিদ্দিবদর বললে: শাহ্‌জাদা তুম্‌কো ক্যা বোলা?

: কে? চমকে উঠল সফি।

হাসলো সিদ্দিবদর। দিন শেষের ম্লান আলোয় তার হাসিটা বড় কুৎসিত দেখালো। একটা শয়তান। বললে: সুলতানকে খতম করতে বলেছে?

সফি চুপ ক'রে রইলো।

: আমি সব জানি। নাসিরুদ্দীন সুলতান বনতে চায়। মসনদটায় বড় লালচ তার। লেকিন···

: কী?

: ওখানে আমি বসবো।

: তুম্?

: জরুর। মসনদটাকে ছিনিয়ে লেবে আমি। লেকিন···

সফি তেমনি চুপ ক'রে রইলো। শুনতে চাইলো সিদিবদরের কথা। কি বলে সে!

সিদিবদর বললে: তোমার সব কথাই আমি জানি। বিলকুল। ডর মৎ। আমি তোমাকে বাঁচাবো। শুধু···

: কী?

আমার কথা শুনবে। আমি না বলা পর্যন্ত সুলতানকে জিন্দা রাখবে। আগে খতম করতে হবে দুশমনটাকে।

: কে—সে?

: নাসিরুদ্দীন। মেরে পেয়ারে দোস্ত। আমি তার জানানা মহলের যোগানদার।

: কেন?

: মসনদটা আমার চাই। তুমিও থাকবে।

: কি ক'রে?

: আমি রাখবো। সুলতান জানবে না তোমার কথা।

: ঠিক?

: জবান দিলুম।

উঠে দাঁড়াল সিদিবদর। বললে: এখন যাও তুমি। দরকার হ'লে আমি জানাবো।

চলে গেল সিদিবদর। তার সাদা ঘোড়াটা ধুলোর ঝড় তুলে অদৃশ্য হ'ল। অথচ সফি ইচ্ছে করলে কিছুক্ষণ আগে শেষ ক'রে দিতে পারতো তাকে।

পারল না। হাত কাঁপলো। ভয়ে বুকটা শুকিয়ে উঠল। সফি অসহায়। অপরাধ না ক'রেও সে অপরাধী। সবাই তাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে বেইমানীর জবাব আদায় ক'রে। নজরবিবিও হয়তো সেই কথাই বলবে।

নজরবিবি তার জান বাঁচাতে পারে। বলেছে বাহারাম। কেমন ক'রে তা অবশ্য সে জানে না। বিনিময়ে কি চায় তাও শোনেনি।

হাসি পেল সফির। পাগলের মতো অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তে ইচ্ছে হ'ল তার। সে নিজেকে সুস্থ স্বাভাবিক ব'লে ভাবতে ভুলে গেল।

ঠিক করলে, এবার আর ভাববে না। নসিবে যা লেখা আছে তাই ঘটবে। যাবে নজরবিবির কাছে। তবে সিদিবদরের শয়তানিতে কিছুতেই হাত মেলাবে না।

যদি সুযোগ পায়, নিশ্চয়ই খতম ক'রে দেবে শয়তানটাকে।

সফির ইচ্ছে পূর্ণ হয়নি। সিদিবদরকে খতম করতে পারেনি সে। একদিন সিদিবদর হারিয়ে গেল কোথায় যেন। অনেক খুঁজেও কেউ পেল না তাকে।

এলো একদিন। ৮৯৬ হিজরার একটা দিন। সিদিবদর নয়, সুলতান শামসুদ্দীন মুজাফ্‌ফর শাহ্‌। বসলো গৌড়ের মসনদে। সুলতানির স্বপ্ন সার্থক হ'ল না সিদিবদরের। শেষ হ'ল গৌড়-মসনদে হাবশী সুলতানদের একটা অধ্যায়।

শুরু সৈফুদ্দীন ফিরোজশাহ্‌কে নিয়ে। শেষ শামসুদ্দীন মুজাফ্‌ফর শাহে্‌।

একজন দীন-দরিদ্রদের প্রতি দয়াশীল, অন্যজন অত্যাচারী।

সফি হয়তো ছিল না। কিন্তু সফিরা ছিল। বাধ্য হয়েছিল…

॥ বারো ॥

: ভয় কী সফি, আমি তো আছি!

নজরবিবির কণ্ঠটা গাঢ় শোনালো। কথাগুলো অসংলগ্ন। সফির মনে হ'ল নজরবিবি নেশা করেছে। শরাব খেয়েছে। আর তার ধারণাটা যে মিথ্যে নয়, একটু পরেই বুঝতে পারল তা।

নজরবিবি কাছে এলো। এতো কাছে আসা এই প্রথম। তার বুকের কাছে ঘনিয়ে এলো একেবারে। ফিসফিস ক'রে বললে: তোমার জন্যে আমি সব পারি।

সফির ইচ্ছে হ'ল একবার জিজ্ঞাসা করে: কেন? কেন তার জন্যে সব পারে নজরবিবি? জান বাঁচাবার এ-ব্যগ্রতার কারণ কী? কোন্ স্বার্থে?

না, জিজ্ঞাসা করল না সফি। নজরবিবি স্পষ্ট ক'রে কারণ না বললেও উত্তর পেয়ে গেছে। বলেছে বাহারাম। খোজা বাহারাম সবকিছুই স্পষ্ট করে দিয়েছে।

নজরবিবি তাকে পেয়ার করে। আজ নয়,অ দন আগে—কিনে শাহ্‌জাদার জান বাঁচাবার পর থেকেই। সুযোগ এসেছে আজ। তাই প্রকাশ পেল। না হ'লে দিলের পেয়ার দিলের মধ্যেই চাপা থাকতো। কেউ জানতে পারতো না কোনোদিন।

সফি শুনে অবাক হয়নি। ভয় পেয়েছে। বুক কেঁপেছে তার। ভেবেছে নজরবিবির পেয়ারের জালে নিজেকে জড়াবে না। কিন্তু না এসেও পারেনি। বাহারাম ছাড়েনি তাকে। নিয়ে এসেছে একরকম জোর ক'রেই!

তাছাড়া, সিদ্দিদরের আতংক। শয়তানটা তাকেও ভয় দেখিয়েছে। দেখা হ'লেই সাবধান করে। হুঁশিয়ার থাকতে বলে। সফিকে সে তার গোলাম বানাতে চায়। তার হুকুমের বান্দা। সে যা

বলবে তাই শুনতে হবে, করতে হবে। মসনদের পথ পরিষ্কার ক'রে দিতে হবে।

নাসিরুদ্দীন আর সিদিবদর। একজন কামফতে করতে চায় ইনামের প্রলোভনে অন্যজন ভয় দেখিয়ে। একজন আমির বানাবে অন্যজন জান বাঁচাবে।

সব ঝুটা, সব মিথ্যে। তবু মিথ্যের ভয়েই ভীত সফি। হারেমের পথ ভুলে গেছে। মনটা ছুটে যেতে চাইলেও পারে না! জমিলা নামের মেয়েটা ক্রমশঃ যেন দূরে সরে যাচ্ছে। জমিলার মুখটা হারিয়ে যাচ্ছে যেন দিন দিন।

নজরবিবি। নজরবিবির কাছে ছুটে আসে। আসে গোপনে। অপেক্ষা করে বাহারাম। গোপন পথে নিয়ে আসে সঙ্গে ক'রে। পৌঁছে দেয় নজরবিবির কক্ষে।

গল্প করে নজরবিবি। সফির কথা জানতে চায়। সফি বলে। কোনো কথাই গোপন করে না। মিথ্যে বলতে সে শেখেনি। তাই জমিলার কথাও বলে। আর দেখতে পায় জমিলার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নজরবিবির হাসি-মুখটা মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে ওঠে।

হিংসা! সফি তাই শুনেছে। নারীজাতি পরস্পর পরস্পরকে নাকি হিংসা করে। মধুর সম্পর্কের কথাও বিস্মৃত হয়।

বিশ্বাস করে না সফি। তার মনটা মেনে নিতে পারে না। মনে হয় এ সত্যি নয়, মিথ্যে—ভুল। এমন হওয়া সম্ভব নয়।

আর সেইজন্যেই ভাবে আর আসবে না। নজরবিবির কাছ থেকে দূরে থাকবে। নসিবে যা আছে তাই ঘটবে তার। নজরবিবির সাধ্য কি তাকে রক্ষা করে?

হয়তো পারে। কিন্তু বুঝবে কেমন ক'রে। সফি যে আর পারছে না। ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হয়ে উঠছে তার। হয়তো পাগল হয়ে যাবে।

সুলতান যে কবে ফিরবেন তার ঠিক নেই। খবর পাঠিয়েছেন ফিরতে আরও ক'দিন দেরি হবে।

শাহ্জাদাও নেই। নজরবিবি এখন একা। ডাক আসে সফির। বাহারাম এসে চুপি চুপি ডেকে নিয়ে যায়।

সকলের চোখকেই ফাঁকি দিয়েছে সফি। নজরবিবির কাছে যাতায়াতের খবর কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু ধরা পড়ে গেছে বাবুর্চি বুড়োর চোখে। শয়তান বুড়ো ঠিক ধরে ফেলেছে। চেপে ধরেছে একদিন।

সফি বেরুচ্ছিল। পথ আটকেছে বাবুর্চি বুড়ো। ডেকেছে : এই ইবলিকের বাচ্চা, শোন্।

কাছে গেছে সফি।

বুড়ো বলেছে : কোথায় চল্‌লি ? হর রোজ এসময় যাস্ কোথায় ?

: কোথা যাই ? পাল্টা প্রশ্ন করেছে সফি। গলাটা কেঁপে উঠেছে।

খেঁকিয়ে উঠেছে বুড়ো। তিক্তকণ্ঠে বলেছে : কোথা যাস্ তাই তো জানতে চাইছি।

সফিও রুখে উঠেছে। বলেছে : কোথা যাই, না-যাই সে খোঁজে কাজ কি তোর ?

: হারেমে তুই যাস্ না ?

: যাই না।

: তবে যাস্ কোথায় ?

: জাহান্নামে। যেন চিৎকার ক'রে উঠতে চেয়েছে সফি।

ঘাবড়ে গেছে বুড়ো। ভালো মন নিয়েই কথাটা জানতে চেয়েছিল। কারণ ক'টাদিন ছেলেটার আচার-আচরণ সুবিধে ঠেকছে না। কেমন যেন মনে হচ্ছে তার। কিন্তু সফির মেজাজটা তাকে ব্যথিত করেছিল। মুখটা অনেকক্ষণ অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখে বলেছিল : আমি তোর আচ্ছা চাই সফি।

সফি কথা বলেনি। ক্ষণপূর্বের ব্যবহারটায় দুঃখ জেগেছিল মনে

: তুই বড় ভালো। খুব আস্তে কথাটা বলেছিল বাবুর্চি বুড়ো।

সফি তবু চুপ ক'রে ছিল।

বুড়ো বলেছিল : আমি আদমী চিনি সফি। লেকিন……

সফি তখন অন্য কথা ভেবেছিল। বাবুর্চি বুড়োর কথাগুলো ভালো লাগলেও লোকটার মুখ দেখলে তার ঘৃণা হয়। ওকে সে ঘৃণা করে। ওর অতীতটা বড় নোংরা।

: একটু সমঝে চল্ সফি!

কথাটা কানে এসেছিল। ঘুরেছিল সফি। কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। কোনো শক্ত কথা। বলা হয়নি। কথাটা বলেই চলে গেছে বাবুর্চি বুড়ো।

হয়তো সব জেনেছে। কিছুই হয়তো গোপন নেই। নজরবিবির কাছে যাতায়াতটাও। কিন্তু ভয় পায়নি। সর্বদা ভয়ে-ভয়ে থাকা মনটা হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠেছিল। একটা বে-পরোয়া ভাব এনেছিল মনে। কুছ পরোয়া নেই। যার যা ইচ্ছে সে তাই ভাবুক। কোনো বাধা মানবে না সে।

একটা কৌতূহল। নজরবিবি তার জান বাঁচাবে বলেছে। জান বাঁচাবে বলেছে সিদ্দিবদর। অবশ্য সিদ্দিবদর কেন তাকে বাঁচাবে বলেছে সে কথা। বলেনি নজরবিবি। মনের কথা গোপন রেখেছে। বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছে তাকে।

কে বন্ধু! এ-ছুনিয়াটায় কেউ কারো বন্ধু নয়। দোস্তি এমনি হয় না। নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকে। স্বার্থ! বিনাস্বার্থে কেউ কিছু করে না এ-ছুনিয়ায়।

কিন্তু নজরবিবির স্বার্থের স্বরূপটা ধরতে পারেনি সফি। কি চায়, কি কামনা করে। মনে হয়েছে অনেক কথাই। শাহ্জাদা ইনামের লোভ দেখিয়ে ব্যর্থ হয়ে নজরবিবিকে এগিয়ে দিয়েছে। তা নয় বুঝলো সে। নাসিরুদ্দীনের প্রতি নজরবিবির স্পষ্ট মনোভাবটাও সে বুঝে নিয়েছে। নজরবিবি শাহ্জাদাকে ঘৃণা করে। তবে আরবী ঘোড়ার চোট খেয়ে শাহ্জাদার সেই আহত হওয়া আর নজরবিবির বুক দিয়ে আগলানো শুধুমাত্র স্বার্থের জন্যে।

স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা সব মিথ্যে। দুনিয়ায় একমাত্র সত্যি হচ্ছে স্বার্থ। মানুষের স্বার্থপরতা। মানুষ নিজের স্বার্থ ভিন্ন কিছুই করে না বা বোঝে না। ধমনীর প্রতিটি রক্ত-কণিকায় স্বার্থের বীজ।

তাই কি?

চমকে উঠল সফি। স্বার্থই কি সব, একমাত্র সত্যি!

না-না। স্বার্থই সব নয়। হ'তে পারে না। তা যদি হোত ইনামের প্রলোভন কেমন ক'রে জয় করল সে? কেন সে রাজা হ'তে পারল না নাসিরুদ্দীনের প্রস্তাবে। কাজটা তো অতি তুচ্ছ ছিল তার কাছে। অতীতে এই তুচ্ছ কাজটা তো হামেশাই ঘটেছে। পাইকের দলের মধ্যে গণ্ডগোল বাধলে হাসতে হাসতে মর্দা বানিয়েছে একটা মানুষকে। যাঁর পরিচয় মানুষের কাছে সুলতান। বিপুল ক্ষমতার অধিকারী একজন। যিনি ইচ্ছে করলে সব পারেন। কিন্তু সুলতানের সুলতান পাইক জানে তা কতো মিথ্যে, কতো ভুল। দিনের আলোয় সুলতান পাইকের গোলাম। পাইকের ইচ্ছেই সুলতানের সবকিছু। একমাত্র অধিকারী।

ভাবতে পারল না সফি। মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে উঠল তার। সবকিছু কেমন যেন অসংলগ্ন, এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একটা নিঃশব্দ তন্দ্রার ঢেউ নেমে আসতে চাইছে।

বুঝতে পারল সফি। শয়তানি করেছে নজরবিবি। নিশ্চয়ই শরবতের সঙ্গে শরাব মিশিয়ে দিয়েছে আজ। আর সেইজন্যেই যেন ক'দিনের সেই সদা শংকিত মনের দুরু-দুরু কাঁপনটা এখন নেই। মনে হচ্ছে এখানে এসে ভুল করেছে সে। অন্যায় হয়েছে তার।

সফি!

নজরবিবির গলাটা শুনতে পেল সফি। চোখ মেলে চাইলো তার দিকে।

: একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

: কি ?

: রাগ করবে না বল।

: উহু। সত্যি কথাই বলল সফি।

: তুমি বাঁদীটাকে পেয়ার করো ? নজরবিবির প্রশ্নটা বন্ধুর মতো শোনাল।

: করি। এতোটুকু দ্বিধা না ক'রে স্পষ্ট উত্তর দিল সফি।

: সে কী খুবসুরত ?

: কেন ?

: জানতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

এবার সন্দেহ জাগলো সফির মনে। যদিও তার চেতনাটা আচ্ছন্ন, তবু মনে হ'ল নজরবিবির সুরটা ভিন্ন। বন্ধুত্বের সেই ভাবটা যেন অন্তর্হিত হয়েছে। একটু জ্বালার প্রকাশ।

দেখতে চাইলো সফি। নজরবিবির মুখের দিকে চাইলো। দেখল অনেকক্ষণ ধরে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

: কী দেখছো ? সফির দৃষ্টিতে নজরবিবির কণ্ঠে লজ্জার ছোঁয়া।

সফি তার মুখটা ঘুরিয়ে নিল। কক্ষের একপাশে রক্ষিত আয়নাটায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। সাবধান হ'ল।

নজরবিবি বললে : কী হ'ল ?

: কী ?

: বলবে না ?

ভাবল সফি। কি বলবে! মনে হ'ল উঠে চলে যায়। পালিয়ে বাঁচে। পারল না। বললে : সে সুন্দরী নয়।

: তবে ?

কি বলতে চায় নজরবিবি ? কি জানতে চায় ? দেখতে পেল দুই আগ্রহী চোখের দৃষ্টি তারই মুখের 'পরে ন্যস্ত। নজরবিবি দেখছে তাকে।

ঃ সে আপনার মতো খুবসুরত নয়! সফির 'নয়' কথাটা যেন অন্য কেউ বললো। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে। মনে হ'ল কথাটা বলা উচিত হয়নি তার।

সফি যা আশংকা করেছিল তা হ'ল না। কথাটা শুনে রাগ করল না নজরবিবি। বরং একটু হাসি ফুটলো যেন তার ওষ্ঠে। ম্লান হাসির একটি ক্ষীণরেখা ফুটেই মিলিয়ে গেল। জানতে চাইলো ঃ আমি কি সুন্দরী?

ঃ হ্যাঁ। মাথা নাড়ল সফি।

ঃ লেকিন...

ঃ কী?

শাহ্‌জাদা কিন্তু অন্য কথা বলে। বলে ঃ আমার নাকি রূপের চেয়ে...। চুপ ক'রে গেল নজরবিবি। কথাটা শেষ না ক'রে মুখটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।

শাহ্‌জাদা কি বলে সে কথাটা জানার জন্যে একটা দুরন্ত ইচ্ছে জাগছিল সফির মনের মধ্যে। দুর্বার কৌতূহল। পারল না। সাবধানী মনটা বিরত করল। মুখটা নীচু ক'রে নজরবিবির দৃষ্টি থেকে বাঁচতে চাইলো যেন।

বুঝতে পারল জড়িয়ে পড়ছে সে। নজরবিবি তার মনের দ্বার খুলে দিচ্ছে। তাকে নিজের অধিকারে আনার অপচেষ্টা, বন্ধন। স্বার্থপর নজরবিবির! যা ভেবেছে তা সত্যি নয়। নজরবিবি মিথ্যে বলেছে। তাকে ভুলিয়েছে। শাহ্‌জাদাই এগিয়ে দিয়েছে। হুকুম পালন করেছে নজরবিবি। কারণ সে নাহলে তাদের কোনো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না। সফি তাদের একমাত্র হাতিয়ার। মসনদটা সফির।

সবকিছুই স্পষ্ট পরিষ্কার হয়ে গেল এক মুহূর্তে। দেখতে পেল নিজের ভবিষ্যৎটা। ছলনাময়ী নারী সব পারে। নজরবিবি কসবী ছিল। নজরজান! কাটরার ছোট্ট ঘরখানায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনালে বসতো ফুর্তির মজলিশ। পুরুষের দ্বার ছিল মুক্ত।

নামছিল নজরজানের। শেষ ছিল না প্রতিযোগিতা। নিজের এক্তিয়ারে রাখার জন্যে খুনোখুনি হয়ে গেছে কতোবার। ছলনাময়ী নারী ধরা দেয়নি। পূরণ হয়নি কারো আশা। ফকির হয়েছে কতোজন।

কথাটা নাসিরুদ্দীনের কানে এসেও পৌঁছেছিল। দোস্তের দল নজরজানের নাম বলতে অজ্ঞান হয়েছে। জানানা নয়, হুরী! মানুষের সাধ্য কি ধরে রাখা!

বটে! দেখতে গেছে নাসিরুদ্দীন। জোর ক'রে ছিনিয়ে এনে তুলেছে হারেমে। বাজারের কসবী পেয়েছে বিবির সম্মান।

ঃ সফি! এক সময় আস্তে ডাকল নজরবিবি।

কান্নার সুর যেন নজরবিবির গলায়। ছলনা! তবু চোখ তুললো সফি। দেখলো। নজরবিবি সুন্দর। চোখ দু'টিতে একটু ছায়া। আরক্ত হ'লেও একটু ম্লান যেন।

ঃ আমার বদ নসিব!

তার কণ্ঠে বেদনার সুর। সফি দ্বিধাগ্রস্ত।

ঃ সফি, আমি একা। কেউ নেই আমার। কেউ ছিল না। দোস্ত,—তুমি আমার বন্ধু হবে? সে কণ্ঠে দুরন্ত আহ্বান।

বিব্রত সফি। নতুন পরিচয়। নজরবিবির কেউ নেই, কেউ ছিল না। কথাটা অবিশ্বাস্য—সব পেয়েও রিক্ত, নিঃস্ব। বিশ্বাস করতে মন চায় না। নেশাটা কি গ্রাস করছে তাকে? সে কি সরাবী হয়ে উঠলো?

ঃ সফি, তোমাকে আমি ছাড়বো না। তুমি আমার বন্ধু, দোস্ত। মিনতিতে ভেঙে পড়ল নজরবিবি ঃ আমি সাচ বলছি জমিলার পেয়ার আমি কাড়বো না। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। আমি কসম খাচ্ছি।

সফির কাঁধটা খাচমে ধরলো সে। শরীরের সমস্ত শক্তিতে। ইচ্ছে হ'ল সেও হাতটা ধরে। পারল না। সংকোচ জাগলো। খেয়ালী ইচ্ছেটাকে নিঃশব্দে শাসন করল।

: সফি! ডাকল নজরবিবি।

: উঁ!

: দোস্ত!

: এঁ্যা!

: আমি তোমাকে···

দ্বারের কাছে উঁকি দিল একখানা মুখ। সে মুখ খোজা বাহারামের। শাহ্‌জাদা নাসিরুদ্দীনের পেয়ারের বান্দা। নাসিরুদ্দীন নেই, সে আছে। সতর্ক-জাগ্রত। তাকে রেখে গেছে শাহ্‌জাদা। হয়তো নজরবিবিকে পাহারা দেবার জন্যে!

সফির কাঁধটা তখনও নজরবিবির হাতে ধরা। সে অস্বস্তি বোধ করল। হাতখানা নাবিয়ে দিতেও পারল না।

: ক্যা মাংতা? তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলো নজরবিবি।

: উন্‌কো বোলাতা। বললে বাহারাম।

: সফিকো?

: জী, হাঁ।

: কৌন?

: বেগমসাহেবা।

: বেগমসাহেবা? নজরবিবির গলাটা একটু কেঁপে উঠল যেন।

: জী, হাঁ। শান্তকণ্ঠেই জবাব দিল বাহারাম।

: এত্তেলা লায়া কৌন? উত্তেজিত হ'ল নজরবিবি।

: বাহার ঠারা হ্যায়।

: বাঁদী?

: জী।

: উনকো বোলাও।

চলে যাচ্ছিল বাহারাম। বাধা দিল। সফিকে বললে: তুম্ যাও সফি। বেগমসাহেবা তুম্‌কো বোলায়া। লেকিন···

চুপ ক'রে গেল নজরবিবি। তার কণ্ঠে শংকার ছায়া।

ঃ কী ? জানতে চাইলো সফি।

ঃ কিছু নয়। তুমি যাও।

সফি নজরবিবির মুখের দিকে চাইলো। কেঁপে উঠল। দু'চোখের দৃষ্টিতে অজস্র আহ্বান!

মুহূর্তে নিজেকে দুর্বল মনে হ'ল তার। সমস্ত শরীরে অসহ্য কাঁপনী। ভাবল, পালিয়ে যায়। পারল না।

বেগমসাহেবার আহ্বান উপেক্ষা করার সাহস হ'ল না তার।

॥ তের ॥

বোরখাধারিণী বাইরে অপেক্ষা করছিল। সফি পৌঁছাতেই তাকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত জানিয়ে এগিয়ে চললো সে।

দু'টো মহালের ব্যবধান সামান্যই। একটু নির্জন পথ। আলো-আঁধারীতে ছায়া-ছায়া। প্রাসাদের প্রাচীরের গাত্রে রক্ষিত মশাল-গুলো এর মধ্যেই নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে-যার নিত্যদিনের কাজটুকুই শুধু সমাধা করে চলেছে। সুলতান নেই, যে-যার ইচ্ছেমতো কাজ ক'রে যাচ্ছে। তিনি থাকলে এমন হয় না। ভোরের আগে মশালগুলো নেভে না। কাজে অবহেলা করে শাস্তির ভয়ে শশংকিত থাকতো সবাই।

সবকিছুই লক্ষ্য করল সফি। এমনি হয়। মালিকের অনুপস্থিতে কর্মচারীদের অবহেলা এমনিভাবেই দেখা দেয়। কারণ বলার কেউ থাকে না।

নিজের কথাও ভাবল। সে নিজেও এর ব্যতিক্রম নয়। সুলতানের অনুপস্থিতির সুযোগে সে-ও অন্যায় কম করছে না। শাহজাদার প্রাসাদে থাকলেও নজরবিবির মতো একটা নষ্ট মেয়েমানুষের কাছে গেছে। দোস্তি করেছে। হয়তো আরও কিছু প্রত্যাশা…

চমকে উঠল সে। ক'দিনে মনটা দুর্বল হয়েছে সত্যি কথা। দুর্ভাবনায় মনটা চঞ্চল। তবু তারই মধ্যে নজরবিবির প্রতি মোহ সঞ্চার হয়নি এ তো মিথ্যে নয়! কেমন ক'রে অস্বীকার করবে নজরবিবির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেনি, দুর্বলতা জাগেনি।

না, অস্বীকার করতে পারে না সফি। নজরবিবির প্রতি তার মনটা আকর্ষিত হয়েছে। নজরবিবির সুন্দর মুখটা, হাসি, কথা তাকে ভুলিয়েছে। দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে।

মুক্তি চেয়েছে সে। মুক্তি ছিল তার কাম্য। সুলতান যদি উপস্থিত হয়ে তার বিচার করতেন, শাস্তি দিতেন তাহলে হয়তো এমন হোত না। চিন্তার হাত থেকে, দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পেতো সে। বাঁচতো। কিন্তু তা হয়নি। সুলতান দূরে। বেগমসাহেবার চোখে প্রতিশোধের আগুন। ভয় দেখিয়েছে সিদিবদর। নজরবিবি দিয়েছে ভরসা। সফি তাই দিশাহারা।

তারই মাঝে নজরবিবি হয়তো আরও কিছু চেয়েছিল। কিছু প্রত্যাশা। কিন্তু পারেনি সে। খোজা বাহারাম বলেছে: নজরবিবি তাকে পেয়ার করে।

নজরবিবি বলেছে: সফির দোস্তি চায় সে। জীবনটা তার নিঃস্ব—রিক্ত। সফির জন্যে সব পারে।

কিন্তু কেন? কোন্ উদ্দেশ্যে?

ভেবেছে সফি। শাহ্‌জাদার কথা মনে পড়েছে। প্রলোভনের হাতছানি। একটা তুচ্ছ কাজের বিনিময়ে আমির হয়ে যাওয়া।

তাই নজরবিবির প্রথম দিনের আহ্বানে সন্দেহ জেগেছিল মনে। নিশ্চয়ই ওই মেয়েমানুষটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে গেছে নাসিরুদ্দীন। নিজে ব্যর্থ হয়ে ওকে লেলিয়ে দিয়ে গেছে।

হয়তো এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে থাকতো মনে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার মনে অন্য ধারণা জন্মেছিল। বেগমের কাছে ধরা পড়ে যেতে

বাধ্য হ'ল নজরবিবির কাছে। হয়তো সমস্ত আশংকাটাই তার ভুল, মিথ্যে। নজরবিবি সত্যিই তার দোস্তি চায়।

নজরবিবিকে দেখে, তার সঙ্গে কথা ব'লে, সফির কেমন যেন মনে হয়েছে—নজরবিবির বুকভরা জমাট বেদনা। যে বেদনা তাকে অহর্নিশ দগ্ধ করেছে, হৃদয়ের রঙ-রূপ প্রাণচ্ছলতাকে নিঃশেষ ক'রে দিচ্ছে। তাই ক্রমশঃ স্বার্থপর হয়ে উঠেছে নজরবিবি। নিজের কথা ভাবছে। শুধু নিজেকে নিয়েই বেঁচে আছে।

কিন্তু এমনভাবে বাঁচতে চায়নি সে। প্রাণের ধর্মে আলো চেয়েছিল, নির্মল বাতাস, মালিন্যহীন জীবন। যে-জীবনে স্বপ্ন আছে, সুখ আছে, আছে বেঁচে থাকার আনন্দ। একটি ছোট্ট ঘর। আপন মানুষ। একান্ত আপনার ক'রে সবকিছু।

পেল না। হারিয়ে গেল। মিথ্যে হ'ল স্বপ্ন। মরীচিকার রূপ নিল জীবন। শুধু তৃষ্ণা, আকণ্ঠ। যে-তৃষ্ণার হাহাকারে বুক ভাসিয়েছে অশ্রুর বন্যায়।

নজরবিবি বলেছে সব। জীবনের সেই কলঙ্ক কাহিনী। যা এতোদিন বুকের মাঝে জমাট ছিল। পথ পায়নি মুক্ত হওয়ার। শুনতে চায়নি কেউ। কাছে আসেনি।

না, কাছে এসেছে বৈকি। অনেক খানদানী রাহিন আদমী। অনেক সাধারণ মানুষ। কিন্তু মানুষের মুখোশ খুলে গেছে তাদের। তারা দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে মিথ্যের আবরণ। লোভ আর লালসার প্রকাশ ঘটেছে। জীবন্ত দেহ, নারীমাংসের লোভে ক্ষুধার্ত পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিঃশেষ করতে চেয়েছে।

শুধু অত্যাচার আর যন্ত্রণা। দেহটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে দিনের পর দিন। বছরের পর বছর। প্রতিটি দিন—প্রতিটি রাত্রি।

অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মুক্তি চেয়েছে। এসেছে মুক্তি। অনেকের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে নজরজান। এসেছে শাহ্‌জাদার কাছে। কিন্তু

একদিন নজরবিবি বলেছে : সফি, তুমি হয়তো ভাবছো আমি খুব সুখে আছি। আমার কোনোও ছুঃখ নেই। শাহ্‌জাদার পেয়ার, অতুল ঐশ্বর্য, আর কি চাই? এ তো সব মেয়েরই কাম্য। লেকিন, তোমাকে সাচ বলছি। এ যে কতো মিথ্যে—কতো ভুল তা একমাত্র আমিই জানি। শাহ্‌জাদা যেদিন এ-জীবনটার লোভ দেখিয়েছিল আমি ভুলেছিলুম, মুক্তির আলো দেখেছিলুম, জীবনের চরম প্রাপ্তি মনে করেছিলুম। আজ আমার সে ভুল ভেঙেছে। মিথ্যেয় ভরে গেছে জিন্দিগিটা। আমি খতম হয়ে গেছি। আর সেইজন্তেই শরাব খাই। দিন-রাত্রি নিজেকে বেহুঁশ রাখতে চাই। নাহলে আমি পাগল হয়ে যাব।

: কেন? জানতে চেয়েছে সফি।

: কেন? একটু হাসি ফুটেছে নজরবিবির মুখে। ম্লান-বিষণ্ণ। বলেছে : আজ আমার মোহ কেটেছে। আমার আগের জিন্দিগিটাতে আমি আচ্ছা ছিলুম। ভয়-যন্ত্রণা-ছুঃখ সব ছিল, লেকিন বন্দিত্বের বেদনা ছিল না। আর সেইজন্তে···

: কী?

: সফি আমার, আমাদের প্রত্যেকের জীবন ভুলে ভরা। অজস্র ভুল। যে-ভুল আমরা কেউ সংশোধন করতে পারি, কেউ পারি না। আমরা ভাবি, এই যে আমি—এই আমি এমন হলাম কেন? আমি কি চেষ্টা করলে আমার এই অবস্থা, জীবনটার পরিবর্তন ঘটাতে পারি না? পারি। আমি পেরেছি। কিন্তু ভুল করেছি। আমার নসিবের লিখনকে জোর ক'রে পরিবর্তন করেছি। লোভের ফাঁদে পা দিয়ে নিজের সর্বনাশ করেছি। এই বিবিগিরি আজ আর আমি চাই না। আমি সহ্য করতে পারছি না। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আজ আমি মৃত্যু কামনা করছি। দিন-রাত্রি খোদাকে ডাকছি। আমার অন্যায়ের, ভুলের ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাকে তিনি দোয়া করুন, মৃত্যু দিন, মুক্তি দিন।

সফি শুনেছে। নজরবিবিকে দেখেছে। চোখের অশ্রু বাঁধনহারা বন্যা। তবু বিশ্বাস করতে পারেনি। কেমন যেন অবিশ্বাস জেগেছিল। মনে হয়েছিল সত্যি নয়। অনেক মিথ্যে আর প্রতারণায় ভরা। কিন্তু এখন মনে হ'ল, বোরখাধারিণীর সঙ্গে পথ চলতে চলতে ভাবল, না, মিথ্যে নয়। সত্যি কথাই বলেছে নজরবিবি। সত্যিই মুক্তি চায়।

: কী ভাবছো?

: কে? কণ্ঠস্বরে ভীষণভাবে চমকে উঠল সফি। কণ্ঠস্বর পরিচিত তার।

: আমি। বললে বোরখাধারিণী। স্থির কণ্ঠ, অচঞ্চল। একটু যেন বিদ্রূপের ছোঁয়া। তবু নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলো। নাম ধরে ডাকার আগে জানতে চাইলো সত্যিই সে কি-না। বললে: তুমি কে?

: চিনতে পারলে না?

পরিচিত কণ্ঠস্বর। স্পষ্ট। সফি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

: আমি জমিলা। বললে বোরখাধারিণী।

: জমিলা!

: হ্যাঁ, আমি।

সেই মুহূর্তে সফির মনটা অস্বাভাবিক তিক্ততায় ভরে উঠল। মনে পড়ল ক'দিন আগের সন্ধ্যাটাকে। কঠিন হ'ল মনটা। বললে: আমাকে ডাকতে এসেছো তুমি?

: হ্যাঁ।

: কেন?

: বেগমসাহেবা তোমাকে ডাকছেন।

: কেন?

: জানি না।

: আমি যাব না।

: কেন?

: বেগমসাহেবার হুকুম আমার জন্যে নয়।

: বটে!

: হ্যাঁ, তাই। বেগমসাহেবার গোলামি আমি করি না। মুখের বোরখাটা সরিয়ে দিল জমিলা। সফির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো। বললে: আগে তো বেগমসাহেবার কথা শুনতে।

: শুনতাম। লেকিন, আর শুনবো না।

: শুনবে না? ঝলসে উঠল জমিলা। বললে: বেগমসাহেবার হুকুম তোমাকে শুনতেই হবে, নাহলে···

নাহলে? তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলো সফি। বললে: তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ?

: তুমি যা মনে করো।

কি যেন হয়ে গেল। এরই নাম হয়তো অঘটন। যা ভাবা যায় শেষ পর্যন্ত তা হয় না। বাধা আসে। তা সে যতোই সামান্য হোক না কেন। সফি তো বেগমসাহেবার সঙ্গে দেখা করবে ব'লেই এসেছিল। যাচ্ছিল। হয়তো যেতও। কিন্তু মুশকিল হ'ল জমিলা কথা ব'লে। যে মুহূর্তে জমিলা কথা বলল সেই মুহূর্তেই কেমন যেন পরিবর্তন ঘটল মনটার। একটা তিক্ত স্মৃতি বিষিয়ে দিল মনটাকে। ক'দিনের দিন-রাত্রির দুর্ভাবনার ছবিটা ফুটে উঠল।

এখন জমিলার কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ওর একখানা হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরলো। ইচ্ছে হয়েছিল ওর গলাটা চেপে ধরে। কথা বলতে না দেয়। বললে: ভয় দেখিও না আমার।

: আমি তো তোমায় ভয় দেখাচ্ছি না। শান্ত কণ্ঠেই বললে জমিলা।

: আলবাৎ দেখাচ্ছ। ভয় দেখাবার জন্যেই তোমার বেগমসাহেবা তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। একটু চুপ করল সফি। জমিলার মুখের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখলো। বললে: তোমার বেগম-

সাহেবাকে ভয় পাওয়ার বান্দা আমি নই। কারণ, তোমার বেগম-সাহেবার সব কেচ্ছা আমার জানা।

সফি হাতটা ধরে থাকায় কষ্ট হচ্ছিল জমিলার। তবু বিকৃত অথচ শান্তকণ্ঠে বললে, নজরজান বলেছে তো ?

: হ্যাঁ, বলেছে। হাতটা ছেড়ে দিল সফি।

তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ঝলসে উঠল জমিলা : আর কিছু বলেনি ?

: কী ?

: আমার কথা।

: তোমার কথা ? এবার একটু দ্বিধাগ্রস্ত হ'ল সফি।

: হ্যাঁ, আমার কথা। বলল জমিলা। একটা কসবীর মেয়ে। আর ···। হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে উঠল।

যেন সংবিত ফিরে পেল সফি। অবাক কণ্ঠে বললে : তোমার কথা তো তুমি বলেছ ?

: মিথ্যেও তো বলতে পারি। বিদ্রূপ ক'রে উঠল তার কণ্ঠ।

: বিশ্বাস হয় না।

: কেন ?

: তুমি মিথ্যা বলনি।

: এতো বিশ্বাস ?

: হ্যাঁ।

: নজরজানের কাছে বেগমসাহেবার নামে যা শুনেছ তা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেছ ?

: করেছি।

: চমৎকার।

: কী ?

: সত্যিই মরদের বাচ্চা তুমি !

: জমিলা ! ভীষণকণ্ঠে গর্জে উঠল সফি।

: আঁখ দেখিয়ো না। যাও। কথাটা ব'লে আর দাঁড়াল না

জমিলা। আর কিছু শুনতেও চাইলো। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল খানিকটা। কিন্তু ফিরে এলো। সেই তেজ, সেই তীক্ষ্ণতা। বললে : নজরজানের কাছে ফিরে যাবার আগে একটা কথা শুনে যাও, তোমার নজরজান কোনোদিনই উঠতে পারবে না। বেগমসাহেবার জিন্দিগিটাকে যে একদিন বরবাদ করতে গিয়েছিল খোদা কোনোদিনই তার ভালো করবেন না।

এবার চলে গেল জমিলা। সফিয়ার মুখে যাওয়ার আগে একদলা থু-থু ছিটিয়ে দিয়ে গেল যেন।

কোথা দিয়ে কি যেন ঘটে গেল। দুঃস্বপ্নের ঢেউ বহে গেল যেন। অনেকক্ষণ সেই আবছায়া অন্ধকারে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলো সফি। ভাবতে চেষ্টা করল এতোক্ষণ কি হ'ল! সে কি ঘুমিয়ে ছিল!

পারল না। সবকিছুই কেমন যেন এলোমেলো মনে হ'ল। ছায়া-ছায়া, অস্পষ্ট। জমিলা যেন কি বলবে ব'লেই এসেছিল। ডেকেছিল। না ব'লে চলে গেল।

যাক্। জমিলার কথাটা কে যেন মুহূর্তে মুছে দিল মন থেকে। বাঁদী মেয়েটার বড় তেজ। জানানা মহলের কুত্তা কতো ভালো হ'তে পারে!

আর বেগমসাহেবা?

সুলতানকে একরকম অথর্বই বলা চলে। অনেকে অন্য কথাও বলে। শুনেছে সে। অনেকদিন অনেকের আলোচনায় কানে এসেছে। মন নয় দেহ। দেহসর্বস্ব সুলতানি দুনিয়া। পাপের দুনিয়া। ব্যভিচারের দুনিয়া। যেখানকার প্রতিটি মানুষ পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত। সেখানে যা রটে তা হয়তো সত্য। মিথ্যে যে প্রতিপদে। প্রতিটি ইঁট-পাথরের মাঝে। বিশ্বাস নেই। হারিয়ে গেছে।

সুলতানি দুনিয়াটায় বিশ্বাস করাটা মিথ্যে।

নিশ্চিহ্ন হ'ল।

মরে গেল একটা প্রাণ। কতো তাড়াতাড়ি। কতো অনায়াসে।

॥ চৌদ্দ ॥

: ওস্তাদ !

: কে ? মানুষ, বন্ধু, না, শয়তান। ভাবতে চেষ্টা করল সে।

: আমি বাহারাম। একটা খোজা বান্দা। নাসিরুদ্দীনের শয়তানির দোসর। অক্ষমতার প্রতিমূর্তি।

: কেন ? তবু সে জানতে চাইলো। সন্দেহটা দূর করতে চাইলো।

: কী ? মিথ্যে মনের জড়তাটুকু ত্যাগ করো। খোজার কাছে লজ্জা নেই। যেন সেই ইঙ্গিত দিল বাহারাম।

: এখানে কেন ? সে যেন নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। বিশ্বাস মরে গেছে তার।

: ওস্তাদ ! আমি বন্ধু। আমরা বন্ধু হ'তে পারি। সমব্যথী।

: জামিলা আমাকে ঝুটা বাত শুনিয়ে গেল বাহারাম। যেন সান্ত্বনা পেতে চাইলো সে।

: ছোড় দিজিয়ে। ভোলাতে চাইলো সে।

: নেহি। গর্জে উঠতে চাইলো অক্ষম পুরুষত্ব।

: তব্ ? তবে কি করবে তুমি ? কি করতে চাও ?

: হম্ উসকো মার ডুঙ্গা।

: নেহি—নেহি।

: কাহে ?

: জানানাকো বাৎ ছোড় দিজিয়ে। তুমি পুরুষ হয়ে একটা মেয়ের কথায় রাগ করছো। ওদের কথায় রাগ করলে চলে নাকি !

: ছোড় দেগা ?

: জী।

মাথার মধ্যে যে আগুনটা দপ্ ক'রে জ্বলে উঠেছিল অনেকটা ঠাণ্ডা হ'ল। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো সে। ভাবতে চাইলো।

বাহারাম তাকে দাঁড়াতে দিল না। ভাবতে দিল না। ডাকল : ওস্তাদ!

: উঁ।

: আভি ক্যা করেগা?

: কী করবো?

: চলিয়ে।

: কোথায়?

: আইয়ে।

সফির হাত ধরলো বাহারাম। অক্ষম কিন্তু শক্তিহীন নয়। নিয়ে এলো সঙ্গে ক'রে। পৌঁছে দিল নজরবিবির কক্ষে।

শেষবার চমকালো। বুক কাঁপলো। ইচ্ছে হ'ল······

নজরবিবি বললে : কী হ'ল ফিরে এলে যে?

: হ্যাঁ।

: কেন?

এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হ'ল না তার পক্ষে। সে জানেও না। একবার শুধু অসহায় ভুল-করা চোখ দু'টো তুলে নজরবিবিকে দেখেই মাথাটা নীচু করল।

পালঙ্কে এলায়িত ভঙ্গীতে শুয়েছিল নজরবিবি। কাত হয়ে। বাঁ-হাতের তালুতে রাখা ছিল মাথা। উত্তরের অপেক্ষায় চেয়ে রইলো সফির মুখের দিকে। ওকে দেখল। ওর বলিষ্ঠ তারুণ্যের দীপ্তিটা ম্লান। আঘাত পাওয়া হৃদয়, অসহায়। আশ্রয় চায়, অবলম্বন।

সফি অসহায়-বিভ্রান্ত, ক্রমশঃ ইচ্ছেশক্তি লুপ্ত। সে ভাবতে পারছিল না তার কি হয়েছে! কী করবে? কি করা তার উচিত, কর্তব্য। তবু আচ্ছন্ন চেতনা একটা মানুষের আকুতি-বিহ্বল

বিভ্রান্তির মাঝে ঝরে পড়ছিল। কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুললো। বন্ধুত্বের দাবি জানালো : আমি কি করবো ?

: কী করবে ? নজরবিবির কণ্ঠটাও যেন জানতে চাইলো সে কথা।

: আমি ভুল করেছি। তার কণ্ঠে স্বীকারোক্তি।

: কী ভুল ?

: মানুষের ভুল।

: কেন ?

: কি জানি !

সে জানে না। কেন ? তাও জানে না। অবলুপ্তি ঘটছে তার।

নজরবিবি ভাবছে। শেষ চেষ্টা করছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব চলছে তার মনে, সমস্ত সত্তায়। একটা মানুষ। সফি। পরিচয় একজন পাইক। সুলতানের গোলাম। দিনের আলোয় তুচ্ছ এটা জীব। রাত্রে সে ভিন্ন। মূল্য বড় কম নয়। ইচ্ছে অনিচ্ছেয় সেই শ্রেষ্ঠ। সে সব পারে। সুলতানের সুলতান। সেই মালেক। অন্ধকারের। প্রতিটি রাত্রির।

এটা কি বিচার সভা ? অন্যায়ের, অপরাধের ! নীরবতা অসহ্য। সামনে মরুভূমি। বালি আর বালি। উত্তপ্ত। শুষ্ক। অসহ্য তৃষ্ণা। পিপাসায়-কাতর প্রাণ।

একটু পানি ! জলের জন্যে ছটফটিয়ে উঠল তার প্রাণটা। আর্তনাদ।

নজরবিবি উঠল। শেষ চেষ্টা তার। সেও তো পারে। সাফল্য তার করায়ত্ত। তবে কিসের দ্বিধা ! বিচার-বিশ্লেষণ। সেও জয়ী হ'তে চায়, বাঁচতে চায়, মুক্তি তার কাম্য।

পানীয়ের ভৃঙ্গার। পূর্ণ কানায় কানায়। বিভ্রান্ত যৌবনের হাতে তুলে দিল। বিচার করার সময় কোথা ! শক্তি নেই। দেখল না পর্যন্ত। তৃষ্ণা নিবারণ করতে চায়। জ্বালাটা অসহ্য।

পান করল। আবার জ্বালা, ক্ষণিকের। তরল-গরল-অমৃতের রূপ নিতে দেরি হ'ল না। স্বস্তি! ভয়-ভাবনা-দুশ্চিন্তা আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। সহজ নয়, সাহসী হয়ে উঠছে। অশান্ত হয়ে উঠছে মনটা। অবলুপ্তি। তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়তে চাইছে। চুরমার হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। দুনিয়াটা মিথ্যে।

তবু শেষবারের মতো কাতরোক্তি শোনা গেল তার কণ্ঠে : আমি কী করবো?

: আমি জানি। বিশ্বাসী কণ্ঠটা বড় আপন।

: বল। সে জানতে চাইলো।

: এসো।

: কোথায়?

: এখানে।

: না-না, ও নয়।

: তবে?

: আমি যে মুক্তি চাই।

: পাবে।

: পাবো?

: নিশ্চয়ই পাবে। আমি তোমার বুকে হাত দিচ্ছি। জবান দিচ্ছি। খোদার নামে কসম খাচ্ছি। আমাকে বিশ্বাস করো।

: আমি এ জীবন, যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচতে চাই। আমি সুখ-শান্তি, ভবিষ্যৎ কামনা করি। আমি একটা কসবীর মেয়েকে পেয়ারের ধোঁকা দিয়েছি। তাকেও চাই আমি আমার জীবনে।

: পাবে।

: কে দেবে?

: আমি।

: কেন দেবে?

: তুমি যে আমার বন্ধু, দোস্ত। তোমার দোস্তি চাই আমি।

: শুধু এই ?

: না, আরও আছে। সত্যি কথাই বলছি তোমাকে। তুমিও তো আমাকে কম দেবে না !

: কিন্তু আমার যে কিচ্ছু নেই।

: কে বললে নেই, আছে। অনেক আছে তোমার। যা একমাত্র তোমারই। আর কারো নয়। কেউ পারে না।

: কী আছে আমার ? যা আমি জানি না ?

: তুমিও জানো। আছে ব'লেই দেখ না।

: কিন্তু কী ?

: গৌড়ের মসনদ।

: না-না, আমার নয়। কোনোদিন ছিল না, কোনোদিন হবে না। মসনদ সুলতানের। সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজশাহের। তিনিই নায্য অধিকারী। আমি কেউ নই। যদি কাউকে বলি আমাকে পাগল বলবে।

: বলবে না। জানে না ব'লেই একথা বলছ। আমি জানি মসনদ তোমার। তুমিই মসনদের একমাত্র অধিকারী।

: আমি !

: হ্যাঁ, তুমি।

: যাঃ, তুমি ঠাট্টা করছো। আমার সঙ্গে দিল্লাগী করছো তুমি। আমাকে দেখতে চাইছো মসনদের লোভ আছে কি-না।

: আমি যা বলছি তা যদি সত্যি হয় ?

: কি সত্যি হয় ? মসনদটা যদি সত্যিই আমার হয় ? দোহাই তোমার, তুমি আমার সঙ্গে মজা কোর না। আমার ভালো লাগছে না। সুলতান সৈফুদ্দীন আমি পাইক একজন। সুলতানের গোলাম।

: আচ্ছা, মসনদটা যদি তোমার হয়, মনে করো মসনদটা তুমি পেলে। কি করবে মসনদটা নিয়ে ? সুলতান বানবে তো ?

: তোমার দিমাগের ঠিক নেই। নয়তো তুমি খোয়াব দেখছো।

আমি দেখছি না, ভাবছিও না—মসনদে আমার প্রয়োজন নেই। আমি বেশ আছি। আমি এমনি থাকতে চাই। ঠিক এমনি।

: সত্যি বলছ ?

: সাচ।

: কসম খাচ্ছ ?

: আমি মিথ্যে বলি না।

: বেশ।

বাইরে নিঃশব্দ অন্ধকার। আসমানে সীতারাদের ঘুম-ভাঙা চোখে রাতের প্রহর গোনা। দুনিয়ার মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে।

কক্ষের মধ্যে দু'টি চঞ্চল ছায়া। প্রদীপের শিখাটা ম্লান। আয়ু ফুরিয়ে এসেছে তার। বাতাস নেই, তবু কাঁপন।

হৃদপিণ্ডের উষ্ণতা অনুভবে চেতনার তটে উঠে এলো একটা প্রাণ। চমকে উঠল। অনুশোচনা। অতীতকে জাগাতে চাইলো সে। ব্যর্থ হ'ল। একটা জীবনের জন্মান্তর।

মৃদু প্রশ্ন হ'ল : আমরা সুখী ?

: হ্যাঁ।

: জবান।

: ভুলবো না।

: তুমি আমার।

: আমরা দু'জনের।

: মসনদ ?

: তোমার।

: মনে রেখো।

: কথা দিচ্ছি। তোমার বুকে হাত রেখে তোমার প্রাণকে আমি জবান দিলাম।

শেষ রাতের তারারা হাঁটছে। ফিকে হচ্ছে রাতের অন্ধকার। আলোর লগ্ন সমাগত।

নজরবিবির বক্ষে সাফল্যের ছোঁয়া। সে জয়ী হয়েছে। মসনদের অধিকারী তরুণ প্রাণটা বন্দী তার দু'বাহুর বেষ্টনীতে।

॥ পনেরো ॥

পরদিন আবার ডাক এলো। রাতে নয়, দিনে। সফি তখন তার সমস্ত রাতের জাগরণ-ক্লান্ত দেহটা নিয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে ছিল। স্বপ্ন দেখছিল। জমিলা নয়, নজরবিবির পূর্ণ যৌবনের। যে যৌবন তাকে অনভিজ্ঞতার অন্ধকার পার ক'রে দিয়েছে একটি রাতের কিছু মুহূর্তের ব্যবধানে।

জমিলার মুখটাও ভেসে উঠছিল বারবার। ক্লান্ত চোখ, একটা শুকনো মুখের মেয়ে। কৈশোর প্রান্তশেষে যৌবনের দ্বারে যার সবেমাত্র পদার্পণ। অনভিজ্ঞ। নিজেকে নিয়েই খুশি, সুখী। অন্যের প্রতি অন্যমনস্ক। সফি নামের দুরন্ত পুরুষ যৌবনটা তাই হতাশ হয়েছে বারবার। পুরুষের মন কি চায়, কামনা করে জমিলা জানে না। শুধু এগিয়ে এসেছে। হয়তো বা ভয়ে ধরা দিয়েছে। ভয়-পাওয়া মনটার দুর্ভাবনা মুছে ফেলতে পারেনি। আর সেইজন্যেই সুখী হয়নি, তৃপ্ত হয়নি অন্য মনটা।

নারীর যৌবন, দেহ—যে-দেহ ভয়ে স্থির, দুর্ভাবনায় শীতল। সেতো শুধু জ্বালা বাড়ায়। কামনার মৃত্যু ঘটায়। প্রাণ যে চায় প্রাণের স্পর্শ। যৌবনের উত্তাপ।

ছিল না, নেই। জমিলার কিছু নেই। জমিলা জানে না—পারে না। জমিলা একটা মৃত শব। শুধু দেহ। শকুনের খাদ্য। আহার্য শয়তানের। মানুষের আড়ালে যে পশু লুকিয়ে থাকে; সুযোগ সন্ধান করে। ঝাঁপিয়ে পড়ে অগোচরে, অবসরে।

সফি একটা মানুষ। তাজা প্রাণের অধীশ্বর। বুভুক্ষু যৌবন।

নজরবিবি কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলেছে, ভরিয়ে দিয়েছে, তৃপ্ত করেছে। সফি সুখী, শান্তি পেয়েছে সে।

নজরবিবির সুন্দর মুখখানা ভেসে উঠল। কূল ছাপানো যৌবন। গাঢ় লালের আবরণে ঢাকা। তবু ঢাকতে পারেনি। লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। দুরন্ত আহ্বান দু'চোখের কানায় কানায়। বিলোল কটাক্ষে জাগ্রত চেতনা। নজরবিবির গোলাম হবে সফি। হবে রূপ ও যৌবনের অধিকারী। যে-কোনো মূল্যে। লুটে নেবে সে। হারাবে না। হারিয়ে যেতে দেবে না। অন্যায়, বেইমানী যেমন ক'রেই হোক।

তাই বা কেন? মসনদ তো তার। সফির। বলেছে নজরবিবি। সফিকে জাগিয়ে তুলেছে।

আর এজাগরণ ব্যর্থ হ'তে দেবে না সে। ঘুমিয়ে পড়বে না। আপন অধিকারে নিয়ে আসবে। মসনদ তার। সফির। একজন পাইকের!

কিন্তু স্বপ্নটা হঠাৎ টুটে গেল। বাবুর্চি বুড়োর চিৎকারে ঘুমটা ভেঙে গেল। কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেল সে। চেয়ে রইলো বুড়োর মুখের দিকে।

ঃ কি রে বেহুশ হয়ে আর কতো নিদ্ দিবি?

সত্যি তো! দেখলো সফি। সূর্য উঠে গেছে। হাওয়াটা বেশ গরম। সকাল পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শেষরাতে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়েছে এতোটা বেলা অবধি।

সফির মুখের দিকে দেখলো বুড়ো। দেখতে পেল ঢেকে-রাখা রাতের আহার্য তেমনি পড়ে আছে। বললে: সারা রাত ছিলি কোথায়?

সফি চুপ ক'রে রইলো। কথা বলতে ভালো লাগল না তার। মাথাটা এখনও ঝিমঝিম করছে। গলাটা বিস্বাদ। একটা বমি-বমি ভাব।

বুড়ো যেন বুঝতে পারল তা। নিজের মনেই খানিক গজগজ করল। বললে: এখন উঠ্‌বি, না, আবার নিদ্ যাবি?

ঃ কেন? কথা বলল সে। নিজের কানেই কেমন বেসুরো

শোনালো। কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে গেছে গলাটা। কণ্ঠনালি জ্বালা ক'রে উঠল যেন।

ঃ তোকে ডাকতে এসেছে। বললে বুড়ো।

ঃ আমাকে?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কে ডাকতে এসেছে? সফি যেন ভয় পেল একটু। সাবধান হ'তে চাইলো। মনে হ'ল সর্বনাশ হয়েছে।

কিন্তু যা ভেবেছিল, আশংকা করেছিল তা নয়। বাহারাম নয়, ঘরে এসে ঢুকল বান্দা জালাল। সুলতানের হারেমের একজন খোজা। বাহারামের মতো জোয়ান নয়, বৃদ্ধ-অথর্ব। দেখেছে অলিন্দের এক কোণে বসে বসে ঝিমোয় আর খুক্-খুক্ ক'রে কাশে। কোনো কাজেই আসে না।

তবু আছে। যাবার কোনো জায়গা নেই ব'লেই পড়ে থাকে। মৃত্যুর দিন গোনে। মরলে খোজারাই তুলে নিয়ে গিয়ে কবর দেবে। খোদার দুনিয়ায় মানুষের অধিকারে এলেও সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে মানুষই। পশুর জীবনে ঠেলে দেয়। বঞ্চিত ক'রে রাখে। বন্দী জীবন। যে-জীবন থেকে শত চেষ্টাতেও মৃত্যুর আগে মুক্তি মেলে না।

খোজাদের জন্মে বড় দুঃখ সফির প্রাণটায়। নিজের প্রতিই কেমন যেন ঘৃণা জাগে। কারণ, সে সুস্থ স্বাভাবিক, মানুষের মতো বাঁচার অধিকার তার রয়েছে। যারা ওদের এমন করেছে সে তাদেরই একজন। ওরাও বাঁচতে এসেছিল। দুনিয়ার আলো দেখেছিল। আনন্দে মেতেছিল। খেয়ে-খেলে কাটিয়ে ছিল দিন।

ওদের ঘরে মা বহিন, আব্বা আরও কতো আত্মীয়-পরিজন ছিল। তারাও হয়তো তাদের সন্তানকে ঘিরে অনেক কিছুই ভেবেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু স্বার্থপর মানুষ, দস্যু লম্পটের দল সকলের বুকের মাণিক, আশার আলোকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল একদিন। মায়া-মমতা, বুদ্ধি-বিবেকহীন কসাইয়ের মতো ওদের পুরুষাঙ্গকে বিকল ক'রে

পণ্য ক'রে তুলেছিল। অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করেছিল একদিন। উজীর আমির, ধনীর ঘরে স্থান হয়েছিল ওদের। শুরু হয়েছিল পশুর জীবন। রক্তাক্ত জীবনপরিক্রমা। শত অন্যায় অত্যাচার সহ্য করা। কারণ, অভিযোগ বা তার প্রতিকার নেই। খোজার একমাত্র পরিচয় সে আদমী নয়, খোজা।

জালাল এসে দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। পা দু'টো কাঁপছিল তার। বৃদ্ধ শরীরটা দাঁড়াতে পারছিলনা।

একটু যেন অবাক হয়েছিল সফি। একটু ভয়। জমিলাকে মনে পড়েছিল। তার চোখের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সফিকে সে ঘৃণা ক'রে গেছে।

আজ এসেছে জালাল। হারেমের এক বৃদ্ধ খোজা। যার কোনো কাজই নেই মৃত্যুর দিন গোনা ছাড়া। আজ কাজে লেগেছে সে। হয়তো…

সফি ভাবল। জালালের আগমনের কারণটা চিন্তা করল। উদ্দেশ্য বুঝতে পারল না। বললে: কিছু বলবে?

: হ্যাঁ।

: বল।

: বেগমসাহেবা আপনাকে ডাকছেন।

: কেন?

কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রেই তার মনে হ'ল ওর কাছে কিছু জানতে চাওয়া নিরর্থক, ভুল! ও কিছুই জানে না। ও শুধু বেগমসাহেবার হুকুমটুকুই জানাতে এসেছে। কেন, কি কারণে বেগম ডেকেছেন তার কিছুই জানে না। জানতে চেয়েছিল: কে ডাকতে বললে তোমাকে?

: বেগম সাহেবা।

বেগম! ভাবল সফি। গত সন্ধ্যায় জমিলা গিয়েছিল। তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আজ আবার জালালকে পাঠিয়েছেন। হয়তো জরুরী প্রয়োজন। বেগমের আজ প্রয়োজন তাকে।

জালাল দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো মানুষটা অপেক্ষা করছে। সফির উত্তর পৌঁছে দিতে হবে বেগমকে। তিনি হয়তো বলে দিয়েছেন। জালাল ফিরে গেলেই তার কাছে জানতে চাইবেন।

কি করবে সে? যাবে, না, যাবে না? আজও ফিরিয়ে দিতে পারে। বলতে পারে যাবে না কিংবা সময় নেই বা বেগমের হুকুম শুনতে সে বাধ্য নয়। তার সম্পর্ক সুলতানের সঙ্গে। সুলতানের রক্ষাকর্তা সে। রাত্রে সুলতানকে জিন্দা রাখার দায়িত্ব তার। গোলামের মতো হুকুম শুনতে সে বাধ্য নয়। সুলতানের অনুরোধ শুনলেও শুনতে পারে।

আজ দিনের আলোয় না এসে জালাল যদি সন্ধ্যায় আসতো তাহলে হয়তো ওকে ফিরিয়ে দিত সে। এখন বললে: তুমি যাও।

: আপনি যাবেন?

: যাব।

চলে গেল জালাল। তেমনি কাঁপতে কাঁপতে। ক্ষীণ, দুর্বল আয়ু।

জালাল চলে যেতে বাবুর্চি বুড়ো বললে: কি রে ছোঁড়া, কি ব্যাপার তোর?

: কী ব্যাপার? পাল্টা প্রশ্ন করল সফি।

: তাই তো জানতে চাইছি। বুড়োর চোখে সন্দেহের একটা ঢেউ খেলে গেল। সাবধান হ'ল সফি। বললে: জানি না।

: সাচ বলছিস্?

: ঝুট ব'লে লাভ?

: লাভ নেই? কুতকুতে ছানিপড়া চোখ দু'টো চিক্‌চিক্ ক'রে উঠল। বললে: লাভ আছে বৈ কি। তুইও লাভের আশায়……।

কথাটা শেষ করল না। হঠাৎ চুপ ক'রে গেল বু'ড়ো।

: কা? কেঁপে উঠল সফি। যেন ভয় পেল। ধরা পড়তে চাইলো না।

বুড়োর গলাটা এবার কঠিন শুনালো। বললে : আমি সব জানি। বিলকুল।

: কি-কি জানো তুমি? ছিটকে দাঁড়িয়ে পড়ল সফি। তার সমস্ত শরীরটা উত্তেজনায় থরথর ক'রে কাঁপছে। সে ধরা পড়ে গেছে। বাবুর্চি বুড়োর শয়তানি চোখ দুটো ধরে ফেলেছে সব।

কাছে এগিয়ে এলো বুড়ো। সফির কাছাকাছি। কয়েক মুহূর্ত ওর ভয়-পাওয়া মুখটার দিকে চেয়ে রইলো। বললে : শুন্‌বি?

: শুনবো। শেষবারের মতো মরিয়া হয়ে উঠল সফি।

বাবুর্চি বুড়ো কিন্তু কিছু বললে না। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। ওকে দেখল। তারপর মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললে : আমি তোর ভালো চাই সফি।

: ভালো! যেন বিদ্রূপ ক'রে উঠল সফির কণ্ঠটা।

: হ্যাঁ সফি, আমি তোর ভালো চাই। কথাটা ব'লে একটু চুপ ক'রে রইলো বাবুর্চি বুড়ো। তারপর একসময় আস্তে আস্তে বললে : সেই জন্যেই বলছি এখনো সময় আছে হুঁশিয়ার হওয়ার। নাহ'লে খতম হয়ে যাবি। কথা বলে আর দাঁড়াল না বুড়ো। আস্তে আস্তে চলে গেল।

সফি দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবতে চেষ্টা করল বাবুর্চি বুড়োর কথাটা। বুড়ো তাকে সাবধান ক'রে গেল। হুঁশিয়ার হ'লে বাঁচবে। না হ'লে শেষ হয়ে যাবে। খতম হয়ে যাবে দুনিয়ার বুক থেকে। কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

নজরবিবির কথাটা ও কি জানতে পেরেছে? ভাবল সফি। জানাটা অস্বাভাবিক নয়। নিশ্চয়ই জেনেছে। একদিন তো লোকটা শয়তান ছিল। শয়তানি ছিল ওর মজ্জায় মজ্জায়। অনেক ঘর ভেঙেছে। অনেকের সর্বনাশ করেছে।

সেইজন্যেই পেরেছে। সাচ্চা হ'লে পারতো না। কোনো মতেই সম্ভব ছিল না।

সফি ভাবল। কি করবে সে? কি করা তার কর্তব্য? কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না! চিন্তা শক্তি ক্রমশঃ অবশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

সেই অবস্থায়, সফি যখন অসহায় দিশেহারা হয়ে ভাবছে, মাথা খুঁড়ে মরছে, সেইসময় অবার কাছে এলো বাবুর্চি বুড়ো। বললে: কি রে, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

: কি করবো? যেন জানতে চাইলো সফি।

: যা গোসল ক'রে আয়। সারারাতভোর খাস্‌নি, খানা খেয়ে নে।

সত্যিই তো! মনে পড়ল তার। সমস্ত রাত কিছু খাওয়া হয়নি। শরাবের নেশায় মাতাল হয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল সব কিছু।

এখন স্নান ক'রে এলো সে। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে সমস্ত দেহ-মন জুড়িয়ে গেল। ভুলে গেল। সহজ হ'ল যেন।

ফিরে খেয়ে নিল বাবুর্চি বুড়োর কাছে। আকাশের সূর্যটা দিনের মধ্যপথে। অবসাদে ক্লান্তিতে চোখের পাতা বুজে এলো। শুয়ে পড়ল কিন্তু ঘুম এলো না। এলো চিন্তা।

ভাবল সফি। গত রাত্রের ক্লেদাক্ত পরিবেশটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। স্পষ্ট হ'ল নজরবিবির স্বরূপটা। মিথ্যে, ভুল। ভুলের মোহে অন্ধের মতো ছুটেছিল। একটা কামুকা পণ্যা নারীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। তার যৌবনের প্রথম মিলন পঙ্কিলতার আবর্তে।

জমিলার বিশ্বাস, পেয়ার মিথ্যে। সে ভালো বাসেনি জমিলাকে। এতোদিন শুধু ভোগের তৃষ্ণায় ছলনা ক'রে গেছে। এখন সে শয়তান! জমিলাকে নষ্ট করা এখন আর তার পক্ষে অসম্ভব নয়। সে স্বেচ্ছাচারী, নীতিভ্রষ্ট, বেইমান।

না—না—না।

আর্ত চিৎকার ক'রে উঠল মানুষের প্রাণটা। সাচ্চা হ'তে চাইলো। ভুলতে চাইলো সব কিছু। খোদার কাছে দোয়া ভিক্ষা করল।

খোদা দোয়া করো! খোদা তুমি আমাকে পথ দেখাও, আলোর সন্ধান দাও। আমি ভুল করেছি। পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছি। তবু আমি তোমার কাছে দোয়া ভিক্ষা করছি। তুমি দোয়া করো। আমার বিশ্বাসটা ফিরিয়ে দাও। আমার সেই পেয়ার। আমার সব। আমার সবকিছু।

মেহেরবান খোদা তুমি আমাকে দোয়া করো।

দোয়া করো!

বাইরে এলো স.ফ।

দুপুর শেষে বিকেল। উজ্জ্বল রৌদ্র। আলো ঝলমলে একটা দিন। কর্মব্যস্ত দিনের মানুষ। নির্মল উজ্জ্বল।

পায়ে পায়ে পথ চললো সে। চেয়ে চেয়ে দেখলো চারিধার। সবকিছুই পরিচিত কিন্তু এমনভাবে দেখা এই প্রথম। ভাল লাগল। খুশির ছোঁয়ায় ভরে উঠল মনটা।

এগিয়ে যাচ্ছিল সে। তার কর্তব্যের পথে।

পথ আটকাল বাহারাম। দিনের আলোয় সে সাহসী হয়ে উঠেছে।

সতর্ক গলায় ডাকল : ওস্তাদ!

না, চমকালো না সফি। ভয় পেল না। ওর দিকে চাইলো।

: কোথায় যাচ্ছেন?

: হারেমে। সহজভাবেই বললে সে।

কেন, সে কথা জানতে চাইলো না বাহারাম। হয়তো এমন সহজ উত্তরটা সে আশা করেনি। অবাক হয়েছে। হয়তো ভাবছে কিছু।

: বেগমসাহেবা ডেকেছেন। সফিই বললে সে কথা।

বাহারাম আর কথা বলল না। আর কিছু জানতে চাইলো না।

পাশ কাটিয়ে চলে গেল। যেন সফিকে সে চেনে না। চিনলেও পরিচয় নেই।

খোজাটা শয়তান। সবসময় চোখে চোখে রেখেছে। নাসিরুদ্দীনের চর।

নজরবিবি তার দেহের বিনিময়ে মসনদ চায়। বেগম বানবে সে। বেইমান হবে সফি।

কভি নেহি! সর্দারের জবানের অমর্যাদা সে করবে না। যে ভুলটুকু করেছে তা সংশোধন ক'রে নেবে।

জমিলাকেও ভুলে যাবে। অনেক শিক্ষা তার হয়েছে, আর নয়।

: ক্যা শোচতা ?

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সফি। অবাক হ'ল। দেখলো নিজের অজান্তে কখন সে হারেমে পৌঁছে গেছে। প্রশ্নকারিণী বেগমসাহেবা স্বয়ং।

সফি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কথা বলতে পারল না।

হাসলেন বেগমসাহেবা। বললেন : আও!

এগিয়ে চললেন তিনি। সফি অনুসরণ করল তাঁকে। আপন কক্ষে পৌঁছে থামলেন। দাঁড়ালেন মুখোমুখি। চোখে চোখ রাখলেন। জানতে চাইলেন : কাল আয়া নেহি ক্যাহে ?

সফি চুপ ক'রে রইলো।

: তবিয়ত ঠিক নেহি থা ?

: নেহি—নেহি।

: তব্ ?

সফি নীরব।

হাসলেন বেগম। বললেন : দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।

সফি চাইলো তাঁর মুখের দিকে।

: একটু বসো তুমি। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

: কি কথা ?

ঃ এসে বলছি, চলে যেওনা।

কক্ষ ছেড়ে চ'লে গেলেন তিনি।

সফি বসলো না। বেগমের আজকের এই ব্যবহারটুকু কেমন যেন রহস্যময় বোধ হ'ল তার কাছে। তাঁর প্রশ্নের ধারাটাও। যেন কিছুই জানেন না। জমিলার সঙ্গে গত সন্ধ্যায় সেই তীব্র বাদানুবাদের কিছুই কি শোনেননি!

হয়তো হবে। বলেনি জমিলা। ফিরে এসে অন্য কথা বলেছে। সত্য গোপন করেছে। জানতে দেয়নি বেগমকে।

না-না সত্যি নয়, এ সত্যি হ'তে পারে না। সত্যি হতো জমিলা যদি আগের মতো থাকতো।

তখন জমিলার চোখে আলো ছিল। প্রেমের আলো। মহব্বতের রোশনাই। সফির ছবি কাঁপতো জমিলার দুই চোখের তারায়।

কাল জমিলার চোখে ছিল আগুন, অহংকার, ঘৃণা। সফির ছবিটা সেখানে দেখা যায়নি। নাগিনী বিষ ঢেলে দিয়ে বিদায় নিয়েছিল।

আর সেই বিষের জ্বালাতে অস্থির হয়েছিল সফি। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছিল। শুভবুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটেছিল। একটা মানুষের মন নিঃশেষ হয়েছিল। খতম। কামনার দাস একটা পশু জেগে উঠেছিল আক্রোশে। ব্যর্থ আক্রোশ। পতন হয়েছিল তার।

কিন্তু আজ আবার জেগে উঠেছে। জাগিয়ে তুলেছে বাবুর্চি বুড়ো। অতীতের একটা শয়তান। অন্যায়, পাপ আর বেইমানীর শাস্তি গ্রহণ করেছে আজ। হয়তো খোদাকে ডাকছে। মুক্তি চাইছে। একদিনের অপরাধের গ্লানি আজ সাবধান করেছে অন্যকে।

কিন্তু সে কি করবে? সেও তো ভালো হ'তে চায়, ফিরতে চায়। পথের সন্ধান।

মনে হ'ল ভুল করেছে। একটা ভুলের পরে আর একটা ভুল। ছলনাময়ী নারীর ছলনার জালে জড়িয়ে পড়তে এসেছে।

না, আর নয়। আর ভুল করবে না।

পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবল সফি। মুক্তি। সে পালিয়ে যাবে।

পথ খুঁজলো। মুক্ত দ্বার। দেখতেও পেল। কিন্তু পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। বাধা এলো আবার।

ঃ ওদিকে পথ নেই। কে যেন বললে কথাটা।

সেই কণ্ঠস্বর। পরিচিত। যে কণ্ঠ তাকে ভুলিয়েছিল, জাগিয়েছিল, স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

কিন্তু একি! এ-কে? স্বপ্ন, না, সত্য! এ তো হারেমের বাঁদী নয়! মনি-মুক্তা-খচিত বেগমের পোশাক ও কেমন ক'রে পেল? কোন্ অধিকারে?

ঃ বেটী, জমিলা বেটী!

ঃ আম্মা!

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য ক'রে জমিলা ছুটে গেল। বেগম ডাকছেন।

সফি দেখছে। সফি ভাবছে। একটা পাগল। একটা মানুষ পাগল হয়ে যাচ্ছে।

একটা বাঁদীর জীবনে আলো। মুক্তি-লগ্ন।

খোদা! তুমি আছো। তুমি মেহেরবান। তোমার দয়ার শেষ নেই। তুমি করুণাময়।

দুনিয়ায় একমাত্র শক্তিমান তুমিই।

মানুষ কেউ নয়। মানুষ কিছু নয়।

দুনিয়াটা খেলাঘর। দুনিয়ার খেলাঘরের পুতুল মানুষ।

মানুষ কিছু পারে না। কোনো ক্ষমতা নেই মানুষের। তুমি করো। তুমি করাও। আমরা তোমার আদেশ পালন করি।

করি বাধ্য হয়ে। কৃতার্থ হওয়ার জন্যে। না ক'রে যে আমাদের অন্য পথ নেই। আমরা অন্ধ, পথহারা! তোমার হাতে আলো। পথের দিশা।

খোদা তুমি দোয়া করো।

শান্তি দাও। আমাকে পথ দেখাও। আলো জ্বাল।

॥ ষোল ॥

জমিলা এ যেন সত্যি নয়!

আশ্চর্য হ'ল জমিলা। ওকে দেখলো। ওর কুণ্ঠিত ভাবটায় ব্যথা জাগলো তার কোমল মনে। বললে, কি সত্যি নয়?

সফি বলতে পারল না। একবার শুধু ওর মুখের দিকে চেয়েই চোখ নত করল। অপরাধী কণ্ঠে ওর নাম ধরে ডাকল, জমিলা!

: বল!

: তুমি আমাকে ক্ষমা করো জমিলা। আমি···

: কী?

বলতে পারলে না সফি। জমিলার উৎসুক চোখের সামনে নিজেকে তার অনেক—অনেক ছোট মনে হ'ল। হীন—প্রবঞ্চক। সে অপরাধী, অহঙ্কারী, আত্মাভিমানে স্ফিত। জমিলা নিষ্পাপ, সুন্দর, সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো। মালিন্য তাকে স্পর্শ করেনি। কোন ছলনা নেই তার মধ্যে। সেদিনের অপমান ভুলে গেছে। ছুটে এসেছে। নিঃসংকোচে ধরা দিয়েছে।

জমিলা আজ আর বাঁদী নয়। বাঁদীর জীবনটা শেষ হয়েছে তার। বেগমসাহেবা মুক্তি দিয়েছেন, বুকে টেনে নিয়েছেন তাকে। আজ আর কোনো বাধা নেই তার জীবনে। কোন ব্যবধান। মানুষের অধিকার অর্জন করেছে বেগম মহলের বাঁদী জমিলা।

আজ নতুন জীবন। নতুন দিন। আজকের আলো বাতাস মুক্ত, নির্মল, উজ্বল। আকাশের মেঘ বেদনার সমুদ্র নয়, খুশির জোয়ার। ঘন বরষায় স্বপ্ন সঞ্চার। বৃষ্টির শব্দ প্রাণের গুঞ্জরণ।

কিন্তু জমিলা ভোলেনি। তার অতীত, প্রেম, হৃদয়। মনের মানুষকে সে ভোলেনি। প্রাণের মানুষকে অবজ্ঞা করেনি। ছুটে এসেছে, ধরা দিয়েছে।

কিন্তু সফির নিজেকে বড় ছোট মনে হ'ল আজ। জমিলার চোখের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারল না। একটা আত্মগ্লানি, দুঃস্বপ্নের ভারে মনটা তার পঙ্গু অথর্ব হয়ে পড়ল। ছট্‌ফটিয়ে উঠল তার প্রাণটা। ককিয়ে কেঁদে উঠতে চাইলো। নজরবিবির বিশ্বাসঘাতকতা দুষ্ট ক্ষতের মতো বিষিয়ে দিয়েছে মন। সে মিথ্যে বলেছে। ছলনা করেছে। বেগম সাচ্চা। মিথ্যে বলে সে তার মনটায় জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। ভুল পথে চালিত করেছিল।

: কী হ'ল ? তাকে জাগাতে চাইলো জমিলা।

: কী ? সফি অস্থির চঞ্চল।

: কী হয়েছে তোমার বলতো ? মমতাময়ী এগিয়ে এলো কাছে।

: কী হয়েছে ? নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল সে।

: কী ?

: আমি অন্যায় করেছি জমিলা। আমি পাপ করেছি। আমি অপরাধী।

: কেন ?

: আমি অনেক নিচে নেমে গেছি। অনেক - অনেক নিচে। আমার চরম অধঃপতন ঘটেছে।

: কে বলল ?

: আমার অপরাধের শেষ নেই। আমি বেইমানী করেছি। তোমার সামনে দাঁড়াবার অধিকার হারিয়েছি আমি।

: না-না ! যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল জমিলার কণ্ঠ। ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করল সমস্ত মুখখানা। চোখ দু'টো বন্ধ ক'রে ফেললো।

সফি যেন হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠেছে। অশান্ত ক্ষিপ্ত একটা হৃদয়। ব্যর্থতার জ্বালায় অস্থির। আত্মদাহে দগ্ধ প্রাণ। অপরাধ স্বীকার করতে চায়। মুক্তি তার কাম্য। একটু আলো, বাতাস।

এখনো বসন্তের দিন। সুলতান সৈফুদ্দীনের কক্ষটা নির্জন দুপুরে

বড় বেশি নিঃস্তব্ধ। মানুষের সাড়া নেই। কেউ বুঝি ভুলেও আসে না এধারে।

সফি এসেছিল। অনেকক্ষণ আগে। তখনও মধ্যাহ্নের সূর্যটা প্রখর ছিল।

এসেছিল এমনি। প্রত্যাশা জাগেনি। প্রত্যাশার মৃত্যু ঘটিয়েছে সে। স্বপ্নের গলা টিপে ধরেছে। সে ভুলে গেছে। ভুলতে চায়।

সেদিনের কথাটা ভুলতে পারেনি। বেগমসাহেবার ডেকে পাঠানোর পরের ক'টা মুহূর্ত। বেগম হয়েছেন একটা বাঁদীর আম্মা। খোদার দুনিয়ায় সবই সম্ভব। তিনিই তো করাচ্ছেন। আমরা করছি।

বেগম এসেছিলেন। দেখেছিলেন। জমিলার মাথায় স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন: সফি, এ আমার বেটী!

সফি মুখ তুলেছিল। জমিলাকে দেখেছিল। জমিলার বরতনুতে সুন্দর মানিয়েছিল খান্দানী পোশাক। কে বলবে একটা দিন আগে এই মেয়েটাই বাঁদী ছিল!

সফির ভালো খারাপ কিছুই বোধ হয়নি। সে দাঁড়াতে পারছিল না। চলে আসতে চাইছিল। মুক্তির জন্যে ছটফট করছিল।

বেগমসাহেবা হেসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন: তোমার কোনো কাম আছে সফি?

: হ্যাঁ, আছে। অস্থিরভাবেই উত্তর দিয়েছিল সে।

: তাহলে?

: কী?

: থাক্ এখন। পরে বলবো। তোমাকে ডাকলে এসো একদিন।

আর কিছু নয়। সব মিথ্যে। শুধু তাকে দেখানোর জন্যেই ডেকে পাঠানো। তার গালে চড় মেরেছেন বেগমসাহেবা। জমিলা নিশ্চয়ই হেসেছে।

তারপর ক'টা দিন। আবার অস্থিরতা। জমিলা হারিয়ে গেছে।

বাহারাম এসেছে আর ফিরে গেছে। নজরবিবির আহ্বান উপেক্ষা করেছে। ভোগের লালসাটা চিরতরে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

শরীরটা খারাপ হয়েছে। সময় যেন পাষাণ। নড়ে না। দিনটা দীর্ঘ। রাতটা দীর্ঘতর। দুনিয়ার সবকিছুই তিক্ত হয়ে উঠেছে।

আজ শরীরটা আরও খারাপ। দুর্বল হয়ে পড়ছে যেন। সকাল থেকেই শুয়েছিল। শুয়ে শুয়ে ভেবেছিল। আকাশ-পাতাল চিন্তা। ভুলের জ্বালা। অনুতপ্ত অন্তর। গুনাহের শেষ নেই তার। সে কলংকিত। পাপের পংকে কলুষিত।

একটা মূর্খ সে। ধিক্কার দিয়েছিল নিজেকে। পাষাণে মাথা কুটতে ইচ্ছে করেছে। একটা বুদ্ধু জানোয়ার বলে বোধ হয়েছে নিজেকে।

জোয়ান মরদ সে। তার পরিচয় সে একজন পাইক। যে পাইকের কাছে জানের মায়া তুচ্ছ। পাইকের ধর্ম জান নেওয়া-দেওয়া। পাইক বেঁচে থাকে তার সতর্কতায় সাহসে। না-হলে অবধারিত মৃত্যু। কারো সাধ্য নেই পাইককে রক্ষা করে। কারণ পাইক-ই তো রক্ষাকর্তা। পাইকের রক্ষাকর্তা কোন আদমী নয়, খোদা।

সেই পাইক, একটা দুঃসাহসী প্রাণ জানানার ভয়ে জান বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছিল আর একটা জানানার কাছে। আর যার কাছে আশ্রয় নিয়েছিল সে একটা বাজারের কসবী। ছলনায় ভুলিয়ে তার চরম সর্বনাশ করেছে। তার কানে দিয়েছে বেইমানীর মন্ত্র! যে লোভের হাতছানি জীবনের সততায় মনুষ্যত্বের অধিকারে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তুচ্ছ নারীদেহের বিনিময়ে তাতেই স্বীকৃত হয়েছে।

অসহ্য বোধ করেছিল। শুয়ে থাকতে পারেনি। বাইরে বেরিয়ে আসছিল।

বাবুর্চি বুড়ো ডেকেছিল : কোথায় চল্‌লি ?

অন্য সময় হয়তো মাথাটা গরম হয়ে উঠতো। গরম হয়নি সফি। বুড়ো তার বন্ধু হয়েছে। তাকে বাঁচিয়েছে। সেদিনের সব কথা শুনে বলেছে : তোর বদ নসিব !

: আমি কী করবো? অসহায় কণ্ঠে জানতে চেয়েছিল সে।

: কি আবার কর্‌বি। এখানে করার কিছু নেই।

: কিছু নেই?

: না, কিছু নেই। শুধু ইঁট-কাঠ-পাথর। শুধু আমাদের দেহটা। পেটের ক্ষুধা, মনের জ্বালা। বিলকুল ঝুট।

: তাহ'লে?

: ভুলে যা। মনটাকে ভুলতে শেখা।

: পারবো?

: কেন পার্‌বি না? নিশ্চয়ই পারবি। বলেছিল বাবুর্চি বুড়ো। মিথ্যে কষ্ট পেয়ে লাভ কি? কোনো ফয়দা হবে না। যা হয়েছে তোর ভালোর জন্যেই হয়েছে। তুই বেঁচে গেছিস্‌।

হয়তো বেঁচেছে। কিন্তু বাঁচার আনন্দের চেয়ে হারানোর হেরে যাওয়ার হাহাকারে দগ্ধ হয়েছে। অস্থির হয়ে উঠেছে। ছটফটিয়ে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছে। বুড়ো বাধা দিয়েছে। সাবধান করেছে।

সফি বলেছে: আমি শুয়ে থাকতে পারছি না।

: তোর তবিয়ত খারাপ।

: কী করবো?

: ঘুরিসনি বিমারীতে পড়বি!

: পড়বো না। যেন নিজের মনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে।

: জরুর পড়বি। খিঁচিয়ে উঠেছে বুড়ো: আমার কথা না শুনলে ভুগবি। কে দেখবে তোকে?

সফির মনটা ভরে গেছে। অদ্ভুত প্রশান্তি নেমে এসেছে তার দেহে-মনে। বলেছে: কেন তুমি?

: আমি! যেন চমকে উঠেছে বুড়ো।

শুষ্ক মুখে হাসি ফুটেছে তার। যেখানে কেউ কারও আপন নয়, আপন হয় না; বলেছে: আমার যে কেউ নেই।

সফির কথাটা শুনে এক মুহূর্তের নীরবতা তারপর কুৎসিত মুখখানা

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বাবুর্চি বুড়োর। বলেছে : তাহ'লে আমার কথা শোন্।

: একটু ঘুরে আসি ? মিনতি করেছে।

: শুন্‌বি না ?

: পরে ঠিক শুনবো। হেসেছিল সফি। বেরিয়ে পড়েছিল। বুড়ো বাধা দেয়নি আর। শুধু দেখেছিল। যতোক্ষণ দেখা যায় ওকে।

সফি ভেবেছিল একটু ঘুরেই ফিরে যাবে। যায়নি। শরীরটা দুর্বল, কিন্তু মনটা তার অদ্ভুত শান্ত। কি যেন পেয়েছে সে।

হাজির হয়েছিল হারেমে। সুলতানের কক্ষে। শূন্য কক্ষ—মুক্ত দ্বারপথ। প্রবেশ দ্বারে প্রহরী ব্যতীত কাউকে নজরে পড়েনি। ক্লান্ত দুপুরে বিশ্রামের অবকাশ।

সুলতানের কক্ষটায় নির্জন দুপুরে সফি একা। আর কেউ নেই। সে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরটা কানে বেজেছিল তার : তুমি ! যেন সে আশা করেনি তার উপস্থিতি। হয়তো তার কামনা ছিল অন্য কিছু!

জমিলাকে দেখেছিল সে। একখানি সুন্দর প্রতিমা। আশ্চর্য পরিবর্তন। নারীত্বের মহিমায় দীপ্ত উজ্জ্বল।

তার হাতে কয়েক গুচ্ছ ফুল। লাল গোলাপের পাপড়ি মেলা স্তবক। বুকের রক্তে রাঙা।

সে মুগ্ধ হয়েছিল। মহিত হয়েছিল তার অন্তর। বিস্মৃত হয়েছিল সবকিছু। সব—সব।

নিজের কাজ করেছিল জমিলা। নিপুণ হাতে সাজিয়ে দিয়েছিল লাল গোলাপের গুচ্ছ। কাজ শেষে চলে যাচ্ছিল।

জমিলা! অন্তরের অন্তস্থল থেকে কে যেন ডেকেছিল তার নাম ধরে।

দাঁড়িয়েছিল জমিলা।

আর কথা নেই। সে ভেবেছিল। বলেছিল : কোথায় যাচ্ছ ?

: যাবে ?

: তা নয়, তবে……

: কী ?

: কোথায় যাচ্ছ ?

: কাজ নেই ?

: কাজ !

: হ্যাঁ।

: জমিলা !

: উঁ !

এগিয়ে এসেছিল সফি। জমিলার একবারে কাছে।

: কিছু বলবে ? জানতে চেয়েছিল জমিলা। তার দু'চোখে চাপা কৌতুক। কণ্ঠ গম্ভীর। সে ধরা দিতে চায় না।

: না। মাথা নেড়েছিল সফি। তার কিছুই বলার নেই।

তাহ'লে চলি। যেন সফির অনুমতি চেয়েছিল জমিলা। চলে যাবার জন্যে ফিরে ছিল।

ওর একখানা হাত ধরে ফেলেছিল সফি। ওকে যেতে দিতেও চায় না, কথাও বলে না। এ এক যন্ত্রণা।

: এটা কি হ'ল ? যেন রুখে উঠেছিল জমিলা। তার চোখে আগুন নেই, আছে কৌতুক। চাপা কৌতুকে মুখখানা ঝলমল করছিল তার। সফিকে বড় বোকা মনে হচ্ছিল। সংশয়ী পুরুষ।

: কি হ'ল ? অবাক প্রশ্ন করল সফি।

: হাত ছাড়ো।

: না। সে যেন তার পুরানো অধিকার বোধটা ফিরিয়ে আনতে চাইলো।

: না কেন ?

: আমার একটা কথা শুনে যাও।

: তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। অভিমানী কণ্ঠ তার।

: জমিলা!

: তুমি মিথ্যে বেগমসাহেবাকে অপমান করেছো। সে তার দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করল।

: মিথ্যে?

: হ্যাঁ, মিথ্যে ভুল। যা জেনেছো সত্যি নয়, যা জানো না তাই সত্য। সে সত্য আমি জানি। কেউ জানতে চায়নি। বুঝতে চায়নি।

: সত্যি?

: সত্য বলেই বলছি। আমি যে সব জানি।

: কি জানো?

: তোমরা জানো, সবাই যা জানে, বলে, তা সত্য নয়—মিথ্যে, ভুল! ভুল! সংসারের ভুল, মানুষের ভুল! যে ভুলের মনে আমরা অন্ধ। মানুষ অন্ধত্ব ভালোবাসে। ভুলের মোহে চলাই তার আনন্দের। সত্যের নির্মম প্রকাশে যে বাস্তবের রূঢ় আঘাত। সহ্য করার শক্তি আমাদের কম। আমরা আত্ম-বিশ্বাস হারা।

জমিলার সত্য সফিরও। সে ক্ষমা প্রার্থী। বলল: আমার অন্যায় হয়েছে। আমি ভুল করেছি। অপরাধ করেছি। অনেক ভুলের পাহাড় জমেছে আমার বুকে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো জমিলা।

ক্ষমা! সফি অপরাধ স্বীকার করেছে। ভুলের ক্ষমা আছে। ভুল তো মানুষেই করে। ভুলের ক্ষমাও আছে। জমিলা তাই বলল, তুমি জানো না তিনি কতো ভালো। অটুট বিশ্বাস তোমার প্রতি তাঁর। কতো ভালোবাসেন তিনি তোমাকে। বলেন, এ জিন্দেগিতে খোদা আমাকে লেড়কা দেননি। আমি যদি পরজন্মে মা হ'তে পারি, এ জন্মের প্রার্থনা আমার তিনি যেন সফির মতো একটা লেড়কা দেন।

আনন্দে অধীর সফি দু'বাহুর বন্ধনে জমিলার হালকা নরম শরীরটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। জমিলা বাধা দেয়নি, জোর

করেনি, শুধু ওর বিশাল বুকের মধ্যে কেঁপেছিল থর-থর। আবেশে বন্ধ আঁখি।

কিন্তু কি যেন হয়েছিল সফির। জমিলাকে ছেড়ে দিয়েছিল। দূরে সরে গিয়েছিল।

: কি হ'ল? জানতে চেয়েছিল জমিলা।

সফি কথা বলতে পারেনি। জমিলার মুখের দিকে চায়নি। নিজেকে তার অত্যন্ত হীন ছোট মনে হয়েছিল। অধিকার হারিয়েছে। জমিলার মহব্বতের বিশ্বাসের অবমাননা করেছে। জমিলার সামনে আজ আর দাঁড়াবার ক্ষমতা তার নেই।

ব্যাকুল হয়েছিল জমিলা। কাছে আসতে চেয়েছিল। সফির হাত ধরেছিল। মুখের দিকে চেয়ে আবার জানতে চেয়েছিল: কি হ'ল তোমার?

সফি চুপ করেছিল। ভেবেছিল। ভুল বোঝার সর্বনাশ ঘটেছে তাদের। তারা এগিয়ে গেছে। শেষ হয়েছে তিক্ততা। মধুর স্বপ্নের ঢেউ। যৌবনের দুরন্ত উচ্ছ্বাস।

সে উচ্ছ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছিল সফি। অপরাধীর স্বীকারোক্তি। বুকের পাষাণ ভারটা অসহ্য!

বলল: জমিলা, আমি তোমাকে আমার সব কথা বলতে চাই।

: আমি শুনতে চাই না।

: আমাকে যে বলতেই হবে।

: কী হবে শুনে?

: সে বিচার পরে কোর। আমাকে তুমি বলতে দাও।

: থাক না।

: না, জমিলা।

: বলবে?

: হ্যাঁ, বলবো। আমি বলতে চাই।

: বেশ, বল। জমিলাও সংযত করলো নিজেকে। কিন্তু বুক

কাঁপলো ওর। দুরন্ত স্পন্দন। অমঙ্গলের ছায়াটা যেন এগিয়ে আসছে। সোনা ঝরা রোদ্দুর। একটু মেঘের ছায়াও যেন উঁকি দিচ্ছে আকাশে। সফি ভাবছে। একটা দ্বিধাগ্রস্ত মানুষ। যে জীবন চেয়েছিল, সুখ চেয়েছিল, লালায়িত হয়েছিল শান্তির জন্যে। পেল না। কেড়ে নিল। হারিয়ে গেল। কিছু নেই তার।

ঃ তুমি আমাকে পেয়ার কর জমিলা?

অবাক সে। এই শুধু এই বলতে চায়। বোকা পুরুষ জানতে চায়, বারবার শুনতে চায়। পরীক্ষা করে নেয়। বোঝার শক্তি তার নেই। সব পেয়েও চায়। আরো—আরো—আরো।

জমিলা! আবার সেই কণ্ঠ। ধীর গম্ভীর।

ওকে দেখলো জমিলা। দৃষ্টি শূন্য। তাকে বলতে হবে। বিশ্বাস করাতে হবে। বললে ঃ একথা কেন?

ঃ আমি জানতে চাই।

ঃ কেন?

ঃ জমিলা!

ঃ তুমি বুঝতে পার না?

ঃ আমি শুনতে চাই।

ঃ করি।

ঃ আমাকে ঘৃণা করতে পার?

ঘৃণা! একি বলছে ও? ঘৃণা কি ভালোবাসাতে পারে? পারে না। যতো আঘাতই ও দিক তবু, তবু পারে না। মরে গেলেও পারবে না।

ঃ জমিলা!

ঃ তুমি ওকথা বলছ কেন?

ঃ তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পার?

ঃ কেন, ঘৃণা করবো কেন?

ঃ আমি যদি ভুল করি, অন্যায় করি?

ভুল—অন্যায়? মাথা নাড়ল জমিলা। ভুলের ক্ষমা মানুষ হয়তো করতে পারে, অন্যায়ের বিচারতো খোদাতালার হাতে। না বললে : না।

: কেন পার না?

: আমি যে তোমাকে চিনি। তোমাকে বিশ্বাস করি, ভালোবাসি। তুমি কোনো অন্যায় করতে পার না।

: এতো বিশ্বাস?

: হ্যাঁ।

: এ বিশ্বাস তুমি কোথায় পেলে। কেমন ক'রে আহরণ করলে?

হাসি ফুটলো জমিলার মুখে। ম্লান বিষণ্ণ। বললে : এ বিশ্বাস-টুকু তো তুমিই এনে দিয়েছো।

: আমি?

: হ্যাঁ, তুমি। বললে জমিলা। মনের কথা উজাড় করে দিল, একটা বাঁদীর অন্ধকার জীবনাকাশে তুমিইতো এনে দিয়েছিলে দিনের সূর্যের আলো। অন্ধকারের মাঝে বিশ্বাসের মন্ত্রতো তুমিই শুনিয়েছিলে। ভালোবাসতে শিখিয়েছিলে। ঘৃণা করতে নিষেধ করেছিলে।

: জমিলা।

: হ্যাঁ ভাই। জমিলার কণ্ঠটা দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসে অটল। বললে : তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো, বাঁচতে শিখিয়েছো। আমিও যে মানুষ, শুধু মানুষ নই, রক্ত-মাংস-প্রাণ দিয়ে গড়া একটা মানুষ একথা তুমিই আমাকে প্রথম ভাবতে শিখিয়েছো। সুলতানের হারেম, লোভ, লালসা আর নরককুণ্ডের একটা বাঁদী জমিলা নিজেকে মেহেরবান খোদার দুনিয়ায় শুধু বাঁদী নয় নিজেকে মানুষ ভাবতে শিখেছে। সেই আমি মানুষকে ঘৃণা করি কেমন ক'রে, কোন্ অধিকারে?

বিভ্রান্ত সফি। কি বলবে সে! কি বলতে পারে? তবু বললে : তবু যে ঘৃণিত অপরাধী তাকে তুমি ঘৃণা করবে না?

: না। দীপ্ত উত্তর জমিলার।

: কেন?

: কেন? বেদনায় ম্লান হ'ল জমিলার দুই চোখ। ম্লান ব্যথাতুর কণ্ঠে বললে : আমি তাকে ঘৃণা করবো না। আমি তার জন্যে খোদার দরবারে আর্জি জানাবো। মেহেরবান খোদা যেন তাকে দোয়া করেন। অন্যায়ের অন্ধকার থেকে সত্যের আলোয় যেন পৌঁছে দেন তাকে। আমি বলবো……

বাধা দিল সফি। বলল : আমার প্রতি তোমার বিশ্বাসটা কতো বড় ভুল, মিথ্যা জানো না বলেই তুমি এমন কথা বলতে পারছো জমিলা। তুমি জানো না আমি কতো বড় বিশ্বাসঘাতক, বেইমান। একটু চুপ করল সফি। উত্তেজনায় থর থর ক'রে কাঁপছিল সে। একবার আত্মবিশ্বাসী মেয়েটার দিকে চাইলো। বললে : জানো জমিলা, আমি সুলতানকে খতম করবো ব'লে কথা দিয়েছি।

: না—না। তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার ক'রে উঠল জমিলা।

: গৌড়ের-মসনদটা আমি নজরবিবিকে দোব বলেছি।

: নজরবিবিকে?

: হ্যাঁ, নজরবিবিকে। আর কেন জানো, নজরবিবি তার দেহ-যৌবন আমাকে ভোগ করতে দিয়েছে।

: ছিঃ।

: জমিলা!

: তুমি হীন।

: জমিলা!

তুমি—তুমি…। কথাটা শেষ করতে পারল না জমিলা। তার পৃথিবীটা—তার একান্ত বিশ্বাসের পৃথিবীটা তার সমস্ত স্বপ্ন, ঐশ্বর্য মুহূর্তে ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেল। দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে ছুটে পালিয়ে গেল সে।

আর সেই মুহূর্তেই হেসে উঠল সফি। একজন পরাজিত জীবন-

যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত মানুষ। পদে পদে ভুল-করা একটা প্রাণ। উল্লাসে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে চাইলো সে।

কিন্তু একি! দু'চোখ ছাপিয়ে অশ্রু কেন! কিসের কান্না! ব্যর্থতার—পরাজয়ের?

বুকটা শূন্য—হালকা। মনটা শান্ত যেন। সে মুক্ত। আকাশ, আলো, সমুদ্র তার মনে। জমিলার পেয়ার তার অনাগত দিনের স্মৃতি-সান্ত্বনা!

॥ সতেরো ॥

সুলতান ফিরে এসেছেন। সৈফুদ্দীন ফিরোজশাহ্। গৌড়ের প্রথম সুলতান। সুলতান রুকনুদ্দীন বারবকশাহ্ তাঁর একুশ বছরের রাজত্বকালে হাবশী মুল্লুক থেকে যে আশি হাজার হাবশী গৌড়ে নিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে ভাগ্যবান একজন।

শিকার থেকে ফিরে মসনদে বসেছেন সুলতান। দরবার গৃহ আবার আমীর, ওমরাহ্, সৈন্য, সেনাপতিদের ভিড়ে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সকালের নমাজ শেষ ক'রেই দরবারে এসে বসেন সৈফুদ্দীন। রাজ্যের খোঁজ-খবর নেন, অভাব-অভিযোগ শোনেন। বিচার করেন, শাস্তি দেন। পুরস্কারের হাতও এগিয়ে যায় যোগ্য ব্যক্তিদের দিকে।

অনেকগুলো দিন সফির কোনো কাজ ছিল না। সুলতান পাইক সর্দার জামালখাঁর আমন্ত্রণে শিকারে গিয়েছিলেন। সফির জিন্দেগিটায় বহে গিয়েছিল সর্বনাশের ঘনঘটা। একের পর এক। বাঁচার চেষ্টা করেও পারেনি। বার বার ব্যর্থ হয়েছে।

বেগমসাহেবাকে ভুল বুঝেছে। জমিলাকে হারিয়েছে। নজর-বিবি তার জীবনের চরম সর্বনাশ করেছে। সিদ্দিবদর ভয় দেখিয়ে বশে রাখতে চেয়েছে।

আজ মেঘ কেটেছে। ভয় কিংবা আশংকার কোনো সম্ভাবনাই

নেই। সিদিবদর ঘুরে যায়। দেখা হ'লে কি যেন বলতে চায়। সফি পালিয়ে আসে। হাবশী শয়তানটাকে বড় ভয় করে সে। ওর অসাধ্য কোনো কাজ নেই। ওকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। হয়তো তালে পেলে জিন্দেগিটাই খতম ক'রে দেবে।

নজরবিবির কোনো খবর আর পায় না। নাসিরুদ্দীন ফিরে আসার পর বাহারাম অপরিচিত হয়ে গেছে। বড় সাবধানী খোজাটা।

সৈফুদ্দীন মসনদে বসেছেন। সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজশাহ্। গৌড়ের প্রথম হাবশী সুলতান। মানুষের বন্ধু। দীন-দুঃখী-দরিদ্রের একান্ত আপনার জন।

কিন্তু আগের সে মানুষটা যেন ইনি নন। শিকারে যাওয়ার আগের সেই মানুষটার সঙ্গে এঁর অনেক ফারাক। অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আগে সৈফুদ্দীনের মুখে সব সময় হাসি ফুটে থাকতো। সকলের সঙ্গেই মিষ্টি ব্যবহার করতেন। একমাত্র মসনদে বসার সময়টুকু ছাড়া কেউ ভাবতে পারতো না ইনিই সুলতান।

কারণ দরবার চলাকালীন সৈফুদ্দীনের ভিন্নরূপ মূর্তি। তার বিচার বড় কঠিন নির্মম। ক্ষমার অযোগ্য ব'লে যাকে মনে হোত কারো অনুরোধ উপরোধ তিনি কানে নিতেন না। ন্যায় বিচার করতেন। প্রয়োজন হ'লে কঠিন দণ্ড দিতেন।

আবার অনেক সময় অপরাধীকে ক্ষমাও করেছেন। তাকে সৎ হ'তে বলেছেন। সাবধান ক'রে দিয়েছেন।

এখন মসনদে বসেছেন। নির্দিষ্ট সময়েই দরবার শুরু হচ্ছে। কিন্তু আগের সেই তীক্ষ্ণতা কাঠিন্য বা কোমলতা তাঁর মধ্যে নেই। তিনি কিছুটা অন্যমনস্ক, ক্লান্ত। অভাব-অভিযোগ যেন ঠিকমত শোনেন না। সব শুনে বিচার করেন না। ন্যায্য বিচারেও যেন ভুল হয় কখনো-কখনো। অপরাধী মুক্তি পায়।

মুখেও হাসি নেই। সব সময় গম্ভীর। একটু চিন্তিত ভাব। কি এক অদৃশ্য চিন্তায় সব সময় যেন ডুবে থাকেন। ভুল হয় তাই বার বার।

সফি দেখেছে। সুলতানের এই বিপুল পরিবর্তনটুকু তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে চিন্তিত। সৈফুদ্দীনের জন্যে ভাবে সে।

ভাবে নিজের কথা। তার বদ নসিবটার কথা। শুধু ব্যর্থতা আর হাহাকার। প্রাণ ককিয়ে কেঁদে উঠতে চায়। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু পারে না। দু'পায়ে তার লোহার শিকল। কর্তব্যের নাগপাশে বন্দী প্রাণ।

জমিলার সঙ্গে কখনো দেখা হয়। যেন অপরিচিত দু'জন। কেউ কাউকে চেনে না, চিনতে চায় না। জমিলা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। কখনো বা ফিরে যায় মাঝ পথ থেকে।

ব্যথা জাগে। অন্তরটা হাহাকার করে ওঠে। জীবনটাকে দুর্বিসহ ব'লে বোধ হয়।

একসঙ্গে ওঠা-বসা, চলা-ফেরা। একদিন পরিচিত ছিল। আপন ছিল। আজ দূরে চলে গেছে। পর হয়ে গেছে দু'জনেই।

ভালো। ভালোই হয়েছে। খোদা ভালো করেছেন তাদের।

তবু একদিন পারেনি। জমিলার পথ রোধ করেছিল। বলেছিল : তোমার সঙ্গে ক'টা কথা ছিল।

: আমি শুনতে চাই না।

: কেন ?

জমিলা উত্তর দেয়নি। চুপ করেছিল।

: আমার কথাটা তোমাকে বলা প্রয়োজন বোধ করছি জমিলা। তোমাকে যতোক্ষণ না বলতে পারছি আমি শান্তি পাবো না।

তীব্র ঘৃণায় মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিলো জমিলা। চলে যাচ্ছিল।

: জমিলা ! ডেকেছিল সফি।

জমিলা দাঁড়ায় নি।

জমিলা আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই না। আমি···

জমিলা দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

কাছে এগিয়ে গিয়েছিল সফি। বলেছিল : যে ভুল, যে অন্যায় আমি করেছি তার জন্যে কারো কাছেই আমি ক্ষমা প্রার্থী নই। আমার ভুলের, অন্যায়ের শাস্তি খোদা নিশ্চয়ই আমাকে দেবেন। মেহেরবান খোদার সে শাস্তি আমি হাসিমুখে নিতে প্রস্তুত। তবে এটুকু বিশ্বাস করো, ভুলের বোঝা আর এ-জিন্দেগিটাতে বাড়াবো না। বেইমানী আমি করবো না। আর···

জমিলা আর শুনতে পারেনি। শুনতে চায়নি। সে এগিয়েছিল।

সফি বলেছিল। হেসেছিল। হাসতে হাসতেই বলেছিল, জমিলা : তোমার তো আমি অনেক উপকার করেছি। আমার একটা কথা শুনবে ?

জমিলা তার মুখের দিকে চেয়েছিল। হয়তো একটু অবাক হয়েছিল। হয়তো তার মনে হয়েছিল সফি নামের মরদটা তার আশিক বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছে। তার দিমাগ ঠিক নেই।

: জমিলা, আজ আমি ভাবি। তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আমার মগজ বিগড়ে যায়। তোমার অনেক ক্ষতি আমি করেছি। পেয়ারের ধোঁকা দিয়ে লুটতে চেয়েছি তোমার জওয়ানী। খোদা তোমাকে বাঁচিয়েছেন। তোমাকে রক্ষা করেছেন আমার হাত থেকে। বেইমানটাকে, কুত্তাটাকে তুমি ক্ষমা কোর না জমিলা। তুমি খোদাকে ডেকো, বোল বেইমান কুত্তাটা তার অন্যায়ের অপরাধের যেন শাস্তি পায়। তিনি যেন ভুলেও ক্ষমা না করেন।

আর দাঁড়ায়নি সফি। দেখতে চায়নি জমিলা কি করে। ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

তারপরও দিন কেটেছে। সূর্য উঠেছে অস্ত গেছে। আকাশের গায়ে রঙ লেগেছে। বিচিত্র বর্ণসম্ভারে সজ্জিত হয়েছে প্রকৃতি। মানুষের ঘরে ঘরে কর্মের আহ্বান।

রাতের প্রহরী সে। দিনে তার অখণ্ড অবসর। সে তার দিনের

হিসাবে মুক্ত। কিন্তু মুক্তি তার অসহ্য বোধ হয়েছে। হাঁফিয়ে উঠেছে।

কাজ, চাই—কাজ। কর্মের মাঝে নিজেকে লিপ্ত করতে চেয়েছে। বাঁচতে চেয়েছে। ভুলে থাকতে চেয়েছে। যন্ত্রণার হাত থেকে। কষ্টের হাত থেকে।

সুলতান সৈফুদ্দীন। রাতের প্রহরী সফি। অন্ধকার তার দিনের হিসাব।

কিন্তু সে মানেনি। রাত্রি দিনের ব্যবধান ঘুচিয়েছে। সুলতানের কায়ার সঙ্গে ছায়া হয়ে মিশে গেছে। সে বাঁচতে চায়।

বিস্মিত হয়েছেন সৈফুদ্দীন। প্রশ্ন করেছেন ঃ এ কেয়া ?

ঃ কী ?

ঃ দিন-রাত্রি আমার সঙ্গে রয়েছো কেন ?

ঃ সফি উত্তর দিতে পারেনি। চুপ করে থেকেছে।

ঃ কে বলেছে তোমাকে থাকতে ?

ঃ কেউ নয়।

ঃ তবে ?

ঃ আমি নিজেই থাকি।

ঃ কেন ?

আবার চুপ ক'রে থেকেছে সে। মাথা নিচু করেছে।

সৈফুদ্দীন তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। কি এক আশংকা আর সন্দেহের ছায়া খেলে গেছে মুখে। ডেকেছেন ঃ সফি!

সফি তাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে চেয়েছে।

ঃ সাচ বলছো কেউ তোমায় আমার সঙ্গে থাকতে বলেনি ?

ঃ কে বলবে ?

ঃ তাই জিজ্ঞাসা করছি

ঃ না, জাঁহাপনা।

ঃ তাহলে ?

: আমাকে থাকতে দিন আপনি। অনুনয় করেছে সে।

তবু যেন বিশ্বাস হয়নি তাঁর। সন্দেহ দূর হয়নি। বলেছেন : কেন থাকবে ?

: আমি আপনার কাছে থাকতে চাই জাঁহাপনা!

: দিন—রাত ?

: হ্যাঁ, জাঁহাপনা।

: তোমার কষ্ট হবে। তুমি ছেলেমানুষ।

: আমি ঠিক পারবো।

: বেশ!

কি ভেবে রাজী হয়েছিলেন। তবু যেন সন্দেহটা দূর হয়নি।

সফি বেঁচেছে। দিন-রাত্রি সুলতানের সঙ্গে থাকে। সর্বদা সতর্ক। ফলে আহার-নিদ্রা গেছে। ক'দিনেই দুর্বল হয়েছে শরীর। তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্য ম্লান। চোখের কোলে কালি পড়েছে। ক্লান্ত অবসন্ন সে। তবু আপন কাজে এতোটুকু অবহেলা নেই।

বাবুর্চি বুড়ো বলেছে : একি করছিস্—তুই সফি ?

: কি করছি ? কৌতুকে হেসে উঠেছে সফি।

: নিজের দিকে চেয়ে দেখেছিস্ ?

: তুমি তো দেখেছো।

: কার ওপর রাগ করে এমন কষ্ট পাচ্ছিস্ ?

: কে বললে আমি কষ্ট পাচ্ছি।

: আমি বলছি : আমি জানি তোর কষ্টের কথা। কেন তুই অমন করছিস্।

: এই যে আমার কাজ।

: কাজ নয়, নিজেকে শেষ করা। খতম হয়ে যেতে চাস্ তুই ?

: কে বললে ?

: সফি, এর নাম মৃত্যু।

: না—না!

না নয়—হ্যাঁ। পাগলামী ছাড়! তুই যে মরে যাবি। আমার কথা শোন্। : মিথ্যে তুমি চিন্তা করছো।

: মিথ্যে! না সফি আমি মিথ্যে বলছি না। মাথা নেড়েছিল বুড়ো। অস্বীকার করেছিল। বলেছিল : আমি যে তোকে চিনি। তোর কিছুই আমার অজানা নয়। এখান থেকে বহুত দিন আমি বাইরে যাইনি। মসনদটাতে বসে ক'জন সুলতান হ'ল মরলো তাও দেখিনি। লেকিন সব কিছুই আমি জানতে পারি। সুলতানী খতমের দিন ঘনিয়ে এলে আমিই আগে বুঝতে পারি।

সফি কথা না বলে চুপ করেছিল। সে দৃঢ়প্রতীজ্ঞ।

বুড়ো বলেছিল, আমার একটা কথা শুনবি?

সফি মুখের দিকে একবার চেয়েছিল শুধু। না—বা—হ্যাঁ কিছুই বলেনি। তার ভাল লাগছিল না।

: বুড়ো বলেছিল, ফিরে জবাব দিচ্ছিস না কেন?

: কি বলবো?

: আমার কথা শুনবি নাকি?

: তোমার কথাটা কি?

: লেড়কিটাকে তুই সাদী কর।

: সাদী! চমকে উঠেছিল সফি।

হ্যাঁ, সাদী! বলেছিল বুড়ো, নিয়ে ভেগে যা একদিন। আমি তোর থাকার জায়গা ঠিক করে দোব।

সফি কথা বলেনি। বুড়োকে তার পাগল বলে মনে হয়েছিল।

কি রে যাবি? একটু পরে জানতে চেয়েছিল বুড়ো।

না। স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল সফি।

: কেন?

: আমি পারবো না।

কেন পারবি না? জোর করেছিল বুড়ো। বলেছিল, একটা জোয়ান মরদ হয়ে একথা কেমন করে বললি তুই?

ঃ সে আমাকে ঘৃণা করে।

ঃ ঘৃণা করে ?

ঃ হ্যাঁ।

একটু চুপ করেছিল বুড়ো। সফির মুখের দিকে অনেকক্ষন চেয়ে চেয়ে দেখেছিল। বলেছিল, ঝুট বলছিস তুই।

ঃ না।

ঃ সে তোকে পেয়ার করে।

ঃ না।

ঃ তুই জানিস না।

জানি, আমি জানি। চিৎকার করে উঠেছিল সফি। তার অসহ্য বোধ হয়েছিল। বলেছিল, আমি জানি সে আমাকে ঘৃণা করে। আমাকে শয়তান ভাবে, বেইমান ভাবে।

সফির সে মূর্তি দেখে অবাক হয়েছিল বাবুর্চি বুড়ো। ভয় পেয়েছিল। অনেকক্ষন কথা বলেনি আর। ওকে শুধু দেখেছিল। ওর কথাটা ভেবেছিল। তারপর একসময় বলেছিল, এ তুই কি বলছিস সফি ?

সফি কথা বলেনি। উত্তর দেয়নি। নিজেকে তার বড় ক্লান্ত অবসন্ন বোধ করেছিল। ঘুমাতে চাইছিল সে। রাজ্যের ঘুম তার হুচোখের পাতায় নেমে আসছিল। বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল।

বলেছিল, আমি ঘুমাবো।

বাবুর্চি বুড়ো ওকে শুইয়ে দিয়েছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিল ও। নিশ্চিন্তে। শিশুর মত।

তবু ঘুমাবার আগে জমিলার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল একবার। ম্লান ঃ বিষণ্ণ একখানা মুখ।

ওর অন্তরটা প্রার্থনা জানিয়েছিল খোদার কাছে। নিজের জন্যে নয়, দুঃখী-মেয়েটার জন্যে। ও যেন মুক্তি পায়, সুখী হয়। দুঃখের আঁধার যেন সুখের আলোয় পূর্ণ-উজ্জল হয়ে ওঠে।

এমনি দিনে। সফির সেই দুঃখের দিনে নাসিরুদ্দীন এলো।

অবসর মিলেছিল সফির। সৈফুদ্দীন একরকম জোর করেই তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সফি চায়নি। ছুটির কোন প্রয়োজন ছিলনা তার। তিনি শোনেন নি।

আস্তানায় ফেরেনি সে। বাবুর্চি বুড়ো সেখানে আছে। স্নেহের শাসনে একটা শয়তানবুড়ো অপেক্ষা করছে সেখানে।

আকাশে দিন শেষের সূর্য। কোলাহল মুখর পথ। নির্জনতা খুঁজছিল সে। এগিয়ে গিয়েছিল। সরল রেখায় যে পথ হারিয়ে গিয়েছে দূরান্তরে।

সে মন নেই। সে দিনগুলো হারিয়ে গেছে। ফিরবে না কোন দিন। যা হারায় তা বুঝি আর খুঁজে পাওয়া যায়না কোন দিন।

সফি হারিয়ে ফেলেছে। সর্ব্বস্ব খোয়া গেছে তার। কিংবা ইচ্ছা করে বা ভুল করে সে তার সব হারিয়ে বসে আছে।

বঞ্চিত একটা প্রাণ। একটা সর্ব্বহারা জীবন। তবু স্বপ্ন দেখেছিল মন। ভুল স্বপ্ন—মিথ্যা স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখে দুর্ব্বলের দল। আপন অধিকার কেড়ে নেয়, ছিনিয়ে নিতে জানে কঠিন পৌরুষ। তার নসিবে কলঙ্কের ডালি।

অদূরে ভাগিরথীর কূলু কূলু ধ্বনী। নদী ছুটে গেছে আপন গতিতে। সমুদ্রের স্বপ্ন তার বুকে। সে স্বার্থক হতে চায়। পূর্ণ হতে চায়।

আকাশের সূর্যটা তেমনি উজ্জ্বল। দিন শেষের বিলম্ব আছে। পাখীদের নীড়ে ফেরার সময় হয়নি। সঞ্চয়ী চড়ুই শুধু খুঁজে ফিরেছিল। একটী 'বউ কথা কও' ডাকছিল দূরে গাছের ডালে বসে।

সফিও বসেছিল। নদীর স্রোত, অবাধ এলো মেলো হাওয়া বার বার ছুটে আসছিল। লুটোপুটি খাচ্ছিল। সফি শুধু বসেছিল।

হঠাৎ চাপা কণ্ঠে কে যেন ডেকেছিল, দোস্ত!

চমকে উঠেছিল সফি। তার বন্ধু আসছে।

কি করছো? হাসতে হাসতে এগিয়ে এসেছিল নাসিরুদ্দীন। সাধারণ বেশ তার। বড় চালাক শাহজাদা। দিনের আলোয় সতর্কতা।

পাশে এসে বসেছিল নাসিরুদ্দীন। সামান্য দূরত্বে। সফি শুধু একবার তাকে দেখেই নদীর বুকে আপন দৃষ্টিটাকে মেলে দিয়েছিল।

অনেকক্ষন বসেছিল নাসিরুদ্দীন। দেখেছিল হয়তো তাকে। সফি লক্ষ্য করেনি। নাসিরুদ্দীন বলেছিল, কি করবে?

আশ্চর্য হয়েছিল সফি। ভাবতে পারেনি এমন প্রশ্নটা শাহজাদা তাকে করবে। বলেছিল, কী করবো?

হেসেছিল নাসিরুদ্দীন। বলেছিল, এর মধ্যেই ভুলে গেলে?

ভুলে যাবনা এমন কথা কি কিছু বলেছিলুম? পাল্টা প্রশ্ন করেছিল সফি।

তা বটে! গম্ভীর হয়েছিল নাসিরুদ্দীন। অনেকক্ষন চুপ করে ছিল এক সময় তার গলাটা শোনা গিয়েছিল, এই শেষ কথা?

সফি তার দিকে ফেরেনি। নির্বিকারভাবে বলেছিল, আপনার কি মনে হয়?

সফি! যেন চাপা গর্জনে ফেটে পড়তে চেয়েছিল নাসিরুদ্দিনে। চিৎকার করে উঠতে চেয়েছিল। কালো মুখখানা তার অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল।

সফি ভয় পায়নি। শান্ত কণ্ঠে বলেছিল, আমি সুলতানের গোলাম।

: আউর কুছ?

: আর কি?

: তাইতো জানতে চাইছি।

সফি কথা বলেনি। সেই মুহূর্তে তার মনে পুরোনো ক্ষতটা জেগে উঠতে চাইছিল। যা অস্বীকার করা, কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেওয়ার সাধ্য তার নেই। সে নাসিরুদ্দিনের কাছে থাকতে চাইছিল

না। এখানে নদীর ধারে কেউ তাদের এসে দেখুক এই কামনা করছিল।

কেউ আসেনি। তাকে উদ্ধার করেনি।

নাসিরুদ্দিন অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়েছিল। ইস্পাতের মত ধারালো হয়ে উঠছিল তার চোখ দুটো। কি যেন বলতে চায়, অথচ পারছে না। শুধু ফুলে ফুলে উঠছে চাপা আক্রোশে, ব্যর্থতায়।

দিনের সূর্যটা ম্লান হচ্ছিল। মিলিয়ে যাচ্ছিল আলো। পাখীর ডাক আর শোনা যাচ্ছিল না। মানুষের কোলাহলও স্তিমিত।

নাসিরুদ্দিন পাগল। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। মসনদের দুর্ব্বার আকর্ষণ তাকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করেছে। ভুলিয়েছে কৃতজ্ঞতাবোধ। সৈফুদ্দীন কেউ নয় তার, অথচ অনেকে। রক্তের সম্পর্ক নেই স্নেহের বাঁধনে বাঁধা।

মসনদ সব ভুলিয়েছে। লোভ আর লালসা। রক্তে যদি সিক্ত হয় মাটির বুক, হোক না। অন্নদাতা, জীবনদাতার ঋণ মসনদের অধিকারে তুচ্ছ। সত্য মসনদ তার অধিকার; আর সব মিথ্যা, মনের দুর্ব্বলতা।

এইতো চলছে। দিনের পর দিন। অতীতে হয়েছে, আজ হবে, আগামী দিনেও হয়তো···নাসিরুদ্দীন বলেছিল, মসনদটা আমার চাই।

সফি কথা বলেনি। চুপ করেছিল।

মসনদটা তার চাই। গৌড়ের মসনদ। যে মসনদে বসে সুলতান বানবে সে। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, মানুষের ভাগ্য বিধাতা। একটা মানুষ আর পাঁচটা মানুষের মতই তার আকৃতি। এতটুকু বৈশিষ্ট নেই। এখন সে সাধারণ একটা মানুষ। যদিও সে শাহজাদা। কিন্তু জন্মসূত্রে নয়। দয়া মায়া মমতা তাকে কুড়িয়ে এনেছে পথ থেকে। প্রাচার্য্য আর বিলাসিতার মাঝে বাঁচার সুযোগ দিয়েছে।

যদি জানতে পারে, সফির বিশ্বাস আজকের সৈফুদ্দীন যদি তাঁর সর্ববনাশের কথাটা জানতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আবার তিনি পথের মাঝে নামিয়ে দেবেন তাকে। আজ আর মায়া মমতা ক্ষমার প্রশ্ন উঠবে না তাঁর মনে। কারণ, আজকের সৈফুদ্দীন অন্য মানুষ! তিনি কিছু বলেননি : কেউ জানেও না। তাঁর মনের কথা, প্রকৃত কারণ; তবু তাঁকে দেখে মনে হয় দিন রাত্রি তিনি চিন্তিত—ভীত, দুর্ভাবনা জুড়ে আছে তাঁর দেহ মন। আতঙ্কের ছায়াটাও কবার কেঁপে উঠেছে চোখের তারায়।

আজ যেন জীবন ভয়ে ভীত সৈফুদ্দীন। দিশেহারা।

নাসিরুদ্দীন মসনদটা চায়। গৌড়ের অধিকার। সুলতানীর স্বপ্ন তার চোখে। ছুটে এসেছে তার কাছে। পাইকের কাছে। পাইক ভিন্ন সুলতানী মেলা শক্ত।

ছুটে এসেছিল সিদিবদর। আর এক শয়তান। যার অত্যাচারের ভয়ে মানুষ কাঁপে। তবু সেও ছুটে এসেছিল। সফি না হলে তারও সুলতানী মিলবে না। ফারাক নাসিরুদ্দীন লোভ দেখিয়ে ষড়যন্ত্র করে তাকে নিজের হাতে আনতে চায়। আর সিদিবদর দেখিয়ে দিল ভয়। ভয়ের মধ্যে ভরসার মুখোস এঁটেছিল মুখে। তবু শয়তানী চাপা দিতে পারেনি।

সফি বলেছিল : আমাকে মাপ করবেন আপনি। আমি পারবো না।

নাসিরুদ্দীন চুপ করেছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ছিল তার। একসময় পরাজিত কণ্ঠে বলেছিল, তোমাকে আমার কিছুই বলার নেই।

সফি চুপ করেছিল।

আমি বোধ হয় ভুল শুনেছি। ঝুট বলেছে আমাকে। খুব আস্তে যেন নিজের মনেই কথাটা বলেছিল সে। চমকে উঠেছিল সফি।

আর কিছু বলেনি নাসিরুদ্দীন। আশাহত মাতালের মত টলতে টলতে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিল তার ছায়াটা।

সফির মনে হয়েছিল, শেষ নয় সুরু। নাসিরুদ্দীন ক্ষান্ত হবে না। মসনদটা যে তার চাই।

॥ আঠারো ॥

সৈফুদ্দীন বেশ খুশি। মেজাজ সরিফ তাঁর। ঘুম ভেঙ্গে গবাক্ষের ধারে তাঁর নির্দিষ্ট আসনটায় বসেছিলেন। রাতের প্রহরী সফি দাঁড়িয়েছিল অদূরে।

ভোর হচ্ছে। মিলিয়ে যাচ্ছে রাতের আঁধার। পাখীরা ডাকছে। লালে লাল হয়ে উঠছে আকাশ বনানী প্রান্তর। রক্ত গোলাপের বর্ণে বিচিত্রিত প্রকৃতি।

সৈফুদ্দীন বসে ভাবছেন। খুশির চিন্তা তাঁর চোখে মুখে। আনন্দ সমুদ্রে অবগাহন করে উঠছে তাঁর দেহ-মন। শুদ্ধ-নির্মল।

হঠাৎ তিনি ফিরলেন। সফিকে দেখলেন। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে, হাসিমুখে। তারপর ডাকলেন, সফি ইধার আও।

সফি এগিয়ে গেল। দাঁড়াল তাঁর পাশে।

দেখো! সামনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

দেখল সফি। দূরে ভাগিরথী। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখতে পেল রঙের খেলা। বিচিত্র বর্ণের লুকোচুরি। বুঝতে পারলো সুলতান কেন রোজ ঘুম ভেঙে এখানে বসেন। কি দেখেন।

সৈফুদ্দীন হঠাৎ বললেন, তোমার সর্দারকে আমি খবর দিয়েছি সফি।

সফি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো শুধু। বুঝতে পারল না সুলতানের কথাটা।

সফির দিকে চেয়ে হাসলেন তিনি। বললেন, জামাল খাঁ এলে তোমার সাদী দেব আমি।

সাদী! চমকে উঠল সে। মনে হল কথাটা বুঝি ভুল শুনল সে। স্থলতান কি তাঁর সঙ্গে পরিহাস করছেন।

তার সেই বিহ্বল বিমূঢ় ভাবটা দেখে আবার হাসলেন তিনি। বললেন: বেগমের মর্জি! আমার কথা চলবে না। জমিলাকে সাদী করতে হবে তোমায়।

এখন সে স্থির। সব কিছু স্পষ্ট স্বচ্ছ-তবু……

এই তো চেয়েছিল সে। সে চাওয়ার মধ্যে কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। শুধুমাত্র দুঃখিনী মেয়েটার মুক্তি নয়। ওর নরম হালকা দেহটা, উষ্ণ কোমল হৃদপিণ্ডের ছোঁয়াও কাম্য ছিল তার। জমিলাকে চেয়েছিল মনে প্রাণে। একটা শান্ত সুখী নীড়ের স্বপ্ন দেখেছিল মন।

কিন্তু……

না, আর বুঝি তা সম্ভব নয়! আর দুজনের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি হয়েছে। দুস্তর ব্যবধান। যদিও এ ব্যবধান তার নিজেরই সৃষ্টি। তার ভুল, অন্যায়, অক্ষমনীয় অপরাধ। সে নিজেকে কলঙ্কিত করেছে। একজনের বিশ্বাস, ভালবাসা আর জীবন মন্ত্রের মূলে নির্মম কুঠারাঘাত হেনেছে।

না—না তাই বা কেন! পরক্ষণেই মনটা তার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইলো। সন্দেহ ঘনালো। জমিলার দর্পটা অসহ্য বোধ হ'ল। ভুল সে করেছিল। ক্ষণিকের দুর্বলতা। কিন্তু সে তার সেই অন্যায় অপরাধ তো ঢেকে রাখতে চায়নি। লুকিয়ে রাখতে পারতো। সে তা চায়নি, পারেনি। আর সেই জন্যেই মনের দ্বার খুলেছিল। সত্য প্রকাশ করেছিল। তার যন্ত্রণাকাতর মনটাকে তুলে ধরেছিল। আশ্রয় আর আশ্বাস কামনা করেছিল। যে অন্যায় আর ভুল সে করেছে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে।

ভুল বুঝলো জমিলা। দূরে ঠেলে দিলো। তীব্র ঘৃণা আর অবজ্ঞায় তার পৌরুষকে ছিঃ ছিঃ করে উঠলো। ভুল বোঝা, অনুশোচনা, প্রতিজ্ঞায় দগ্ধ হওয়া সফি জমিলার কাছে ফিরে যেতে গিয়েও পারল না। পথ রুদ্ধ। অভিমান নয়, ঘৃণা আর অবজ্ঞা দিয়ে জমিলা নামের মেয়েটা সব পথই রুদ্ধ করে দিয়েছে। সে রুদ্ধ পথের কঠিন পাষাণে সফি আর কোনদিনই মাথা কুটতে যাবে না। কারণ সে জেনেছে, চিনেছে, তার পথ ভিন্ন। জমিলাকে ভালবেসে ভুল করেছে সে। নারীর রূপ, যৌবন মায়ার বাঁধনে নিজেকে আর ধরা দেবে না কোনদিন। কঠিন প্রতিজ্ঞা তার।

কিন্তু, সুলতান শোনালেন ভিন্ন কথা। যদিও সে কথা তাঁর নিজের কথা নয়। বেগম বলিয়েছেন তাঁকে। বেগমের মর্জি। ওদের সাদি দিবেন তিনি।

ঃ কিন্তু কেন ? কোন উদ্দেশ্যে ?

সুলতান এখন কিছুটা অন্যমনস্ক। সর্দারের কোন পাত্তা নেই। অথচ এসময় সর্দারের একবার আসা প্রয়োজন ছিল। সফির মনে আজ অনেক সমস্যা। সমাধানের পথ তার অজানা। জানেনা শেষ পর্যন্ত কি হবে ? সর্দার আসবে কি—না। যদি না আসে বেগমের মর্জি সে-কি মেনে নেবে ?

মনে পড়লো নজরবিবির হুঁশিয়ারী। বেগম শয়তানী। নজরবিবি তার ভাল চায়। যদিও……

সেদিনের স্বপ্ন শিহরণ আজ অনেকটা বিস্মৃত হয়েছে সফির। নজরবিবির দেহটা সেদিন তাকে তৃপ্ত করেছিল। দেহের সমস্ত ক্লান্তি বিতৃষ্ণা, জ্বালা ক্ষণিকের আনন্দ তৃপ্তিতে ধুয়ে মুছে দিয়েছিল। কিন্তু যন্ত্রণা,—অশান্ত মনটার দাহ নেভেনি। ক্ষত বিক্ষত আকাঙ্ক্ষা, পঞ্জীভূত বেদনার শরিফ—একটা গোটা মানুষ, সফির মনটা যেন আরও লোভি হ'য়ে উঠেছিল।

নজরবিবিই শুনিয়েছে নতুন কথা। মসনদ সুলতানের নয়।

সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারের হাবসী সৈফুদ্দীনের কোন এক্তিয়ার নেই গৌড়ের মসনদে।

মসনদে কোন অধিকার নেই সৈফুদ্দীনের। সৈফুদ্দীন কেউ নয়। মসনদ সফির। এদেশের জল-হাওয়া, মাটি-আকাশ, প্রকৃতি তার আত্মার আত্মীয়। সেই সম্পর্ক বিস্মৃত হ'য়ে, আপন অধিকার হারিয়ে কেন সে বিদেশী সৈফুদ্দীনের গোলামী করবে। নিজের জানের বিনিময়ে কেন তাঁর জান বাঁচাবে?

প্রতিদিন। দিনের পর দিন। তিনি ঘুমান। স্ফূর্তি করেন। জানানা নিয়ে। সরাব খান। আর সে সারারাত না ঘুমিয়ে জেগে মাতাল অচৈতন্য দেহটাকে পাহারা দেয়। কারণ সে গোলাম। নিজের দেশের মাটিতে বিদেশীর কাছে লিখে দিয়েছে গোলামীর দাসখৎ। গোলামীর নোকরী নিজের পেটের দায়ে।

ক'দিন এই চিন্তাটা কেবলই মনে উদয় হয়েছে। দূর করতে চাইলেও পারেনি। অস্থির হয়ে উঠেছে দেহে মনে।

ঃ মসনদ কার? হাবশী সৈফুদ্দীনের?

ঃ কভি নেহি।

মসনদ সৈফুদ্দীনের নয়। নাসিরুদ্দীনেরও নয়। সেইজন্যেই তাকে হটিয়ে দিয়েছে। সেও হাবশী। এ দেশের মাটিতে পয়দা হলেও হাবশী রক্ত তার শরীরে। এ দেশের কোন কিছুতেই তার কণামাত্র অধিকার নেই।

নেই সিদিবদরেরও। সেও হাবশী। একটা শয়তান।

সফি যদি কোনদিন পায় তাকে······

ঃ ক্যা শোচতা সফি। প্রসন্ন মুখে জানতে চাইলেন সৈফুদ্দীন।

ঃ এঁ্যা! চমকে উঠলো সফি।

ঃ ক্যা শোচতা?

ঃ কুছ নেহি জাঁহাপনা। সতর্ক হ'ল সে।

: কুছ নেহি? হাসলেন তিনি।

: জী!

: সবের সে তুম হামেশা শোচতা?

: আমি?

: হ্যাঁ, আমি দেখছি। কি ভাবছো তুমি?

সফি ভাবছে। সফি চিন্তা করছে আজ। সৈফুদ্দীন তার সাদীর কথাটা বলার পর থেকেই। বেগম বলেছেন জমিলার সঙ্গে সাদী দেবেন তিনি।

কথা শোনার পর থেকেই চিন্তা শুরু হয়েছে তার। অসম্ভব! এ হতে পারে না। জমিলাকে মুখ দেখাবার অধিকার হারিয়েছে সে। জমিলার সামনে সে দাঁড়াতে পারবে না।

ছুটি দিয়েছিলেন সুলতান। সফি পালিয়ে বেঁচেছিল। জমিলার মুখোমুখি হতে চায়নি। দেখা হয়ে যাওয়ার লজ্জা এড়াতে চেয়েছিল।

বাবুর্চি বুড়ো বলেছিল, কিরে কি হ'ল তোর?

সফি কথা বলেনি। উত্তর দেয়নি।

: আজ দরবারে যাসনি?

: না।

: কেন? জানতে চেয়েছিল বুড়ো। কারণ সকালে সফি দরবারে যায়। সৈফুদ্দীনের সঙ্গ ছাড়ে না। শুধু দুপুরে একবার খেতে আসে। একটু বিশ্রাম নেয়। আবার চলে যায়। সতর্ক প্রহরী তার কাজ করে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবুর্চি বুড়ো আবার বলেছিল, ভবিষ্যৎ খারাপ?

: না।

: তবে কি হয়েছে তোর?

কি হয়েছে! সফি জানেনা। সফি ভাবছে। সমস্ত দিন। ভবিষ্যৎ স্বপ্নটা একবারও উঁকি দেয়নি মনে। মনে হয়েছে......

নজরবিবির কথাটাই বার বার মনে পড়েছে আজ তার। নজরবিবির সাবধান বাণী। সৈফুদ্দীন কেউ নয়। কোনো অধিকার নেই তার গৌড়ের মসনদে।

মসনদ সফির। সে-ই ন্যায্য অধিকারী। মসনদটা তার।

: সফি! ডাকলেন সৈফুদ্দীন।

: জাঁহাপনা!

: এধার আও।

সফি এগিয়ে গেল। কক্ষের মাঝখানে দাঁড়াল। সৈফুদ্দীন শুয়ে আছেন। বললেন, তোমার সাদী করতে মন নেই?

: না—না।

: তবে?

সফি চুপ করে রইলো।

: তাহলে কি হয়েছে তোমার। কি ভাবছো?

সফি নীরব।

তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি তো রয়েছি। শোচ মৎ। পাশ ফিরে শুলেন তিনি।

সফি তাঁর চোখ বাঁচিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। সুন্দর পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় সৈফুদ্দীনের হাবশী শরীরটা আজ বড় বেমানান লাগল চোখে।

অন্ধকার রাত্রি। আলো নেই। ঘুমিয়ে আছে পৃথিবী, মানুষ।

জাগ্রত প্রহরী সফি আজও জেগে আছে। আপন কর্তব্য করছে। কিন্তু আজ মনটা তার অশান্ত। সে ভাবছে। সেই সকাল থেকে চিন্তার সূত্রপাত তার মনে। অনেক চিন্তায় আলোড়িত আজ তার মনটা। অতীত : বর্তমান একাকার হয়ে গেল।

অনেক ভাবনার ভিড়ে সফির চিন্তাটা বাধাপ্রাপ্ত হ'ল। চমকে উঠল সে।

শুধু সুলতান নয়। বিদেশী স্বার্থ নয়। দেশের মানুষও স্বার্থপর। তাকে নিয়ে সকলেরই স্বার্থের খেলা।

জামাল খাঁ। পাইক সর্দার জামাল খাঁ। হিংস্র-লোভী-স্বার্থপর একটা মানুষ। দুনিয়ার আপন স্বার্থ ছাড়া যে কিছু করে না, করার কথা ভাবে না সেই মানুষটাই একদিন আনাহারক্লিষ্ট মৃতপ্রায় ছেলেটাকে পথ থেকে তুলে নিয়েছিল। দু'বেলা পেটপুরে খেতে দিয়ে জান বাঁচিয়েছিল।

স্বার্থ! নিজের স্বার্থে।

নিজের স্বার্থেই জামাল খাঁ তাকে বাঁচিয়েছিল। বাঁচিয়েছিল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই। জামাল খাঁ দূরদর্শী। তার প্রমাণ সে পেয়েছে।

অথচ সেই জামাল খাঁ-ই তাকে শুনিয়েছিল নতুন কথা। ভিন্ন সুর—ভিন্ন ভাষা তার। স্বার্থের নাম গন্ধ নেই।

সুলতানের জান বাঁচাতে হবে। বন্ধ করতে হবে নিত্য দিনের হত্যাকাণ্ড। রক্ষা করতে হবে দেশের মানুষকে। কারণ, মসনদে সুলতান হ'য়ে যেই বসুন না কেন, দেশটা তাদের। দু'দিন অন্তর মসনদ ঘিরে যদি এমন হত্যাকাণ্ড চলে, দেশের মানুষের দুর্গতির সীমা থাকবে না। মরবে গরীবরাই। মরে তারাই। জামাল খাঁ আর সফিরা যাদের মানুষ।

সেদিন সর্দারের কথাগুলো বিশ্বাস ক'রেছিল সফি। মেনে নিয়েছিল সর্দারের প্রতিটি আদেশ। মনে কোন দ্বিধা জাগেনি। এতটুকু সংশয়। কসম খেয়েছিল। পেয়েছিল জামাল খাঁর নতুন পরিচয়।

ঃ ঝুট! বিলকুল ঝুট !!

কে? চমকে প্রশ্নটা করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সফি।

কেউ নয়। কেউ নেই।

অন্ধকার রাত্রি। সুখ-শয্যায় নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাচ্ছেন

সৈফুদ্দীন। পাইক সর্দার জামাল খাঁ তাঁর সহায়। রাতের পর রাত জেগে জান বাঁচিয়ে চলেছে সফি। সামান্য একজন পাইক। যার কিছুই নেই, রিক্ত, নিঃস্ব। বর্তমানটা কঠিন নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। ভবিষ্যতের কথা সে জানেনা, ভাবেনি।

সে শুধু জানে তার কর্তব্য। তার একমাত্র চিন্তা মসনদলোভী শয়তানদের হাত থেকে সুলতানের জান বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সৈফুদ্দীনের জিন্দা না রাখতে পারলে জামাল খাঁর সর্দারী থাকবে না।

মসনদে বসবেন নতুন সুলতান, পাইক সর্দার নতুন।

স্বার্থ জামাল খাঁর আর সুলতানের। জামাল খাঁ স্বার্থপর। দেশের মানুষের কথা, গরীবদের জন্যে দরদ বিলকুল ঝুটা। তা যদি না হবে অন্যের জান নেওয়ায় অত নির্মম কেন জামাল খাঁ?

পথের বাধা, ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখলেই সরিয়ে দেয়। বুকের তাজা খুনে হাত রাঙায়। এক মুহূর্ত হয়তো স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে, পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ লক্ষ্যে দেখে আর কেউ আছে কি-না!

স্বার্থ! তাকে ধোঁকা দিয়ে দিনের পর দিন তলে তলে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে জামাল খাঁ। তাকে বুঝিয়েছে ভুখা মানুষের কথা।

বোকা সে, তাই এতদিন সর্দারের ধোঁকাবাজিতে ভুলেছিল। কিন্তু ভাবেনি, চিন্তা করেনি। পালন করেছে আদেশ। যা শুধু সর্দার আর সুলতানের স্বার্থে। দেশের মানুষের কথা মিথ্যা।

ভুল ভেঙেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে স্বার্থের ছবিটা। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে নজরবিবি। অতীতের নজর জান। কসবী একটা মেয়ে মানুষ। দেহপসারিণী। হয়তো একদিন পেটের দায়ে, অভাবের তাড়নায় বা ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে নোংরা জীবনটাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। শাহ্‌জাদার হারেমে উঠে এসেও সে তার স্বভাব ভুলতে পারেনি। সফির মুহূর্তের দুর্বলতায়

নরকে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার চেয়ে একটা কম উমরের ছেলে। প্রথম যৌবনের অধিকারী একটা পুরুষ।

উঠে এসেছে সে। নিজের চেষ্টায়। আপন মনোবলে। বিস্মৃত হয়েছে সেদিনটার মুহূর্তগুলোকে। কিন্তু……

তবু নজরবিবি তার অনেক করেছে। তাকে জাগিয়ে তুলেছে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে নগ্ন স্বার্থের ছবিটা। যেখানে একমাত্র সে-ই শুধু ব্যতিক্রম। তার কোন স্বার্থ নেই—লোভ। সকলের ভাল চায় শুধু।

অথচ সে যদি ইচ্ছা করে যে কোনো মুহূর্তে ছিনিয়ে নিতে পারে সৈফুদ্দীনের অনেক সাধের মসনদটা। যে মসনদে বসলে জীবনটাকে উপভোগ করা যায়। পরীক্ষা করা যায় নিজেকে।

মসনদের ন্যায্য অধিকারীতো সে। কেউ নেই। সৈফুদ্দীন ঘুমে অচেতন।

আগামী কাল প্রভাতে……

না! আবার কে যেন কথা বলে উঠল, বাধা দিল।

এবার আর চমকাল না সফি। এ-তার নিজের মন। সৎ ইচ্ছা। যেমন ঘুমিয়ে আছে বুকের ভেতর, অন্তরের অন্তঃস্থলে। যে মনের বাধা অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয় হয়তো যায়ও, কিন্তু অনর্থ বাধে। পরিচয় আগেও পেয়েছে। তবু ভুল করেছে। বিপত্তি দেখা দিয়েছে। জীবনে।

তাহ'লে কি করবে সে? কি তার করণীয়? কর্তব্য?

শুধু কি দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—রাতের পর রাত জেগে হাবশী সৈফুদ্দীনের জীবন্ত দেহটাকে পাহারা দিয়ে যাবে। গোলাম! স্বার্থপরের গোলামী করবে?

অস্থির হয়ে উঠল সে। অন্ধকারে সুলতানের কক্ষ দ্বারের সামনে ঘুরে বেড়াল। বাইরে ভুতের মত জমাটকালো অন্ধকার গাঢ় হল, গ্রাস করলো তাকে। উত্তর খুঁজলো সে। যুদ্ধ করল মনটার সঙ্গে। ক্ষত-বিক্ষত হ'ল। রক্তাক্ত হ'য়ে উঠল!

সে অসহায়। একটা শিশুর চেয়েও দুর্বল। লোভ আর স্বার্থ তাকে ঘিরে ধরেছে। ইনামের হাতছানি ডাকছে।

মুক্তি নেই!

আলো-বাতাস! মানুষের মন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

॥ উনিশ ॥

জমিলার সঙ্গে একদিন সাদী হ'য়ে গেল সফির।

এ-সাদীর উদ্যোক্তা সুলতান স্বয়ং। কিন্তু সাদীতে যোগ দেওয়া সম্ভব হ'ল না তাঁর পক্ষে। কারণ একজন পাইকের সাদীতে সুলতানের যোগ দেওয়া শোভা পায় না বা উচিৎ নয়, যতই সে স্নেহের পাত্র হোক না কেন।

অথচ সাদী করতে সে চায়নি। অমত ক'রেছিল বার বার।

সৈফুদ্দীন বলেছিলেন: কেন তুমি আপত্তি করছো সফি?

কেন সে-কথা সুলতানকে বলতে পারেনি সে। বলতে পারেনি যার সঙ্গে তিনি তার সাদী দিতে চান সেই মেয়েটা তাকে কি ভীষণ ঘৃণা করে। হয়তো সে-কথা তাঁকে বললে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাছাড়া কি করেই-বা তাঁকে সে-কথা বলা যায়। যায় না— বলা যায় না। বললে: সত্যের প্রকাশ ঘটতো। তার পাপ তার ব্যাভিচারের কথা বলতে হ'ত। বলতে হ'ত...

সফি পারেনি। তার সর্বশরীর আড়ষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। ভুল। তার জীবনের চরম ভুল। তার কলঙ্ক। কলঙ্কিত সে। বিশ্বাস হন্তা।

শাস্তি পেয়েছে সে। জমিলাকে তাকে শাস্তি দিয়েছে। তার ঘৃণা তাকে জাগ্রত করেছে। সে বেঁচেছে।

সৈফুদ্দীন বলেছিলেন: তুমি জামাল খাঁর কথা ভাবছো তো?

সে নীরব থেকেছে। সর্দারের কথা ভাবতে ও বাধ্য নয়। জমিলা হয়তো বাধ্য হয়েছে সাদীতে মত দিতে। বাঁদী সে। সুলতান তার

রক্ষক। রক্ষকের আদেশ মানতে সে বাধ্য। বাঁদীর নিজস্ব সত্তা বলতে কিছু নেই।

সৈফুদ্দীন বলেছেন : আমি তোমার সর্দারের মত নিয়েছি সফি। সে তার আপত্তি জানায়নি।

জামাল খাঁর মত আছে। সফি সাদী করুক চায় সর্দার। এরপর তার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। বরং খুশি হওয়া উচিত তার।

খুশি হ'তে পারেনি সফি। কেমন করে খুশি হবে? সে যে······

: সফি। ডেকেছেন সৈফুদ্দীন।

সফি চেয়েছিল তাঁর মুখের দিকে।

: আমি কাল-ই তোমার সাদীর ব্যবস্থা করছি।

: কাল?

: হ্যাঁ সফি।

: কিন্তু······

: তুমি অমত করো না।

: লেকিন আমি থাকব কোথায় জাঁহাপনা।

হেসেছেন সৈফুদ্দীন। বলেছেন : আমি ব্যবস্থা করবো।

সব ব্যবস্থাই করেছেন তিনি। প্রাসাদের লাগোয়া কটি ঘর হয়েছে নতুন আশ্রয় স্থল। বাবুর্চি বুড়ো ব্যবস্থা করেছে সব।

তবু সাদীর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মন স্থির করতে পারেনি সে।

বাবুর্চি বুড়ো বলেছে : মন খারাপ ক'রে বসে আছিস কেন? কি হয়েছে তোর?

: কি জানি।

হেসেছে বুড়ো। বলেছে : আজকের দিনে মন খারাপ করতে নেই। ভাবছিস কেন সব ঠিক হ'য়ে যাবে। যা ভাবছিস তা সত্যি নয়।

: কেন?

আমি বলছি বিলকুল ঝুট। খোদা তোর ভাল করবেন। দুলহা-দুলহন সুখী হবি তোরা।

: সাচ ?

: হ্যাঁরে। আমি বলছি। আমি যে জানি। শয়তান বাবুর্চি বুড়োটা বুড়ো হবার আগে একজন তার আশিককে আচ্ছা পথে নিয়ে আসার জন্যে তোর জমিলার মতই চেষ্টা করেছিল। লেকিন শয়তানটা বিলকুল শয়তান হয়ে উঠেছিল। তাই পারেনি সে। আর সে কি করেছিল জানিস ?

: কী ?

নিজেকে খতম করেছিল। হাসতে হাসতে শয়তানটার চোখের সামনে কলিজায় ছুরি চালিয়েছিল। বলেছিল, আমাকে জিন্দা রেখো। সেদিন তার কথা বুঝতে পারিনি। আজ সে জিন্দা আছে।

বাবুর্চি বুড়োর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল।

যেন জেগে উঠেছিল সফি! মনে পড়েছিল বাবুর্চি বুড়োর কথা। আজকের বাবুর্চি বুড়ো। একটা নোংরা শয়তান। বুড়ো হয়েছে তবু শয়তানী শেষ হয়নি। দেখেছে সে। বহুবার—বহু ভাবে পরিচয় পেয়েছে।

অথচ এমনই আশ্চর্য, লোকটা শয়তান প্রমাণ হওয়া সত্বেও ওকে ঘৃণা করতে তার মন চায়নি। বরং দুঃখ জেগেছে, ব্যথা অনুভব করেছে। সমবেদনা জানাতে ইচ্ছা করেছে।

কেন ? ভেবেছে সে। বার বার চিন্তা করেছে। উত্তর খুঁজছে।

পায়নি। কোন উত্তর পায়নি সফি। মনে হয়েছে ঠিক নয়। ওই নোংরা কদর্য লোকটাকে তার এড়িয়ে যাওয়াই উচিৎ তবু পারেনি। বাবুর্চি বুড়ো তার দোস্ত, উপকারী বন্ধু। তার সঙ্গে কোন দিন শয়তানী করেনি।

তবু শয়তানী যে কোন দিন করবে না এমন বিশ্বাস হয়নি। শয়তান কোন দিন সাচ্চা হতে পারে না। বাবুর্চি বুড়োও পারবে না।

কিন্তু বাবুর্চি বুড়ো কেন শয়তান হ'ল ?

সফি জানে। বাবুর্চি বুড়ো বলেছিল একদিন। নিজের জীবনের কথা।

বাবুর্চি বুড়ো নয়, মকবুল। জোয়ান মরদ একটা। দুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরা যৌবন। সুলতান শামসুদ্দীন আহ্‌মদ শাহের সেনাবাহিনীর সেরা সৈনিক। বিশ্বাসের পাত্র। সুলতানের ইচ্ছার আগেই কাম ফতে করে নাম কিনেছিল ক'বার। তাই তিনি তাঁর গুরুতর বা গোপনীয় কিছু কাজ থাকলে খবর পাঠাতেন। গোপনে সাক্ষাৎ করতে বলতেন।

সর্দারের কাছে ডাক শুনেই ছুটতো মকবুল। হুকুম শুনে আসতো। কাজ হাসিল করতো।

ইনাম! না, ইনামের প্রত্যাশা ছিলনা তার। ইনামে কি হবে, কাজে আনন্দ চাই। দু'চারটে খুন-জখম করতে না পারলে কি মরদের দিমাগ ঠিক থাকে। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে ভেড়ুয়া বনে যেতে হয়। মরার জন্যে যে নোকরী সে নোকরীতে মেরে মরার আনন্দ না থাকলে কি চলে?

মকবুল তৈরী। কুছ পরোয়া নেই তার। জিন্দা থাকতে গেলে মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হয়। নিজেকে জানতে হয়, চিনতে হয়। মারো, লোঠো, ঘর জ্বালাও। ইজ্জতে যদি হাত দিতে হয় তাতে ক্ষতি কি? নিজের জন্যে তো নয়, সুলতানের হুকুম। গুণাহ সুলতানের।

তাই ভাবতো মকবুল। বে-পরোয়া জিন্দেগীটাকে সুলতানের ইচ্ছামত চালনা করতো। আনন্দ পেতো।

আর শুধু মকবুল নয়, সকলেই। সুলতান সামসুদ্দীনের প্রতিটি পাইকই কখনো তাঁর ইচ্ছা কিংবা হুকুমের অন্যথা করতো না। উপায়ও ছিল না। বড় কঠিন, বড় কঠোর ছিলেন সুলতান। তাঁর কাছে অপরাধীর শাস্তি ছিলো ভয়ঙ্কর। ক্ষমা যে কি জিনিস তিনি জানতেন না। অপরাধী, অপরাধী। শাস্তি তাকে পেতেই হবে। খোদা ক্ষমা করলেও তিনি করবেন না।

শামসুদ্দানকে ভয় করতো সকলেই। তাঁর সামনে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো সাহস কারোর ছিল না। অথচ এমনই আশ্চর্য তাঁকে দেখে ভয় করার মতো কিছু ছিল না। বরং তাকিয়ে দেখবার মত সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর। সুপুরুষ ছিলেন তিনি। বলিষ্ঠ কান্তি যুবা পুরুষ। সুরেলা কণ্ঠস্বর। মুখে হাসি ছাড়া কথা ছিল না।

তবু কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতো না। তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ পর্যন্ত করতো না। নীরবে নত মস্তকে মেনে নিত প্রতিটি আদেশই।

জালালুদ্দীন মুহম্মদশাহ্ তখন গৌড়ের মসনদে। সেটা তাঁর দ্বিতীয়বারের রাজত্বকাল। প্রথমবারের রাজত্বকাল মাত্র একটি বৎসর স্থায়ী হয়েছিলো। পিতার সিংহাসন পিতাই কেড়ে নিয়েছিলেন। হিন্দুধর্মের জয় পতাকা আবার উড়ছিল গৌড়ের বাতাসে। রাজা গণেশ হয়েছিলেন 'দনুজমর্দন দেব'। সেটা ৮২০-৮২১ হিজরার কথা।

রাজা গণেশ। আব্বাজানের মুখেই শুনেছে মকবুল। রাজা গণেশের লাঠিয়াল দলের একজন সেরা লাঠিয়াল ছিল আব্বাজান। কিন্তু গণেশ তখন রাজা হননি একজন জমিদার মাত্র। কিন্তু তিনি ছিলেন শক্তিশালী জমিদার। ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের অন্যতম আমীর। তাঁরই নির্দেশানুসারে পরিচালিত হ'ত রাজকার্য।

হয়তো তিনি রাজা হতেন না। জীবন-সায়াহ্নে এসে আপন হাতে তুলে নিতেন না বাংলার রাজদণ্ড। বাকী জীবনটা হয়তো শান্তিতেই কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা হ'ল না। তাঁর জীবন দেবতা তাঁকে নতুন পথে ঠেলে দিলেন। অন্যায়ের প্রতিরোধে দীর্ঘ পাঁচশত বছরের মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দুর শাসন। ৮১৭ হিজরা (১৪১৪-১৫ খ্রীঃ) সুলতান আলাউদ্দীন ফিরোজশাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত ক'রে রাজা হ'লেন তিনি।

হিন্দুর শাসন শুধু হিন্দুর জন্যে নয়। তাঁর শাসন নিয়ে এল দীন

দরিদ্রের মধ্যে নিরাপত্তা—শান্তি—আশ্বাস। যে দরবেশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে প্রতিকারের ব্যর্থতায় তিনি হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন, রাজা হয়েই তাঁর প্রথম এবং প্রধান কাজ হ'ল দরবেশদের শাসন। কয়েকজনকে হত্যা করলেন তিনি। বাংলার বুক থেকে শেষ করতে চাইলেন দরবেশদের অত্যাচার।

এর ফলেই হয়তো বেশি দিন রাজত্ব করা সম্ভব হ'ল না তাঁর পক্ষে। দরবেশদের নেতা নূরকৎব্ আলম্ জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কীকে বাংলা আক্রমণে আমন্ত্রণ জানালেন। জানালেন: গণেশ অত্যাচারী, মুসলমানের শত্রু। তাকে যদি দমন করা না যায় বাংলার মুসলমানদের সে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে। সুলতান যদি ইসলামের রক্ষক হন, মুসলমানকে ভাই বলে স্বীকার করেন তাহ'লে নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন তিনি।

এগিয়ে এলেন সুলতান ইব্রাহিম শর্কী। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ছুটে এলেন বাংলার পথে।

যুদ্ধ হ'ল। কিন্তু তা যুদ্ধ নয় প্রহসন। রাজা গণেশের হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তি সুলতান ইব্রাহিম শর্কীর গতিরোধ করতে পারলো না। আর এই সুযোগে ঘরের শত্রু বিভিষণ পুত্র যদু, পিতার পক্ষ ত্যাগ করে শত্রু পক্ষে যোগ দিলেন। শুধু তাই নয় রাজ্যের লোভে ত্যাগ করলেন আপন ধর্ম। মুসলমান হলেন তিনি। যদু হলেন জিৎমল। ৮১৮ হিজরায় (১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) জলালুদ্দীন মুহম্মদশাহ্ নাম নিয়ে বসলেন গৌড়ের মসনদে।

ফিরে গেলেন ইব্রাহিম শর্কী। জলালুদ্দীন একা। পরাজিত গণেশ ফিরে এলেন আবার। কেড়ে নিলেন সিংহাসন। গৌড়ের বুকে আবার উঠল হিন্দু পতাকা।

কিন্তু বেশি দিন রাজ্য শাসন করা সম্ভব হ'ল না তাঁর পক্ষে। (১৪১৮-১৯ খ্রীঃ) একদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিলেন তিনি।

গনেশের মৃত্যুর পর আবার মসনদে বসলেন জলালুদ্দীন। জলালুদ্দীনের রাজত্বের শেষ কয়েক বছরের মধ্যে এক নওরোজের সময় পথের শোভা যাত্রায় হাতীর পিঠে শাহাজাদা শামসুদ্দীনকে দেখেছিল মকবুল। দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। সুন্দর কিশোরটিকে যতক্ষণ দেখা যায় দেখেছিল চেয়ে চেয়ে।

তারপর অনেক দিন দেখেনি সে। দেখল সেদিন যেদিন প্রথম শামসুদ্দীনের কাছে নোকরী নিয়ে পাইকের দলে নাম লেখালো।

আব্বাজান গত হয়েছে। সংসারে একা। দুনিয়াটাতেও একা বলা যায়। কারণ আব্বাজান ছাড়া আর কেউ ছিল না তার। বুড়ো হয়েছিল আব্বাজান তবু যতদিন জিন্দা ছিল নবাবের কাছে নোকরী নিতে দেয়নি। এক দোস্তই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

নিজের কাজে ফাঁকি ছিল না তার। প্রতিটি আদেশই যথাযথ পালন করতো। খুশি হয়েছিল সর্দার। কাছে কাছে রাখতো, ডাকতো।

এমনিভাবে দিন চলছিল। পূর্ণ যুবা তখন সে। রূপ হয়তো ছিল না। ছিল শক্তি। সে শক্তির পরীক্ষা দিতে হতো বার বার।

শামসুদ্দীন অলস বা বিলাসী ছিলেন না। অত্যাচারীও হয়তো তাঁকে বলা যায় না। কিন্তু তিনি যা বুঝতেন তাই করতেন। আমীর ওমরাহদের বিশ্বাস করতেন। আর সেই বিশ্বাসই হয়েছিল কাল। তাঁর বিশ্বাস ছিল তাঁর দরবারের যাঁরা প্রধান, যাঁদের তিনি দায়িত্বশীল পদে বসিয়েছেন তাঁরা সকলেই সাচ্চা।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিল তাঁর ঠিক উল্টো। শয়তানের বাসা ছিল তাঁর দরবার। দরবারের আমীর ওমরাহের দল!

আর মকবুল হয়ে উঠেছিল তাদেরই হাতের খেলার পুতুল। হয়ে উঠেছিল বে-পরোয়া। অন্যায় কাজ করতে এতটুকু বাধতো না তার, অন্যায় বলে মনেও হ'ত না।

উজীর ইজ্জুদ্দীন।

সুলতান শামসুদ্দীন তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। বৃদ্ধ উজির বড় ভালো লোক ছিলেন। সুলতান জলালুদ্দীনের বন্ধু ছিলেন তিনি। নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন। মিষ্ট ব্যবহার করতেন।

ভাগীরথীর তীরে এখন যেখানে নাসিরুদ্দীনের প্রাসাদ তার কাছেই ছিল তাঁর গৃহ। বেশ কয়েক বছর আগে সে গৃহ ভাগীরথীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে! হারিয়ে গেছে শেষ স্মৃতিটুকু।

কি প্রয়োজনে সেদিন গিয়েছিল মনে নেই। বোধহয় সুলতানই পাঠিয়েছিলেন।

ইজুদ্দীন বড় একটা দরবারে আসতেন না। গৃহে থাকতেন। কোরাণ-শরিফ পাঠে মগ্ন থাকতেন সব সময়।

মকবুল গিয়েছিল। কিন্তু কাউকে দেখতে পায়নি। ডেকেও সাড়া মেলেনি কারো।

অবাক হয়েছিল। সন্দেহ জেগেছিল। তবে কি এখানে কেউ থাকে না? কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়! মুক্ত দ্বারপথে জনশূন্য ব'লে বোধ হয়নি গৃহকে।

দ্বিধায় পড়েছিল সে। ভেবেছিল ফিরে যায়। কিন্তু ফিরে গিয়েই বা কি জবাব দেবে?

অপেক্ষা করেছিল আরও খানিকক্ষণ। ডেকেছিল ক'বার। শেষে যখন বিরক্ত হয়ে ফিরে আসছে তখন সাড়া পেয়েছিল।

নারীকণ্ঠে প্রশ্ন হয়েছিল : কাকে চান?

নাম বলেছিল মকবুল।

কণ্ঠ জানিয়েছিল : তিনি নেই।

: কোথায় গেছেন?

: মসজিদে! মগরিবের (সন্ধ্যার) নমাজ পড়তে গেছেন আব্বাজান।

: কখন ফিরবেন?

: কোনো ঠিক নেই, হয়তো আখের (রাত্রির) নমাজ শেষ ক'রে।

চিন্তা করেছিল মকবুল। কি করবে—ফিরে যাবে ?

কণ্ঠ প্রশ্ন করেছিল : আপনার কোনো প্রয়োজন আছে তাঁর সঙ্গে ?

: হ্যাঁ। জানিয়েছিল সে।

কণ্ঠ চুপ করেছিল।

এতোক্ষণ মকবুল অন্যদিকে চেয়েছিল। উত্তর দিয়েছিল প্রশ্নকারিণীর কথায়। এবার বলেছিল : উজির সাহাব ফিরলে একটা কথা তাঁকে বলে দেবেন ?

: বলবো।

: বলবেন জাঁহাপনা তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।

: আপনি জাঁহাপনার কাছ থেকে আসছেন ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: বেশ, ব'লে দেব তাঁকে।

: বলবেন।

ফিরে আসছিল সে। প্রশ্ন হয়েছিল : জাঁহাপনার সঙ্গে আব্বাজান আজই কি সাক্ষাৎ করবেন ?

দাঁড়িয়েছিল মকবুল। বলেছিল : তা তিনি বলেননি আমাকে। বলেছেন তিনি একবার যেন সাক্ষাৎ করেন।

: আচ্ছা।

সে চলে এসেছিল। ভুলে গিয়েছিল। উজির সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কি-না সে সংবাদ নেয়নি। সংবাদ নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেনি।

সেদিন দরবার গৃহে গোপন আলোচনায় বসেছিলেন সুলতান। ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাকে। কারণ ক'দিন আগে একটা কঠিন দায়িত্বভার দিয়েছিলেন তার ওপর। কাজ শেষ করেছিল সে। জেনে, উজিরকে সংবাদ দিতে বলেছিলেন।

কেন বলেছিলেন তা তিনিই জানেন। খেয়ালী মনটা তাঁর অমন-ই করে। নিজে যা ভাল বোঝেন করেন।

একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন : আচ্ছা মকবুল, তুমি কিছু চাও না ?

: কী চাইবো ? অবাক হয়েছিল সে। সুলতানের প্রশ্নের ধারাটা ঠিক বুঝতে পারেনি। কারণ, খোশ মেজাজে গল্প করা বা কিছু জানতে চাওয়া তাঁর স্বভাব নয়। যদিও তিনি হাসিমুখেই সব কিছু করেন। একটি দিনের জন্যেও বদমেজাজ নজরে পড়েনি। মেজাজ বিগড়ে গেলেও তিনি মুখে হাসি ধরে রাখেন। হাসিমুখেই বিচার করেন অপরাধীর। মৃত্যুদণ্ডও উচ্চারণ করেন হাসিমুখে।

বলেছিলেন : তুনিয়াতে তোমার কিছু চাওয়ার নেই ?

: কার কাছে ?

: খোদার কাছে।

: না। স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিল সে। এতোটুকু দ্বিধা করেনি। কারণ, সেই জীবনটাতে সে কিছু চাইবার কথা কোনোদিনও ভাবেনি। না মানুষের কাছে, না, খোদার কাছে। সে বুঝেছিল চাইলে কিছু পাওয়া যায় না। অধিকার ক'রে নিতে হয়।

কিন্তু তার উত্তরে খুশি হননি শামসুদ্দীন। ভ্রু-কুঞ্চিত ক'রে একটুক্ষণ চুপ ক'রে মুখের দিকে চেয়েছিলেন। সর্বক্ষণের মুখের হাসিটাও যেন ম্লান হয়েছিল। পরে বলেছিলেন : আমার কাছেও তো কিছু চাইতে পার ?

: আপনি মেহেরবান। মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল সে।

হেসেছিলেন তিনি। কথা বলেননি আর।

সত্যিই কিছু চাওয়ার ছিল না মকবুলের। কোনো প্রত্যাশা ! কিন্তু মনের মধ্যে সর্বদা গুমরে উঠতো বিদ্বেষ। নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি। শ্রদ্ধা-ভালোবাসার কথা চিন্তা করতে পারতো না। সুলতানের হুকুমে অন্ধের মতো মানুষের বুকে ছুরি চালাতো। ঘর ভাঙতো।

সুলতান শামসুদ্দীন আহ্‌মদশাহ্‌। পিতা জলালুদ্দীন। পিতামহ রাজা গণেশ। হিন্দুরক্ত ধমনীতে। যে হিন্দু মানুষের প্রতি বিশ্বাসী। মানুষকে মূল্য দিয়েছে তার কর্মের। হিন্দু-মুসলমানের ভেদকে মনে ঠাঁই দেয়নি।

পুত্র জলালুদ্দীন ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু যোগ্য হিন্দুদের তিনি মর্যাদা দিতেন। অযথা পীড়ন তাঁর নীতিবিরুদ্ধ ছিল। হিন্দুর কোনো কাজে তিনি বাধা দিতেন না। ন্যায়বিচারে তিনি হিন্দু মুসলমান উভয়ের কাছেই ছিলেন সমান।

ভিন্ন চরিত্র শামসুদ্দীনের। হিন্দু-মুসলমান কেউ-ই তাঁর কাছে রক্ষা পেতো না, কিন্তু অপরাধী হিন্দুর ক্ষমা ছিল না। লঘু পাপে গুরুদণ্ড ভোগ করতে হতো তাদের।

মকবুল হয়ে উঠেছিল যোগ্য সহচর। মানুষের রক্ত দেখে বড় আনন্দ পেতো সে। মরণ-আর্তনাদ শুনতে বড় ভালো লাগতো তার। আড়ালে অনেকে বলতো তাকে শয়তান।

কথাগুলো কানে আসতো তার ঠিকই, কিন্তু সে কিছু মনে করতো না কিংবা যারা একথা বলতো তাদের ওপর রাগ হতো না। কারণ নিজের ইচ্ছেয় নয়, সুলতানের আদেশ পালন করতো সে শুধু।

তবু তার জীবনে, মকবুল নামের শয়তানটার জিন্দিগিতে প্রেম এলো। এক নারী, উজির সাহাবের মেয়ে নসিবানু ভালোবাসলে তাকে। নিজেকে উজাড় ক'রে দিল।

ইজুদ্দীন-ই যেচে এসে আলাপ করেছিলেন। বৃদ্ধ উজির দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন তার কাছে। তিনি গৃহে না থেকে তাকে যে কষ্ট দিয়েছেন তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

সামান্য একটা পাইকের কাছে সুলতানের উজির করছেন ক্ষমা প্রার্থনা। মানুষটাকে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়নি তার। মনে হয়েছিল পাগল।

সত্যিই পাগল ইজুদ্দীন। ক্ষমা প্রার্থনার ক'দিন পরেই জোর ক'রে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন আপন গৃহে।

বাধা দিয়েছিল মকবুল। যেতে রাজী হয়নি প্রথমটায়। সংকোচ জেগেছিল মনে।

তিনি শুনতে চাননি কোনো কথা। বলেছিলেন : আমার গৃহে যেতে তোমার আপত্তি কেন ?

মকবুল চুপ করেছিল।

: কোনোও কাজ আছে ? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

মিথ্যা বলতে পারেনি। বলেছিল : না।

: তবে ?

এবারও চুপ করেছিল মকবুল।

বৃদ্ধ যেন আন্দাজ করতে পেয়েছিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন : তোমার আপত্তির কারণ বুঝতে পারছি।

: এটাই তো সত্যি ! মৃদুকণ্ঠে বলেছিল সে।

: কেন ?

: আপনি আর আমি···

: মেহেরবান খোদার দুনিয়ার দু'জন আদমী, আর কিছু নয়।

: কিন্তু !

: এটাই সত্যি। হেসেছিলেন তিনি। বলেছিলেন : আমাদের কাজ তো পরিচয় নয় ! খোদা যে কাজের জন্যে আমাদের পাঠিয়েছেন সেই কাজই করছি আমরা। কিন্তু আদমী হিসাবে আমরা সবাই সমান।

: কিন্তু ··

: আমরা ভুল করি। আমাদের গুনাহ্। আমরা নিজেদের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যের কথা ভুলে যাই। আমি উজির আর তুমি একজন সামান্য সৈনিক। কিন্তু তুমি উজির হয়ে আমি যদি সৈনিক হ'তাম ? একটু চুপ করেছিলেন তিনি। কি যেন চিন্তা করেছিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন : এ ফারাক আমরাই সৃষ্টি করেছি। আমি যা তাই নিয়েই মশগুল থাকি, অন্যের কথা ভাবি না।

: চলুন। বলেছিল সে।

: যাবে ? জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

: এর পরেও না যাওয়াটা অন্যায়।

কিন্তু গিয়েই অন্যায় করেছিল সে। না গেলেই হয়তো ভালো করতো।

সেদিন তাঁকে সংবাদ দিতে গিয়ে যার কণ্ঠ শুনেছিল, যাকে বোরখাবৃতা দেখেছিল—সাক্ষাৎ পেয়েছিল তাঁর। চমকে উঠেছিল। অনাবৃতা নসিবানুকে দেখে বুকের মধ্যে তুফানের দোলা জেগেছিল।

বৃদ্ধ পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন : আমার মেয়ে নসিবানু !

নসিবানু! নসিবানু !! নসিবানু !!!

সেদিন ইজুদ্দীনের গৃহ থেকে ফিরে আসার পর থেকেই কি যেন হয়েছিল তার। বারবার নসিবানুর সুন্দর মুখখানা ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। বাঁধভাঙা যৌবনটা সাড়া জাগিয়েছিল মনে। ছটফট করেছিল সে।

পরদিন আবার গিয়েছিল। বিনা প্রয়োজনে।

ডাকতে হয়নি, নসিবানু এসে দাঁড়িয়েছিল দ্বারের পাশে। জানতে চেয়েছিল : কাকে চান ?

মকবুল চুপ করেছিল।

: আব্বাজান নেই। এ-সময় কোনোদিন থাকেন না তিন। বলেছিল সে।

একটু বসবো ? বলেছিল মকবুল।

: বসবেন ?

: হ্যাঁ ?

: আসুন।

দ্বার ছেড়ে সরে দাঁড়িয়েছিল নসিবানু। ভিতরে গিয়ে বসেছিল সে।

নসিবানু বলেছিল : আব্বাজানের কাছে এসেছেন ?

: হ্যাঁ।

: জাঁহাপনা পাঠিয়েছেন ?

: না।

: তবে ?

: আমি এসেছি।

: কেন ?

নসিবানুর ব্যবহারে লজ্জা পেয়েছিল মকবুল। যেন ধরা পড়ে গিয়েছিল। কি বলবে কিছু ভেবে পায়নি।

নসিবানু বলেছিল : কিছু প্রয়োজন আছে ?

: আমি—আমি কোরাণ-শরিফ শুনতে এসেছি। কথাটা বলতে পেরে যেন বেঁচে গিয়েছিল সে। বলেছিল : আমি শুনেছি বড় সুন্দর তিনি কোরাণ-শরিফ পাঠ করেন।

: সুন্দর জিনিস ঠিকমতো পাঠ করতে পারলে সুন্দর-ই শোনায়।

: আপনি পারেন ?

: পারি।

: একটু শোনাবেন ?

একটু কি যেন চিন্তা করেছিল সে। বলেছিল : আমি ভালো পারি না। আপনি বসুন একটু আব্বাজান এখুনি এসে পড়বেন।

কিন্তু কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে।

নসিবানু বলেছিল : কি হ'ল উঠলেন যে ?

: আজ যাই।

: পাঠ শুনবেন না ?

: আজ থাক, অন্যদিন আসবো।

: কবে আসবেন ব'লে যান আব্বাজান এলে আমি বলে রাখবো। আপনাকে এভাবে ফিরে যেতে হবে না।

: না-না, আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি ঠিক আসবো।

নসিবানু মুখটিপে হেসেছিল।

তারপর ক'দিন আর ও-পথ মাড়ায়নি মকবুল। নসিবানুর মুখটিপে হাসিটা ভুলতে পারেনি। যেন বিদ্রূপ করেছিল।

ছটফট করেছে সবসময়। নসিবানুর সুন্দর দেহটা তাকে পাগল

করেছে। এবার ভেবেছে যায়। গিয়ে বলে—তোমার আব্বাজানের কাছে নয়, সেদিন তোমার কাছেই এসেছিলাম—আজও এসেছি। পবিত্র কোরাণ-শরিফ নিয়ে মিথ্যার ছলনাটুকুর জন্যে তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

পারেনি। ব্যর্থ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে শুধু।

বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হয়েছে একদিন। দেখতে পেয়ে ছুটে এসেছেন কাছে। বলেছেন : আমি তোমাকেই ক'দিন খুঁজছিলাম।

: আমাকে ? বিস্মিত হয়েছে সে।

: নসিবানু বলেছিল তুমি একদিন আমার কাছে কোরাণ-শরিফ শুনতে গিয়ে ফিরে এসেছো। আজ চল তুমি।

সেদিন সত্যি সত্যিই কাজ ছিল তার। বলেছিল : আজ তো আমি যেতে পারছি না। আমার কাজ আছে।

: আগামী কাল এসো তাহলে ?

: যাব।

গিয়েছিল পরদিন। কিন্তু বৃদ্ধ ছিলেন না। এক বন্ধুর পুত্রের শাদিতে গিয়েছিলেন তিনি। মনে ছিল না ব'লেই কথা দিয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন ব'লে যেতেও চাননি। নসিবানুই অনেক ক'রে বুঝিয়ে পাঠিয়েছিল তাঁকে।

বলেছিল : আব্বাজান আজও নেই।

: তাহলে ? জানতে চেয়েছিল মকবুল।

: আসুন।

ঘরে বসিয়ে শরবত দিয়েছিল নসিবানু। বলেছিল : সত্যিই আপনি আব্বাজানের কাছে কোরাণ-শরিফ শুনতে এসেছেন ?

অনেক কষ্টে 'হ্যাঁ' বলেছিল মকবুল। মিথ্যা বলেছিল। অপরাধ করেছিল।

নসিবানু চুপ করেছিল।

সেদিন এক সময় চলে এসেছিল সে। যতোক্ষণ ছিল গল্প করেছিল।

তারপর ক'দিন গেছে। দেখা হয়েছে বৃদ্ধের সঙ্গে। তাঁর কথা শুনেছে। জেনেছে নসিবানুর কথাও।

নসিবানু!

দুর্ভাগিনী নসিবানু। বৃদ্ধের মাতৃহারা কন্যা। বিবি মারা যাওয়ার পর আর শাদি করেননি। নিজের হাতে মানুষ করেছিলেন তাকে। শাদি দিয়েছিলেন একদিন। কিন্তু ক'টি মাসের ব্যবধানে খসম মারা গেল। আবার শাদি দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

নসিবানু কেঁদে বলেছিল : এ তুমি কি করছো আব্বাজান?

: কেন মা?

: আমি কি তোমার এতোই বোঝা হয়ে উঠেছি যে···

: কিন্তু মা!

: না—আব্বাজান।

: সারাটা জীবন?

: আমি এমনি থাকতে চাই।

: কিন্তু······

: আমাকে থাকতে দাও আব্বাজান।

মেনে নিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন : তবে তাই হোক। তবে মা আমি চাই তুই সুখী হ'। তোর যখন আপত্তি তখন আমি জোর করবো না। যদি কোনোদিন তোর মত হয় আমাকে জানাস্। লজ্জা করিস্নি।

একদিন মকবুলের বাহুবন্ধনে নিজেই ধরা দিয়েছিল নসিবানু।

বলেছিল : আমি তোমায় পেয়ার করি মকবুল। তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই আমি তোমাকে ভালোবেসেছি।

পেয়ার! যেন নতুন কথা শুনেছিল মকবুল। নতুন সুর-মূর্ছনা। ভালো লেগেছিল। নসিবানুর দেহের মিষ্টি সুবাসটা তাকে পাগল করেছিল।

বাধাহীন যৌবন। মকবুল অধিকার করেছিল নসিবানুর দেহটা। কোনো বাধা মানেনি। দস্যুর মতো লুটে নিয়েছিল নসিবানুর যৌবন।

: এ তুমি কি করলে মকবুল ? ককিয়ে উঠেছিল নসিবানু।

সে তখন শ্রান্ত-ক্লান্ত। তবু ওকে বুকে টেনে নিয়েছিল। জানতে চেয়েছিল : কী করলুম ?

: এ অন্যায়।

: কে বললে ?

: আমরা অন্যায় করলুম মকবুল।

: না—না।

: আমরা দু'জনের কেউ নই।

: হবো।

: কেমন ক'রে ?

: আমি তোমাকে শাদি করবো।

: করবে ?

: নিশ্চয়ই।

: মকবুল !

: আমি তোমাকে চাই নসিবানু।

সরে গিয়েছিল নসিবানু। কাছে এসেছিল। ঘন হয়েছিল বুকে।

মকবুল বলেছিল : তোমার আব্বাজানকে তুমি বল।

: তুমি বল।

: আমি !

: আমার লজ্জা করবে।

: আমি বলবো।

কিন্তু মকবুল বা নসিবানু কেউ-ই কথাটা লজ্জায় বলতে পারেনি ইজুদ্দীনকে। পার হয়েছিল দিন। আর দিনের ব্যবধানে কেমন যেন পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার মনে। মোহ কেটে গিয়েছিল যেন।

নসিবানুকে আগের মতো ভালো না-লাগতে শুরু করেছিল একদিন। তবু ওকে ছেড়ে পালাতে ইচ্ছা করেনি।

নসিবানু বলেছিল : জানো !

: কী ? জানতে চেয়েছিল মকবুল।

: আমি—আমি বোধ হয়……

চমকে উঠেছিল সে। তার পরদিনই ইজুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেছিল।

বলেছিল : আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

: বল। হাসিমুখেই জানতে চেয়েছিল বৃদ্ধ।

: নসিবানুকে আমি শাদি করতে চাই।

: নসিবানুকে ?

: হ্যাঁ।

একটু গম্ভীর হয়েছিলেন বৃদ্ধ। বলেছিলেন : তার মত আছে ?

: হ্যাঁ।

: বেশ, তার সঙ্গে আমি একবার কথা ব'লে তোমাকে জানাবো।

জানিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন : এ নোকরি তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে মকবুল।

অবাক হয়েছিল সে। জানতে চেয়েছিল : কেন ?

: একাম আচ্ছা নেই। বলেছিলেন তিনি।

: কিন্তু আমার ভালো লাগে।

: যা বুরা, খারাপ, তা তোমার ভালো লাগে ? আশ্চর্য হয়েছিলেন তিনি। যেন বুঝতে পারেননি ওকে। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

মকবুলও অবাক হয়েছিল। জানতে চেয়েছিল : আমার কাজকে খারাপ বলছেন কেন ?

: সবাই বলে।

: কেন ?

: কাজটা খারাপ। কোনো আদমীর উচিত নয় অমন কাজ করা।

: কী বলছেন আপনি ?

: আমি সব জানি। তোমার সব খবর আমার জানা। বিলকুল।

: ওঃ। মকবুল চুপ করেছিল। ইজুদ্দীনের কথাগুলো ভেবেছিল। বৃদ্ধ তার কাজের বিচার করছেন, নিন্দা করছেন, খারাপ বলছেন তাকে।

খারাপ! খারাপ! মকবুল খারাপ! হয়তো এই খারাপ ভাবার জন্যে ঘৃণা করেন তাকে। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাই। জরুর ঘৃণা করেন।

মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল তার। বুড়োটাকে অসহ্য বোধ হয়েছিল। বলেছিল : আমাকে আপনি খারাপ বলছেন ?

: তোমাকে নয়, তোমার কাজটা।

: কেন ?

: তোমার কাজ মানুষের ভালো করে না।

: আমি করি।

: তুমি বোঝ না ব'লেই করো।

: খারাপ করি অথচ বুঝি না !

: বুঝলে কেউ করে না। মানুষ খারাপ কাজ করতে পারে না! নীরব হয়েছিলেন তিনি। কি যেন চিন্তা করেছিলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন : জানো মকবুল, আমরা বুরা কাম করতেই আগে এগিয়ে যাই। যাদের ক্ষতি করতে যাই তাদের কথা একবার চিন্তা করি না। শুধু নিজের কথাটাই ভাবি।

: কেন ? ইজুদ্দীনের কথাগুলো ভালো লাগেনি তার। বোঝেনি। তবু প্রশ্নটা করেছিল।

: আমরা যে স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি দিন দিন।

স্বার্থ! মানুষের স্বার্থ। মকবুলের স্বার্থ। সে তার সুলতানের হুকুমে, তাঁর স্বার্থের জন্যেই অনেক অন্যায় কাজ বিচার না ক'রেই করে। কিন্তু যা করে তার জন্যে অনুশোচনা জাগেনি তার। কোনোদিন মনে হয়নি কেন অন্যায় কাজ করলে সে ? করতে বাধ্য হ'ল।

তাহলে ?

ভেবেছে মকবুল। ইজুদ্দীনের কথাটা মেনে নিতে পারেনি।

তবু প্রশ্ন করেছে : আমাকে কি করতে বলছেন আপনি ?

: ও কাজ তুমি ছেড়ে দাও।

: তারপর ?

: নসিবানুকে শাদি করো।

: কাজ যদি না ছাড়ি ?

: কেন ছাড়বে না ?

: আমি খাব কি ?

: তার জন্যে আমি আছি।

: আপনি ?

: হ্যাঁ, আমি তোমাদের সব ব্যবস্থা ক'রে দেব। কোনো কষ্ট হবে না। সারা জিন্দিগিটা ভালোভাবে কাটাতে পারবে।

ভেবেছিল মকবুল। উজির ইজুদ্দীনের কথাগুলো চিন্তা করেছিল। তার কোনো চিন্তা-ভাবনা থাকবে না। কোনো কাজ করতে হবে না তাকে। নসিবানুকে শাদি করার বিনিময়ে সমস্ত জীবনটা সে বসে খেতে পারবে।

কিন্তু না। মেনে নিতে পারেনি সে। তার মন। নিজেকে তার ছোট মনে হয়েছিল।

বলেছিল : আমার গোস্তাফি মাপ করবেন।

: কাজ ছাড়বে না তুমি ?

: না।

: কেন ?

: আমি যা করি তাতে কোনো গুনাহ্ নেই। আমি না হয়ে আপনি হ'লেও করতেন। আমি না করলে অন্য একজন করবে। খোদা আমাদের যে কাজের জন্যে পাঠিয়েছেন তাই করি আমরা। করতে বাধ্য হই। একথা আপনিই বলেছিলেন একদিন।

ইজুদ্দীনের কথাটাই ফিরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে।

অবাক হয়েছিলেন তিনি। বিস্মিত দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তার মুখের

দিকে চেয়েছিলেন। কেমন যেন অসহায় দেখিয়েছিল তাকে। স্খলিত কণ্ঠে বলেছিলেন : নসিবানুর কি হবে?

: তাকে আমি শাদি করবো।

: না।

: না?

তোমার মতো একটা শয়তানের সঙ্গে তার শাদি হ'তে পারে না। উজির ইজুদ্দীন আমি, তোমার সঙ্গে আমার অনেক ফারাক। তবু মানুষকে মানুষ ভাবি ব'লেই শাদিতে রাজী হয়েছিলুম। কিন্তু তুমি তো মানুষ নও! তোমার পরিচয় তুমি শয়তান। কাফের শামসুদ্দানের গোলাম তুমি।

গোলাম। মকবুলের পরিচয় শামসুদ্দীনের সামান্য একজন গোলাম। উজীরের কন্যার সঙ্গে কোনো মতেই শাদি হ'তে পারে না তার।

মাথাটা আগুন হয়ে উঠেছে। অসহ্য রাগ। না, নিজেকে সামলে নিয়েছে। মনে পড়েছে নসিবানুকে। তার সুন্দর মুখটা—দেহ, দেহের অভ্যন্তরে আলোর দিনগোনা একটা প্রাণ।

নসিবানুও কি তাই বলে? ঘৃণা করে?

ভাবতে পারেনি মকবুল।

পারেনি সে। একদিন ছুটে গেছে। না গেলেই যেন ভালো করতো।

নসিবানু কাছে এসেছিল। ম্লান মূর্তি তার।

মকবুল বলেছিল : কেমন আছো?

: ভালো। হেসেছিল নসিবানু। ম্লান বিষণ্ণ হাসি।

মকবুল বলেছিল : আমি তোমার কাছেই এসেছি।

: কেন? জানতে চেয়েছিল নসিবানু।

: তোমার আব্বাজান যা বলেছেন তোমারও কি সেই কথা?

: কী?

: আমি শয়তান।

: না-না।

: তোমার আব্বাজান তাই বলেছেন।

নসিবানু কথা বলেনি। মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল।

মকবুল ডেকেছিল : নসিবানু!

: বল।

: আমি তোমাকে শাদি করতে চাই।

: কিন্তু· ···

: কী?

: ও কাজ তোমাকে ছাড়তে হবে।

: কেন?

: ও কাজ ভালো নয়।

: তাতে কী?

: পারবে না?

: না!

নসিবানু আবার চুপ করেছিল। স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল তার মুখের দিকে। দৃষ্টিটা বড় তীক্ষ্ণ মনে হয়েছিল তার।

মকবুলের মাথার মধ্যে আবার পোকাগুলো কামড়ে উঠেছিল। নসিবানুকে অসহ্য বোধ হয়েছিল। মনে হয়েছিল নসিবানুও তাকে ঘৃণা করে।

ঘৃণা! মানুষের ঘৃণা। পেয়ার-মহব্বৎ মিথ্যা। সব ঝুট।

বলেছিল : আমি যাচ্ছি।

নসিবানু কথা বলেনি। চলে এসেছিল সে।

আবার ক'দিন পরে গিয়েছিল। ডেকে পাঠিয়েছিল নসিবানু।

সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ আগেই। রাতটা অন্ধকার। ইজুদ্দীন গৃহে ছিলেন না।

কাছে এসেছিল নসিবানু। মকবুল জানতে চেয়েছিল : আমাকে ডেকে পাঠিয়েছো কেন ?

: বড় দেখতে ইচ্ছে করেছিল তোমাকে।

: একটা শয়তানকে ?

: না-না।

: তাই। হেসেছিল সে। বলেছিল : তোমাদের কাছে তো আমি শয়তান !

: তুমি ভালো হবে।

: খারাপ আমি হইনি।

: তোমার কাজটা···

: আমি সুলতানের গোলাম। তাঁর আদেশে আমি চলি। আমি চলতে বাধ্য।

: আর কিছু ?

: কী ?

: তোমার দুঃখ হয় না ?

: দুঃখ কিসের ?

: সুলতানের হুকুমে যাদের বুকে ছুরি চালাও, ঘর ভাঙো, ঘর জ্বালাও—তাদের জন্যে তোমার দুঃখ হয় না এতোটুকু ?

: না, দুঃখ হয় না। আমি আনন্দ পাই।

: আনন্দ পাও ?

: পাই। মালেকের বিচারে তারা অপরাধী, অপরাধীর শাস্তি পাওয়াই উচিত।

: দুনিয়ার মালেক ?

: আমার মালেক জাঁহাপনা! তাঁর হুকুমই আমার কাছে সব। যদি খোদাও তাঁর হুকুমের ওপর অন্য হুকুম দেন আমি শুনবো না।

: শুনবে না ?

: না।

: আমার কথা ?

: না।

: তুমি ফিরে এসো।

: অমন ফেরা আমি ফিরতে চাই না।

: আমার বিপদ।

: আমি পারবো না।

অনেকক্ষণ— অনেকক্ষণ নসিবানু চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। মকবুল নীরব। দু'জনের মধ্যে দুরন্ত বাধার প্রাচীর। কেউ কারো দিকে চাইতে পর্যন্ত পারছে না।

একসময় উঠেছিল নসিবানু। ভিতরে চলে গিয়েছিল। যাওয়ার সময় দু'চোখ ভরে যেন দেখেছিল তাকে।

আরো অনেকক্ষণ বসেছিল মকবুল। চলে আসাই উচিত ছিল তার। পারেনি।

কিন্তু একসময় উঠতে হয়েছিল তাকে। কেমন যেন সন্দেহ জেগেছিল মনে। উঠে ভিতরে গিয়েছিল।

চমকে উঠেছিল সে দৃশ্য দেখে। নিজের কলিজায় ছুরি চালিয়েছে নসিবানু।

কেন ? কেন ?

মকবুল ছুটে গিয়েছিল। চিৎকার ক'রে উঠেছিল : নসিবানু!

সে ডাক নসিবানুর কানে পৌঁছেছিল। চোখ মেলেছিল। মৃদু হাসির একটা ক্ষীণরেখা ফুটে উঠেছিল ওষ্ঠে। কষ্টে বলেছিল : আমাকে জিন্দা রেখো।

তারপর……

আর কিছু নেই। কোনো বাধা। সত্যি সত্যিই শয়তান হয়ে উঠল মকবুল।

খুন-জখম-ঘরভাঙা। জানানাকেও রেহাই দেয়নি মকবুল।

সুলতানের আদেশের পর একদণ্ড বিলম্ব সইতো না তার। সবার আগে ছুটে যেত সে। কাজ হাসিল করতো।

কিন্তু হঠাৎই একদিন শামসুদ্দীনের জিন্দিগি খতম হয়ে গেল। সুলতানের দুই ক্রীতদাস সাদী খান আর নাসির খান একদিন রাতের অন্ধকারে শেষ ক'রে দিল তাঁকে। মকবুলের শয়তানির দিনও শেষ হ'ল। শেষ হ'ল গণেশের বংশের রাজত্ব। আবার সেই মসনদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। ৮৩৯ হিজরায় শামসুদ্দীন খুন হবার পর ৮৪১ হিজরা পর্যন্ত দু'টো বছর মসনদটাকে নিয়ে চললো ছিনিমিনি খেলা। রক্তের ঢেউ বইলো গৌড়ের পথে।

মসনদে সুলতান নেই, কিন্তু সুলতান বানতে চায় সবাই। উজির, আমীর, ওমরাহ্‌দের মধ্যে চলে ষড়যন্ত্র। সুলতান বানতে চায় সাদী খান, নাসির খানও তাই চায়। দল পাকায়। পাইকের দল দল ভাঙাভাঙী করে। আজ এর কাল ওর দলে যায় তারা। ইনামের পাহাড় জমে তাদের ঘরে।

মকবুল দেখে, ভাবে। একি হচ্ছে? একি করলে সে?

মনে পড়ে নসিবানুকে। তার কথা। সে তো এমন চায় না। কি চেয়েছিল তাই হয়তো জানে না সে।

খুন হ'ল সাদী খান। মসনদ নাসির খানের। সুলতান হয়ে বসলো সে।

আবার সেই ক'টা দিনের খেলা। সুলতানির খেলা। নাসির খানও শেষ হ'ল একদিন। মসনদে নতুন সুলতান। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ্‌ বসলেন গৌড়ের মসনদে। শেষ হ'ল সুলতানি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দিন। সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর গৌড়ের মসনদে বসে রইলেন তিনি। কঠিন হাতে ধরলেন শাসনদণ্ড। শান্তি ফিরে এল বাংলায়।

আর মকবুল!

মকবুল তখন অন্য মানুষ। অন্য পরিচয় তার। কিন্তু ভালো হ'তে

পারল না। শুরু হ'ল অন্য খেলা। ঘর ভাঙার খেলা। শয়তান মকবুল শয়তান-ই রয়ে গেল।

দিন মাস বছরের হিসাবে গৌড়ের মসনদে এলো নতুন নতুন সুলতান। কাঁদল মানুষ। নাসিবানুর কথা ভুলে হেসে উঠল মকবুল নামের শয়তানটা। হাসলো জোর ক'রে। আর এমনি হাসতে হাসতেই কাঁদল একদিন। যেদিন বুঝতে পারল এতোদিন শুধু ভুল আর মিথ্যের পেছনে ছুটে গেছে। কিছু পায়নি, শুধু হারিয়েছে। ধরে রাখতে পারেনি।

বাবুর্চি বুড়ো!

নতুন পরিচয়। দুনিয়ায় একটা সর্বহারা, হতভাগা মানুষ। পদে পদে লাঞ্ছনা। কুত্তার মতো তাড়া খেয়ে ফেরা। তবু শয়তানি। মানুষ বুঝি তার স্বভাব ভুলতে পারে না।

সফি একদিন বলেছিল: তুমি এমন কেন বল তো?

: কেমন রে?

কেমন তা জানতো না সফি। বুঝতে পারতো না। বলেছিল: কী জানি।

খিঁচিয়ে উঠেছিল বাবুর্চি বুড়ো। বলেছিল: তুই একটা বুদ্ধু।

আর সেইজন্যেই ওকে সাহস দিয়েছে। ওর জীবনের প্রেমকে হারিয়ে যেতে দেয়নি।

বলেছে: ভুল করিস্‌নি সফি।

সফির মনে দ্বিধা, সংশয়। বলেছে: জমিলা আমাকে ঘৃণা করে।

: নারে।

: আমি···

: তুই জানিস্‌ না। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে। বিলকুল।

সব ঠিক হয়ে যাবে! জমিলা আবার আগের মতোই ভালো-বাসবে। কাছে আসবে? ধরা দেবে?

আর···

॥ কুড়ি ॥

এখন ভাবল সফি।

বাবুর্চি বুড়ো যা বলেছিল, তাকি সত্যি ?

রাত্রি হয়েছে। আজও আকাশে চাঁদ নেই। অন্ধকারে তারাদের রাতের প্রহর গোনার কাল।

সফি ভাবছিল। ভাবছিল তার নসিবটাকে। এখন এই মুহূর্তে নিজেকে নিয়ে বিব্রত বোধ করছিল সে। মনটা সহজ হ'তে পারছিল না। নির্জনতা। জমিলার মুখোমুখি হওয়ার সাহস যেন হারিয়ে ফেলছিল ক্রমশঃ। ভাবছিল নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি জমিলার কাছে প্রকাশ না করলেই পারতো। জমিলা হয়তো মনে-প্রাণে কোনোদিনই গ্রহণ করতে পারবে না তাকে। বাঁদী শুধু নবাব বেগমের হুকুম মেনে নিয়েছে। বাধ্য হয়েছে। নসিবটাকে স্বীকার করেছে। ঘৃণা ভুলতে পারেনি। হয়তো পারবেও না কোনোদিন।

না—না—না! যেন আর্তচিৎকার ক'রে উঠল অন্তরটা। এমন আমি চাইনি। কেউ শুধুমাত্র বাধ্য হয়ে নিরুপায় অসহায়তায় আমার কলঙ্কিত জীবনের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে বাধ্য হোক, প্রতিদিনের জীবন যাপনের গ্লানিতে দগ্ধ হোক এমন আমি চাইনি। খোদা, এ তোমার কেমন পরিহাস, এ তুমি কি করলে খোদা ? জমিলা ফুলের মত নিষ্পাপ, সুন্দর। আমার অপরাধী গ্লানিময় জীবনটার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে কোন্ পরিহাস তোমার চরিতার্থ করলে ? আমি যে অনেক—অনেক নীচ, ছোট। জীবনের পবিত্রতা হারিয়েছি। লোভ আমাকে পাপের পথে, নরকের মাঝে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তবে কেন তুমি তাকে আমার জীবনের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে তার জীবনটাকে নষ্ট করলে ?

কেন, কেন, কেন তুমি এমন করলে খোদা ? কেন তুমি এমনভাবে শাস্তি দিলে তাকে ? আমার অপরাধের শাস্তি সে কেন বহন করবে ?

: শুনছো !

: কে ?

: আমি।

: জমিলা ?

: হ্যাঁ।

ওর দিকে চাইলো সফি। ছায়া-ছায়া একখানা মুখ, অস্পষ্ট। বললে : এ কি হ'ল জমিলা ? এ আমি কি করলুম ?

সফির কণ্ঠে আর্তনাদের ঢেউ। সে ডুকরে কেঁদে উঠতে চাইলো। বিস্মিত হ'ল জমিলা। বললে : কি করলে ?

: এ আমি চাইনি জমিলা। আমি···

জমিলা এগিয়ে এলো। সফির বুকের কাছে দাঁড়াল। বললে : কি বলছো তুমি ?

: আমি অপরাধী জমিলা।

: না।

: আমি পাপী।

: না-না।

: আমি তোমার জিন্দিগিটা খতম ক'রে দিলুম।

: কে বললে ?

: আমি বলছি। একদিন তোমাকে পাওয়ার জন্যে আমার লোভের সীমা ছিল না। সেই লোভই হয়তো······। আমার মতো একটা পাপীকে কেন তুমি মেনে নিলে, কেন তুমি এ ভুল করলে ?

: ভুল !

: হ্যাঁ, জমিলা ভুল। কেন তুমি এ ভুল করলে ? কেমন ক'রে ?

: কেমন ক'রে !

অন্ধকারে কেউ তারা কারো মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। জমিলা তার

বড় কাছে থাকা সত্ত্বেও সফি পারছিল না তাকে কাছে টেনে নিতে। নিজেকে তার শক্তিহীন, অথর্ব পঙ্গু ব'লে বোধ হচ্ছিল। বাধার প্রাচীর অতিক্রম করার সাধ্য সে হারিয়ে ফেলেছিল।

এক সময় অন্ধকারে খুব আস্তে জমিলার গলাটা শোনা গেল। বিশ্বাসের মন্ত্র আপন কণ্ঠে উচ্চারণ করল জমিলা। বললে : অপরাধী তুমি নও।

: না-না।

: হ্যাঁগো।

: কিন্তু……

: ভুল তুমি করেছিলে সত্যিই।

: জমিলা!

: সেই ভুলের শাস্তি তো তুমি কম পাওনি। তুমি……

: জমিলা!

: তোমার সব অপরাধ আর পাপের গ্লানি অনুশোচনার অশ্রুজলে ধুয়ে-মুছে গেছে।

: জমিলা!

: ভুল আমরাই করি। মানুষের ভুল মানুষ-ই সংশোধন ক'রে নেয়। আমি···

: কী?

: অন্যায় করেছি আমি। তোমাকে ভুল বুঝে আঘাত দিয়েছি, ঘৃণা করেছি। আমার অপরাধের শেষ নেই।

: জমিলা!

: তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তোমার উদার মনের আলোয় আমাকে তুমি ভরিয়ে তোল। জীবনের সহজ-স্বচ্ছন্দ পথে চলতে শেখাও। আমাকে তুমি গ্রহণ করো!

: জমিলা! জমিলা!

তার দুই বাহুর আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দেয় জমিলা। দ্বিধা-

সংকোচের অবসান ঘটে। মনের জমাট বেদনাটা আনন্দের অশ্রুতে ঝরে পড়ে। ফোঁটায়—ফোঁটায়।

: জমিলা!

: আমি তোমার।

: জমিলা!

: তুমি মহৎ।

: জমিলা!

: তুমি আমার জীবন-দেবতা! আমি ধন্য!

সেই জমাট অন্ধকার রাত্রের দূর আকাশের কোলে চাঁদের ছবিটা উঁকি দেয়।

সর্দার এলো গভীর রাত্রে।

সফি তখনও ঘুমোয়নি। জমিলার হালকা দেহটাকে বুকের মধ্যে নিয়ে চুপ ক'রে শুয়েছিল। মনটা মধুর স্বপ্নের ভারে ভরেছিল। জমিলার উষ্ণ বুকের স্পর্শটা বড় ভালো লাগছিল তার। মনে হচ্ছিল—সে ভাবছিল জমিলা নামের মেয়েটাকে, একটা সুখের পাখিকে সে বলিষ্ঠ বুকের মাঝে চিরদিন এমনি ক'রে—ঠিক এমনি ক'রে রেখে দেবে!

জমিলাও ঘুমোয়নি। সফির বুকের আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দিয়ে চুপ ক'রে শুয়েছিল সে। নিঃশব্দ আত্মসমর্পণে নিজেকে উজাড় ক'রে দিয়েছিল।

সফি ভাবছিল। নিজের কথা, জমিলার কথা—আরও অনেক কথাই মনে হয়েছিল তার। মনে পড়েছিল সর্দারের কথাটাও। কৃতজ্ঞ মনটা জামান খাঁর কথাটা ভুলতে পারছিল না। একসময় বলেছিল: জমিলা, আমার বড় খারাপ লাগছে।

সফির বুকের মধ্যে কেঁপে উঠেছিল জমিলার দেহটা। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেনি। শেষে অনেক কষ্টে যেন ভয়ে-ভয়ে কথা বলেছিল জমিলা। জিজ্ঞাসা করেছিল: খারাপ লাগছে তোমার?

: হ্যাঁ, জমিলা।

: কেন ?

: আমাদের শাদি হ'ল। অথচ...

: অথচ ?

: সর্দার এলো না।

কথাটা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল জমিলা। সফির বুকে আরও ঘন হয়েছিল। জানতে চেয়েছিল : জানাওনি তাকে ?

: না, জমিলা।

: কেন ?

: কেমন ক'রে জানাবো বল। আমি তো অনেকদিন সর্দারকে দেখিই নি। জাহাঁপনা বলেছিলেন, সর্দারকে বলেছিলেন তিনি। সর্দার আসবে।

: এলো না কেন ?

: কি জানি! আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে...

: কী ?

: আমার ভালো লাগছে না। মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। হয়তো......

: হয়তো ?

: সময় পায়নি! সুলতান তাই বলেছেন। বাবুর্চি বুড়ো বলেছে আজকের দিনে মন খারাপ করতে নেই। তবু আমার মনটা খারাপ হয়ে আছে। আমি......

কথাটা বলতে পারেনি সফি। কি বলবে ভেবে পায়নি। জমিলা চুপ করেছিল। নীরবে সফির বুকের মধ্যে শুয়ে থাকতে থাকতে, স্বপ্ন দেখতে দেখতে, ঘুমিয়ে পড়েছিল একসময়।

সফি ঘুমোতে পারছিল না। প্রতিরাতের জাগ্রত প্রহরীর চোখে ঘুম নামছিল না। তার মনটা চিন্তায় চিন্তায় ভরে উঠছিল বারবার।

সফি ভাবল, সর্দার না এলেও তার অন্ততঃ একবার ছুটে যাওয়া

উচিত ছিল। একটা মুখের কথা জানিয়ে আসা গুনাহের নয়। অন্যায় করেছে সে।

কিন্তু সে সময়টুকুই-বা পেল কোথায়? তাকে ভাববার, চিন্তা করবার সময়টুকু পর্যন্ত দিলেন না সুলতান। তবু বাবুর্চি বুড়োকে সফি বলেছিল। বলেছিল: আমি একবার সর্দারের কাছে যাব।

বাবুর্চি বুড়ো বলেছিল: সুলতান তো জানিয়েছেন তাকে।

: তবু!

: সর্দার তো আসবে।

বাবুর্চি বুড়োও বিশ্বাস করেছিল। তারপর যখন সত্যি সত্যিই সর্দার এলো না—শাদি হয়ে গেল তার তখন বাবুর্চি বুড়োকে বলেছিল: সর্দার এলো না কেন বল তো?

: কি জানি। বুড়োও বুঝতে পারেনি।

সফি বলেছিল: আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই কিছু……

কথাটা তাকে শেষ করতে দেয়নি বুড়ো। ব্যস্তভাবে বাধা দিয়ে বলেছিল: নিশ্চয়ই কোনে কামে আটকা পড়েছে।

: কি কাজ?

সুলতানের হয়ে যেন জবাবদিহি করেছিল বুড়ো। হেসে বলেছিল: পাইক সর্দারের কাজের কি কিছু ঠিক আছে রে! কতো দায়িত্ব। তুই মন খারাপ করিস্‌নি। আজকের দিনে মন খারাপ করতে নেই।

বাবুর্চি বুড়োর কথায় মনটা প্রবোধ মানেনি তার। মনটা খারাপ হয়েছিল। বাবুর্চি বুড়োকেও দেখেছিল ভয়-ভয় ভাব। কেমন যেন চুপচাপ।

অথচ বাবুর্চি বুড়োরই আনন্দ বেশি। শয়তান বুড়ো সফির বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী। সফি ওকে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করেছে। অতীতে বুড়োর সম্পর্কে তিক্ত স্মৃতিটা মন থেকে মুছে ফেলেছে।

বাবুর্চি বুড়োর মনটা বড় ভালো।

অতীতের সেই শয়তানটার মৃত্যু হয়েছে!

জমিলা ঘুমোচ্ছে। সফির চোখেও ঘুম-ঘুম ভাব। আকাশের তারাটা মিটিমিটি চেয়ে আছে মাটির পৃথিবীর দিকে।

হঠাৎ মৃদু শব্দ শুনে তন্দ্রাটা টুটে গেল সফির। মনটা কেমন সতর্ক হয়ে উঠল।

কে যেন এগিয়ে আসছে। সফি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে তার পায়ের আওয়াজ। বিপদের আশংকায় উঠে বসলো সে।

পদশব্দ দরোজার বাইরে এসে থামল। চুপ ক'রে রইলো অনেকক্ষণ।

তবে কি সে ভুল শুনেছে? ভাবল সফি।

না, ভুল নয়! নিশ্চয়ই কেউ এসেছে। বাইরে একজনের উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে সে। কেউ এসেছে নিশ্চয়ই।

চারিধার হাতড়াল সে। কি যেন খুঁজলো। পেল না।

আর কিছু নেই তার কাছে। সব পড়ে আছে পুরানো আস্তানায়। সর্দারের দেওয়া হাতীর বাঁটের ছুরিখানা যেটা সবসময় তার কাছে কাছে ঘোরে সেটাও রেখে দিয়েছে বাবুর্চি বুড়ো।

সফি রাখতে যাচ্ছিল। দেখতে পেয়ে বুড়ো বলেছিল : ওটা কি রে?

কোমরে গোঁজা হয়নি। দেখিয়ে ছিল।

: বুড়ো হাত পেতেছিল : ওটা আমায় দে।

: কেন?

: ওটা কাছে রেখে কি কর্‌বি?

কিছুই করবে না। কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু দিতে চায়নি। সঙ্গে রাখা বহুদিনের অভ্যাস। না থাকলে কেমন যেন লাগে।

বুড়ো বলেছিল : শাদি করতে চলেছিস্ ওটা কেন আজ? একটা দিন ওটাকে রেখে দে। ওটা কাছে থাকলে ছুঁড়িটার জওয়ানীর চেয়ে ওটার দিকে মন যাবে বেশি।

বাধ্য হয়ে ছুরিটাকে বুড়োর হাতে তুলে দিয়েছিল সফি। কিন্তু এখন মনে হ'ল কতো বড় ভুল সে করেছে।

ঠক্-ঠক্-ঠক! কে যেন দরোজায় টোকা দিল ক'বার।

সফির সর্বশরীর কেঁপে উঠল। ঘুমন্ত জমিলার দিকে চাইলো। নিজের জন্যে নয়, ওর কথা ভেবে মনটা শিউরে উঠল তার।

ঠক্-ঠক্-ঠক্। আবার সেই শব্দ।

: কে? শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে জানতে চাইলো সফি।

: আমি! দরোজা খোল। চাপাকণ্ঠে আদেশ জানালো কে যেন।

গলাটা চেনা-চেনা লাগল সফির। অতি পরিচিত।

উঠল সফি। দরোজা খুলল। সামনে দাঁড়িয়ে জামান খাঁ।

: সর্দার!

: তোকে দেখতে এলুম। শান্তকণ্ঠে বললে জামান খাঁ।

সর্দারের কণ্ঠস্বরে দু'পা পিছিয়ে এলো সফি। কথা বলতে পারল না।

জামান খাঁ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। সফিকে দেখলো চেয়ে চেয়ে। একসময় বললে: আজই শাদি হ'ল?

সফি চুপ ক'রে রইলো।

হাসলো যেন জামান খাঁ। বললে: ওখানেই গেছলুম।

: কোথায়?

: যেখানে রেখে গেছলুম তোকে। বুড়ো শয়তানটাই বললে।

: কী?

: বুড়োর খুব আনন্দ দেখলুম।

: সর্দার!

: চলি।

: সর্দার!

আর দাঁড়াল না জামান খাঁ। যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল। সফির ডাক শুনে ফিরেও চাইলো না।

সর্দারের চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো

সফি। কি হ'ল কিছুই ভাবতে পারল না সে। বুকটা শুধু কেঁপে উঠল বারবার।

ঘরে ঢুকে দেখতে পেল জমিলার ঘুম ভেঙে গেছে। চুপ ক'রে বসে আছে সে। সফি কোনো কথা বলল না।

জমিলাই কথা বলল। জানতে চাইলো : কে এসেছিল ?

: সর্দার।

: সর্দার ?

: হ্যাঁ, জমিলা।

: কেন ?

: কি জানি !

কথাটা যেন বিশ্বাস হ'ল না তার। বললে : তুমি থাকতে বললে না ?

: না।

: কেন ?

কেন সে কথা বলতে পারল না সফি। সর্দারের কথাটাই ভাবছিল সে। সর্দারের চোখ দু'টো যেন অন্ধকারে জ্বলছিল।

: চুপ ক'রে রইলে কেন ? জমিলার কণ্ঠটা কেঁপে উঠল।

: আমি—আমি……। কি যেন বলতে চাইলো সে। পারল না।

: কি, তুমি কি ? সফির কাছে এগিয়ে এলো জমিলা। ওকে ধরলো। ওর মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল কেমন যেন ভয় পেয়েছে। কাঁপছে। ওকে ধরে বসলো সে।

সফি বললে : সর্দার থাকতে আসেনি জমিলা।

: তবে ?

: জানতে এসেছিল। দেখতে এসেছিল আমার শাদি হয়ে গেছে কি-না।

: কেন ?

: কি জানি। সফির কণ্ঠটা স্খলিত। বললে : আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়…

: কী, কী মনে হচ্ছে তোমার? ভীতা জমিলা আর্তনাদ ক'রে উঠল যেন। আঁকড়ে ধরলো তাকে।

সফি বসে রইলো। নীরব নিস্পন্দ। জামান খাঁর উপস্থিতিটুকু ভুলতে পারছিল না তার মন।

ভোর হ'ল। আলো ফুটলো আকাশে। পাখির দল ডানা ঝাপটে চিৎকার ক'রে উঠল হঠাৎ।

ওরা তেমনি বসেছিল। পরস্পর পরস্পরকে ধরেছিল। আলো দেখে চমকে উঠল হঠাৎ।

দু'জনে দেখল দু'জনকে। ছেড়ে দিল।

উঠে দাঁড়াল সফি। এগিয়ে গেল দরোজার দিকে।

: কোথায় যাচ্ছো? জানতে চাইলো জমিলা।

: আসছি।

বাইরে এলো সফি। আকাশের দিকে চাইলো। আলো ফুটছে। একটু একটু ক'রে দূর হচ্ছে দুঃস্বপ্নের রাত্রির অন্ধকারটা। সূর্য ওঠার লগ্ন সমাগত।

দূরে ভাঙা কোঠিটা। সফির তিনটে বছরের আস্তানা। অতীতের স্মৃতি। ওখানে সে থাকতো, একটা দিন আগেও ছিল।

বাবুর্চি বুড়োর কথাটা মনে পড়ল। একটা শয়তান বুড়ো। একদিন অনেক শয়তানি করেছে। অনেক ঘর ভেঙেছে। আজ সফির দোস্ত। পাপের পথ পরিত্যাগ ক'রে ভালো হ'তে চায়। অনেক দেরিতে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। ভাঙা বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখনও অন্ধকারের ছায়াটা কাঁপছে। কোথাও এতোটুকু সাড়াশব্দ নেই। যারা থাকে তাদের কেউ ওঠেনি এখনও। যেন মৃত্যুপুরী!

নিজের ঘরখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। অন্ধকারটা অনেকটা ম্লান। বাবুর্চি বুড়ো শুয়ে আছে। তার ঘরে ঘুমিয়ে আছে সে।

: দোস্ত! আস্তে ডাকল সফি।

বুড়োর ঘুম ভাঙল না সে ডাকে। সাড়া দিল না।

আর ডাকল না সফি। কি হবে ডেকে! ঘুমাচ্ছে ঘুমোক।

বাইরে বেরিয়ে এলো। আকাশটা লাল হচ্ছে। একটা উজ্জ্বল দিনের সূচনা!

॥ একুশ ॥

বাবুর্চি বুড়ো ঘুমোয় নি, খুন হয়েছে। কে খুন ক'রে রেখে গিয়েছিল তাকে। গলা টিপে হত্যা করেছিল।

খবরটা পেয়েই ছুটে গিয়েছিল সফি। লাশটা বাইরে বার ক'রে এনেছিল সবাই। দিনের উজ্জ্বল অলোয় দেখেছিল বুড়োকে। চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। দু'টো হাত মুষ্টিবদ্ধ। কষ বেয়ে গড়িয়ে এসেছে রক্তের একটা শীর্ষধারা। বড় বীভৎস দেখাচ্ছিল বুড়োকে।

সেনানিবাসের ক'জন সামনের জঙ্গল আর আগাছা ভর্তি মাঠটার একধারে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দিয়েছিল দেহটা। কোরাণ-শরিফ কেউ পড়েনি, খোদাকেও ডাকেনি। শেয়াল কুকুরে দেহটাকে ছিঁড়ে না খায় কিংবা পচে দুর্গন্ধ না ছাড়ে সেইজন্যেই কাজটা করেছিল।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছিল সফি। এগিয়ে যেতে পারেনি। বুড়োকে মৃত জানার পর থেকে বুকটা কেমন কেঁপে-কেঁপে উঠেছিল তার। হত্যাকারীর পরিচয়ও যেন ··

না-না, তা কি করে হয়! হ'তে পারে না। বুড়োকে মেরে লাভ কি তার? কোনো লাভ নেই।

বাবুর্চি বুড়োর মৃত্যুতে কারোরই লাভ বা ক্ষতি হ'ল না। হয়তো অনেকে বাঁচলো। সকালে উঠে কুৎসিত মুখখানা আর দেখতে হবে না।

ক্ষতি হ'ল সফির। উপকারী বন্ধু সে। তার অনেক করেছে। অথচ এমনি মজা, যার অনেক করেছে তারই মৃত্যুতে সেই সকলের চেয়ে দূরে সরে রইলো। চোখে এক-ফোঁটা জলও এলো না।

বিচিত্র দুনিয়া! আরও বিচিত্র মানুষের মন! সেই মনই দূরে সরিয়ে রাখল তাকে। কাছে যেতে দিল না।

অথচ জীবনে স্নেহের স্বাদ ওই কুৎসিত নোংরা বুড়োটাই তাকে দিয়েছিল। একমাত্র সহায় ছিল তার। সফি তার অনেকখানি জুড়েছিল। সর্দারের ঋণের চেয়েও বাবুর্চি বুড়োর ঋণটা বড় কম নয় তার কাছে।

নিজের ঘরটায় গেল সফি। তুলে নিল হাতিয়ারের বোঝা। যেগুলো জোর ক'রে কেড়ে রেখে দিয়েছিল সে। বলেছিল: বুদ্ধু, আজ হাতিয়ার নয়, নওজওয়ানী ছুঁকরিটার কথা শোচ!

ভাবতে ভাবতেই ফিরে এলো জমিলার কাছে। বারবার বুড়োর হত্যাকারীর মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে চাইলো।

না-না, অসম্ভব। মিথ্যে। কিছু লাভ নেই! কোনো লাভ নেই। দুনিয়ায় বুড়োটাকে খুন ক'রে কেউ লাভবান হ'ল এ সত্যি নয়। ঝুট—বিলকুল ঝুট। তবু...

জমিলা বললে: তোমার দোস্ত খুন হয়েছে?

মাথা নাড়ল সফি। জানালো সত্যি।

: কেন? জানতে চাইলো জমিলা।

: কি জানি।

: বুড়ো আদমীটা...।

সফি চুপ ক'রে রইলো! জমিলাও আর কথা বললে না। তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে।

সফি ভাবল। ক'দিন ধরে তার একই চিন্তা। কে খুন করলে বাবুর্চি বুড়োকে। কেন?

বাবুর্চি বুড়োর অপরাধ কি?

জমিলা জানতে চাইলে : কি ভাবছো ?

সফি চুপ ক'রে রইলো।

: দোস্তের কথা ভাবছো ?

'হ্যাঁ,' 'না' কিছুই বললে না সফি। ভাবল জমিলা তার মনের কথা জানলো কি ক'রে। ওরা কি সব জানতে পারে ? সবকিছু!

তাহলে বাবুর্চি বুড়োর খুন হওয়ার কারণটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে! হত্যাকারীর পরিচয়টাও। যা তার মনটা মেনে নিতে পারছে না। ভাবছে···

কিন্তু সবকিছুই এখন, এই মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। অন্ধকারের লেশমাত্র রইলো না আর।

সুলতান সৈফুদ্দীন শোনালেন নতুন কথা। তার ভবিষ্যতের কথা। নতুন পরিচয়। আর এইজন্যেই বাবুর্চি বুড়ো খুন হয়েছে। দোস্তের কাজ করেছে সে।

জামাল খাঁ নয়, সফি হবে নতুন পাইক সর্দার। জামাল খাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে চান সৈফুদ্দীন। সফি তার নসিবকে খোদার আশীর্বাদ ব'লে মেনে নিতে পারে।

সৈফুদ্দীন বললেন : সফি, তুমি পাইক সর্দার হবে ?

: আমি ? কথাটা শুনে চমকে উঠল সফি। মনে হ'ল সুলতান তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে।

কিন্তু সৈফুদ্দীন গম্ভীর। পরিহাসের কোনো চিহ্নমাত্র নেই তাঁর চোখে-মুখে। বললেন : হাঁ, তুম।

ভাবতে পারল না সফি। প্রশ্ন করলে : ক্যাহে ?

প্রশ্নটা শুনে একটু চিন্তা করলেন সৈফুদ্দীন। দ্বারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিস্মিত সফির মূর্তিটাকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে চেয়ে দেখলেন। তার পর একটু জোরের সঙ্গে বললেন : ম্যায় তুমনে সর্দার বানানে চাতা সফি।

: কিঁউ ? আবার সেই প্রশ্নটাই সফির কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল।

এবার হাসলেন সৈফুদ্দীন। অনেকক্ষণ ধরে সফিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। বললেন: তোমার যোগ্যতার জন্যে। আমি তোমার কাজে খুশি। আমি তোমাকে সর্দার বানাতে চাই।

: কিন্তু…

: কী?

: জামান খাঁ।

: জামান খাঁ?

: হ্যাঁ।

সফির বাধা যেন জামান খাঁ। জামান খাঁ না থাকলে সুলতানের কয়েক সহস্র পাইকের সর্দারী নিতে কোনো আপত্তি নেই তার। তাই বুঝলেন সৈফুদ্দীন। বললেন: তোমার সর্দারের কথা পরে বলছি। আগে বল তুমি সর্দার বানতে চাও কি-না?

সুলতানের স্পষ্ট জিজ্ঞাসা। সফি কিছু বলতে পারল না। কিছু বলা সম্ভব হ'ল না তার পক্ষে। সর্দারকে হটিয়ে সর্দার বানতে সে চায় না। কারণ, জীবনে তার অনেক ঋণ সর্দারের কাছে। যে তাকে কুত্তার জীবন থেকে আদমীর জীবনে ফিরিয়ে এনেছিল তার সঙ্গে কেমন ক'রে বেইমানী করবে?

তাছাড়া, এই যে ভবিষ্যৎ! যে ভবিষ্যৎটার কথা সুলতান বললেন। তার কাছে জানতে চাইলেন। সে চায় কি-না, সে ভাবেনি। লোভের ছায়া কোনোদিন স্থান দেয়নি মনে। ক্ষমতা তো লোভেরই ফসল। কেউ ক্ষমতার অধিকারী হ'তে চায়, কেউ-বা অর্থের। অতি লোভীর দল অর্থ ক্ষমতা সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছুই কামনা করে। যার জন্যে মন থেকে স্নেহ-মায়া-মমতাটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। তারা শয়তান হয়ে ওঠে।

সফি এর কিছুই চায়নি। অর্থ বা ক্ষমতা কোনোটার জন্যেই কাঙাল হয়ে ওঠেনি তার মন। সে চেয়েছে সুখ-শান্তি-ভালোবাসা। ভেবেছে মানুষের কথা। যারা নিরন্ন, আশ্রয়হীন। তাদের জন্যে খোদার

কাছে দোয়া ভিক্ষা করেছে। তাদের দুঃখের দরদী বন্ধু সুলতানের মঙ্গল কামনা করেছে।

সুলতান এখন নতুন কথা বললেন। ভিন্ন সুরে। কেমন যেন সন্দেহ জাগলো তার মনে। তবু মনের সন্দেহটা প্রকাশ করতে পারল না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।

: সফি। সৈফুদ্দীন ডাকলেন।

সফি তাঁর মুখের দিকে তাকালো।

: আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। তোমার দ্বিধা কোথায়! লেকিন ·····

সফি তবু নীরব। আবার সে মাথা নত ক'রে নিয়েছে।

: জামান খাঁ আমার সঙ্গে বেইমানী করেছে সফি!

চমকে উঠল সে। বললে : বেইমানী করেছে?

: হ্যাঁ, সফি!

জামাল খাঁ শয়তান! দুশমনি করেছে সে সুলতানের সঙ্গে। ঠকিয়েছে। দুশমনের শায়েস্তার ভার তাই তিনি তাকে দিতে চান।

: সফি! ডাকলেন সৈফুদ্দীন।

সফি সুলতানের মুখের দিকে চাইলো। সুলতানের কথাগুলো মিথ্যে মনে হ'ল। বড় চতুর ব'লে মনে হ'ল সৈফুদ্দীনকে। স্বার্থ। সর্দারের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত বেধেছে তাই সময় থাকতে হুঁশিয়ার হ'তে চাইছেন তিনি। সফি জান বাঁচাবে তাঁর। দুনিয়ার আলোয় জিন্দা রাখবে! আর মসনদে বসে সুলতানি করবেন তিনি।

মিথ্যে। সব মিথ্যে। এতোদিন একটা মিথ্যেকে আঁকড়ে পড়েছিল সে। একটা প্রবল ঘৃণায় সমস্ত শরীরটা রি-রি ক'রে উঠল তার। সুলতানের মূর্তিটা হারিয়ে গেল। মানব দরদী নয়, এক স্বার্থপরের তসবির সেখানে।

সফি ভাবল। সুলতানের সামনে আর একটা মুহূর্তের জন্যেও

তার দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। নিজেকে সংযত রাখার ক্ষমতাটা সে হারিয়ে ফেলছিল ক্রমশঃ।

: জানো সফি! কথা বললেন সৈফুদ্দীন। জমিলার সঙ্গে তোমার শাদি সর্দার চায়নি।

: চায়নি! আবার ভীষণভাবে চমকে উঠল সফি।

: না। আমাকে স্পষ্ট জানিয়ে ছিল আমি যেন তোমার শাদি না দিই।

: কেন?

: তোমার সর্দার ভেবেছিল আমি তোমার শাদি দিলে তুমি তার এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাবে। আমার হুকুমে চলবে। তার সঙ্গে বেইমানী করবে।

: বেইমানী করবো?

: তাই বলেছিল জামান খাঁ। তোমার সব কথা। জানো, সে তোমাকে খতম করতে চেয়েছিল।

: খতম করতে চেয়েছিল?

: হ্যাঁ। তুমি যদি আগের আস্তানায় থাকতে নিশ্চয়ই খুন হ'তে।

খুন হোত! আগের আস্তানায় থাকলে খুন হোত সফি! সর্দার তাকে জানে খতম ক'রে দিত! এতোটুকু দয়া করতো না।

সফি বেঁচে আছে। নেই বাবুর্চি বুড়ো। পুরানো আস্তানায় সফির ঘরে খুন হয়েছে বুড়ো। গলাটিপে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

তবে কি? চমকে উঠল সফি। তাই, নিজের জান দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে গেল বাবুর্চি বুড়ো! হয়তো বাবুর্চি বুড়োকে খুন করার পরই খুনের নেশাটা কেটে গিয়েছিল সর্দারের। না হ'লে সেদিন রাত্রে সেও নিশ্চয়ই খুন হোত।

: সফি!

সুলতানের মুখের দিকে চাইলো সে।

: কি ভাবছো?

সফি চুপ ক'রে রইলো।

ঃ আচ্ছা সফি, সর্দারের কথায় তুমি জান দিতে পার? হঠাৎ কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন সৈফুদ্দীন।

কিছু ভাবল না সফি, করল না কোনো চিন্তা। বললে ঃ পারি।

ঃ আমি জানি। হাসলেন সৈফুদ্দীন। ব্যথিত কণ্ঠে বললেন ঃ যার জন্তে তুমি হাসতে হাসতে সব পারো, জানের পরোয়া করো না, কিন্তু আজ যদি সে তোমাকে পায় নিশ্চয়ই খতম ক'রে দেবে। কেন জানো? তুমি সাচ্চা। ঝুটা বলতে জানো না। বুরা কামকে তুমি ঘৃণা করো। সেইজন্যে, শুধু সেইজন্যেই জামান খাঁ তোমাকে পেলেই খতম ক'রে দেবে। লেকিন, আমি—আমি তোমার আচ্ছা চাই সফি। আমি তোমাকে পেয়ার করি।

সফি কোনো প্রশ্ন করল না। কিছু জানতে চাইলো না। সুলতান সৈফুদ্দীনের উদেশ্য তার কাছে স্পষ্ট। সৈফুদ্দীন ধরা পড়ে গেছেন। শয়তানি ধরতে পেরেছে সে। গরীবদের জন্যে দরদটা মিথ্যে অভিনয়। সত্য স্বার্থ। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এতোদিন অভিনয় ক'রে গেছেন তিনি।

হাবশী সৈফুদ্দীন। ভাগ্যান্বেষী অসংখ্য হাবশীর মধ্যে একজন। এসেছিলেন ভাগ্য ফেরাতে। দু'বেলা খেয়ে বাঁচতে। নসিব তাঁকে সুলতান বানিয়েছে। গৌড়ের মসনদে বসেছেন। বাংলার মানুষের ভাগ্যবিধাতা হয়েছেন। লক্ষ্য ছিল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাই ভালো সেজে সর্বনাশ ক'রে গেছেন এতোদিন। কেউ ধরতে পারেনি, জানতে পারেনি।

সফিও হয়তো কোনোদিন জানতে পারতো না। ভুল ক'রে একটা শয়তানকে ভালোবেসে যেত, শ্রদ্ধা ক'রে যেত। নিজের জানটা হয়তো দিয়ে দিত প্রয়োজন হ'লে।

আজ আর হয়তো পারবে না সে। আজ তার কাছে সবকিছুই স্পষ্ট, স্বচ্ছ। এতোটুকু অন্ধকারের ছায়ামাত্র নেই কোথাও।

সৈফুদ্দীনকে দেখলো সে, গবাক্ষের কাছে রক্ষিত আসনটায় বসে আছেন। চেয়ে আছেন বাইরে। রাতের অন্ধকারটা পরিষ্কার হচ্ছে। আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। পাখিরা ডাকছে।

এক সময় আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন সৈফুদ্দীন। সমস্ত কক্ষটায় ঘুরে ঘুরে পায়চারি করলেন ক'বার। সফির সামনে এসে দাঁড়ালেন। গম্ভীর মুখ। ঈষৎ ফোলা আরক্ত চোখ দু'টো তীক্ষ্ণ। ডাকলেন: সফি!

সফি নীরবে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

: তুমি যদি সর্দার বানতে না চাও আমি জোর করবো না। বললেন তিনি। তুমি যেমন আছ তেমনি থাকবে। লেকিন······

সফির দৃষ্টিটা স্থির। কথা বলল না সে।

: তুমি সর্দার বানতে চাও না? জানতে চাইলেন তিনি।

: না। সফি নয়, কে যেন তার মুখ দিয়ে বললে কথাটা। এমন ভাবে অস্বীকার করতে সে চায়নি।

: না! আশ্চর্য হ'লেন তিনি।

: হ্যাঁ, জাহাঁপনা।

: ক্যাহে?

: ম্যায় সকেগা নেহি।

: কোন্ বোলা?

: ম্যায় জানতা হুঁ।

: ঝুট! হাসলেন তিনি। যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'তে চলেছে। বললেন: আমি জানি তুমি পারবে। সে সাহস বা ক্ষমতা তোমার আছে।

: কিন্তু······

: ডর মৎ! তিনি ধরলেন তাকে। বললেন: আমি জানি ব'লেই সাহসী হয়েছি। নাহলে······

: কী?

: জামান খাঁর কথাই আমি মেনে নিতাম। তার চাহিদা মেটাতাম। সে এখন যা চায় তাই দিতে বাধ্য হতাম তাকে।

: কি চায় ?

সফি যেন স্বপ্ন দেখছে। নতুন কথা শুনছে। পাইক সর্দার আর সুলতানের গোপন সম্পর্কের সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।

: অনেক—অনেক চায় তোমার সর্দার। জামান খাঁ আমার সঙ্গে বেইমানী করতে চায়। আগের সব কথা এখন সে মানতে চায় না।

: কী ?

: আমাদের হিস্যার গরমিল। আজ সে আমাকে বলছে আমি তাকে ঠকাচ্ছি। তাঁকে ফাঁকি দিচ্ছি।

সফির নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। চিন্তার শক্তি অবশ-শিথিল। সে কিছু ভাবতে পারছে না।

হঠাৎ যেন সংবিত ফিরে পেলেন সৈফুদ্দীন। সফির মুখের দিকে চেয়ে ব্যস্তভাবে জানতে চাইলেন : কি হ'ল সফি ?

: কিছু নয়।

: তোমার চোখ-মুখ……

: আমি যাবো ?

: যাবে ? হ্যাঁ, যাও।

চলে আসছে সফি। শরীরটা কাঁপছে তার। সে পালাতে চায়।

সৈফুদ্দীন বললেন : তোমার ভালো চাই আমি।

সৈফুদ্দীনের কথাটা কানে এলো তার। কিন্তু দাঁড়াল না। মাথাটায় আগুন জ্বলছে যেন। সফি পালিয়ে এলো।

॥ বাইশ ॥

আকাশের সূর্যটা এখন উজ্জ্বল। কোলাহল শুরু হয়েছে চারিদিকে। কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানুষ।

সফি ফিরে এলো।

জমিলা যেন প্রতীক্ষায় ছিল তার। দূর থেকে দেখতে পেয়েই ছুটে এলো কাছে। দু'হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো বুকে।

সফি আজ গম্ভীর। যেন অন্য মানুষ। তবু জমিলা যখন তার দু'বাহুতে কণ্ঠটা বেষ্টন ক'রে বুকের সঙ্গে মিশে যেতে চাইলো তখনও সে অনমনীয় দৃঢ়তায় নিজেকে কঠিন ক'রে রাখল। অন্যদিনের মতো আদরে-সোহাগে তাকে ভরিয়ে তুলতে পারল না। অস্থির ক'রে তুললো না লজ্জায়।

অথচ জমিলার কাছে ফিরে আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ভেবেছে সে সহজ হবে। জমিলাকে বুঝতে দেবে না তার মনের অশান্তিটা। কিন্তু পারল না। শত চেষ্টাতেও সহজ হওয়া সম্ভব হ'ল না তার পক্ষে।

রাতের প্রহরী সে। সারারাত্রির জাগরণ-ক্লান্ত দেহে ঘরে ফেরে। প্রতীক্ষায় থাকে জমিলা। দেখতে পেলেই চঞ্চলা হরিণীর মতো ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে।

জমিলার স্পর্শে দেহে যেন নবজীবনের সাড়া জাগে। মুছে যায় সব ক্লান্তি। দু' বাহুর কঠিন বন্ধনে জড়িয়ে ধরে জমিলার হালকা নরম দেহটাকে। অস্থির ক'রে তোলে।

জমিলা বলে : ছাড়ো।

: উঁহু।

: ছাড়ো বলছি।

: না।

: না কেন ?

: না, এইজন্যে—তুমিই প্রথম…

: তাতে কি ?

: সেইজন্যেই…

: এই—এই কি করছো ! ছাড়ো বলছি। ছিঃ !

জমিলা জোর ক'রে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয়। দূরে সরে যায়।

হাসে সফি। প্রাণ খোলা অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তে চায়। বলে : কি হ'ল, পালালে কেন ?

: অসভ্য।

: কেন ?

: দেখো কাল থেকে আর আসবো না।

: আজ তো এসো।

: না।

: জমিলা !

জমিলা সে ডাকে সাড়া দেয় না। বলে : সারারাত জেগেছো। গোসল ক'রে এসো এখন। আমি নাশ্‌তা বানিয়ে রেখেছি।

: আমার খিদে নেই।

: কেন ?

: খিদে নেই যে।

: মিথ্যে বলছো। নিশ্চয়ই রাগ করেছো ?

: রাগ করবো কেন ?

: না-না, সত্যি বল ?

: আগে তুমি কাছে এসো।

: ন-না।

: বেশ, আসতে হবে না।

রাগের ভান করে সফি। শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ব্যস্ত হয় জমিলা। ব্যাকুল কণ্ঠে বলে : শু'লে যে?

: ভীষণ ঘুম পেয়েছে।

: না-না।

নিরুপায় জমিলা কাছে আসে। সফি তাকে টেনে নেয় কাছে। জমিলা বাধা দেয় না আর। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

কোনোদিন বা দূরে সরে থাকে জমিলা। কপট অভিমানে এড়িয়ে যেতে চায় তাকে। সফি কিন্তু কোনো বাধাই মানে না, জোর ক'রে টেনে নেয় বুকে। আদরে-সোহাগে অস্থির ক'রে তোলে।

আজ ভিন্ন রূপ সফির।

বিস্মিত হ'ল জমিলা। অজানা আতংকে বুকের মধ্যেটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। সফির মুখটা আজ পাষাণের মতো স্থির—কঠিন।

: কি হ'ল তোমার? ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইলো জমিলা।

: কিছু না। যথাসম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করল সফি। পারল না।

: তবে? কি এক প্রত্যাশায় সফির মুখের দিকে তাকালো জমিলা।

: কি?

জমিলা বলতে পারল না। লজ্জায় ভারী হয়ে এলো তার চোখের পাতা। ব্যর্থ অভিমানে একটু দূরে সরে গেল। মনের আকাশে আজ তার ঝড়ের তাণ্ডব। সব বুঝি চূর্ণ হয়ে যাবে! গুমরান কান্নার কুণ্ডলীটা বুক ঠেলে কণ্ঠনালীর কাছে উঠে এলো। তবু সে কাঁদতে পারল না। শুধু অসহায় দৃষ্টিতে সফির সেই লৌহ-কঠিন মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলো।

সফি দেখলো জমিলাকে।

সুলতান তাকে ভেট দিয়েছেন। একটা জীবন্ত নারীদেহ। যে দেহের জন্যে পুরুষ লালায়িত, পাগল হয়! সুখ খোঁজে। কামনা চরিতার্থ করতে চায়। কামের দাসত্ব ক'রে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অমানুষ হয়ে ওঠে। ভালো-মন্দ-পাপ-পুণ্যের বিচার ভুলে যায়।

সুলতান তাই চেয়েছিলেন। সুলতান সৈফুদ্দীন ফিরোজশাহ্ নিশ্চয়ই বেগমের পরামর্শে জমিলার দেহটাকে তুলে দিয়েছেন। হারেমের বাঁদী। অধিকার সম্পূর্ণ সুলতানের। যদি প্রয়োজন বোধ করেন যে-কোনো মুহূর্তে ছিনিয়ে নেবেন। জমিলা আবার ফিরে যাবে সেই নরককুণ্ডে। সফির সাধ্য হবে না তাকে আটকে রাখা। জোর ক'রে নিজের অধিকার রক্ষা করা।

জমিলার দেহটা শুধুমাত্র উপভোগের জন্যে। সফির বেইমানীর হাতিয়ার। সন্দেহের অবকাশ নেই। সবই স্পষ্ট। তবু···

মাথায় তার আগুন জ্বলে উঠল। ইচ্ছা হ'ল···

না, অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করল সফি। বিস্মিতা আতংক-গ্রস্তা জমিলার সামনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখতে লাগল। ওর মুখ-চোখ, গাল-গলা, বুক—সব কিছু। পাকা জহুরীর মতো ওকে নিরক্ষণ করল। নারীদেহের প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি রেখা।

অস্বস্তি বোধ করল জমিলা। একটু যেন ভয় পেল। সফির অস্বাভাবিক দৃষ্টিটা বারবার কাঁপিয়ে তুললো তার বুকটা। ক্ষীণ কণ্ঠে বললে : কি হয়েছে ?

: তোমাকে দেখছি।

: দেখনি ?

: দেখেছি।

: তবে ?

: আজ আবার দেখছি।

: কেন ?

: কেন ? হাঃ হাঃ ক'রে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তে ইচ্ছে করল সফির। জমিলার নির্বোধ প্রশ্নটা তাকে হঠাৎ ক্ষিপ্ত ক'রে তুললো। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে : পেয়ার কাকে বলে জানো জমিলা ?

: কেন ?

: জানো কি-না তাই বল।

: কি জানি!

: জানো না?

: বোধহয় না।

: তবে? ভাবল সফি। অস্থির হয়ে উঠল। পাগলের মতো ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ। হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠল: ঝুট, বিলকুল ঝুটা।

: না, প্রবল আপত্তি ক'রে উঠল জমিলা। সফির কথার প্রতিবাদ জানালো।

: না? থমকে দাঁড়াল সফি। জমিলার কাছে এগিয়ে এলো। ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। বললে: সব সত্যি।

: না। আবার প্রতিবাদ জানালো জমিলা।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সফি। তীব্রকণ্ঠে বললে: তুমি তো বাঁদী!

: হ্যাঁ।

: তোমার মালিক সুলতান। তোমার সবকিছু ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাঁর অধিকারে। তোমার নিজস্ব বলতে কিছু নেই।

: কে বললে?

: সবাই বলবে, আমিও বলছি।

: সত্যি নয়।

: সত্যি নয়? গর্জে উঠল যেন সফি। বললে: সুলতান যদি তোমাকে আবার হারামে নিয়ে যায় তুমি যাবে না? তুমি এখানে থাকতে পারবে? বলতে পারবে তুমি যাবে না?

: তা পারি না।

: তবে?

: কি?

: তোমার কোনো অধিকার নেই। সুলতানের হুকুমেই তুমি আমাকে শাদি করেছো। তাঁর হুকুম মানতে তুমি বাধ্য।

জমিলা চুপ ক'রে রইলো। এবার আর কোনো প্রতিবাদ উচ্চারিত হ'ল না তার কণ্ঠে।

সফি ছটফট করছিল। কি করবে, কি বলবে সে ভেবে পাচ্ছিল না।

জমিলা দেখলো তাকে। ওর অস্থিরতা তাকেও অস্থির ক'রে তুলছিল। ওকে কিছু বলতে চাইছিল সে, কিন্তু পারছিল না।

একসময় আবার কিছুটা শান্ত হ'ল সফি। জমিলার কাছে এগিয়ে এলো। ডাকল : জমিলা!

: বল। জানতে চাইলো সে।

: মরতে তুমি ভয় পাও?

সফির কথাটা শুনে চমকে উঠল জমিলা। বারেক কেঁপে উঠল ঠোঁট দু'টি। কথা বলতে পারল না। শুধু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো ওর মুখের দিকে।

সফি মরিয়া। ডাকল : জমিলা!

: বল!

: মরতে তুমি ভয় পাও?

: কেন?

: মরতে তুমি ভয় পাও?

: না।

: না? থমকে গেল সফি। জমিলা মরতে ভয় পায় না। ইচ্ছে করলেই জমিলা মরতে পারে যখন তখন।

না-না, অসম্ভব। বিশ্বাস করতে পারল না সে। মরতে সে যে ভয় পায় না তা সত্যি নয়। তবে একটা পাইকের মৃত্যু যখন তখন ঘটতে পারে। যে-কোনো মুহূর্তে। একথা জানা ব'লেই ভয় পায় না। শুধু লক্ষ্য রাখে মৃত্যু যেন চুপি চুপি না আসে। পাইক লড়ে মরতে চায়। শত্রুকে মেরে। সে এই শিক্ষাই পেয়েছে।

কিন্তু জমিলা কেন ভয় পাবে না? মৃত্যুকে তুচ্ছ করার সাহস কোথায় পেল ও। বললে : মরতে তুমি ভয় পাও না?

: না।

: কেন?

: কেন? সফির প্রশ্নের ধারাটা যেন বুঝতে পারল জমিলা। সহজ কণ্ঠেই বললে: এতোদিন তো মরেই ছিলুম।

: মরেছিলে?

: হ্যাঁ।

: এখন? তবু যেন সন্দেহ যায়নি তার।

: তুমি আমাকে জিন্দা করেছো!

: জমিলা! সফির কণ্ঠটা কেঁপে উঠল। সে যেন স্বপ্ন দেখছে।

জমিলার ওষ্ঠে মৃদু হাসির স্পষ্ট রেখা। জমিলা রহস্যময়ী। বললে: একদিন ভয় ছিল, ভীষণ ভয়। এখন আর আমার কোনো দুঃখ নেই।

: জমিলা!

: সত্যি বলছি। এখন আমি সব পারি।

: জমিলা!

: বিশ্বাস করো!

অস্থির চঞ্চল একটা মানুষের মন তাকে আঁকড়ে ধরলো। শরীরের সমস্ত শক্তিতে চেপে ধরলো বুকে। সেও বাঁচতে চায়!

জমিলা স্বপ্ন দেখছে। নতুন দিনের। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

অজানা পথের যাত্রী তারা দু'জন। দীর্ঘপথ। অবিরাম চলেছে, দিনের পর দিন; তবু ক্লান্তি নেই। অবসন্নতার লেশমাত্র স্পর্শ করেনি। যৌবনের আনন্দে তারা মাতাল, আত্মহারা। তারা বাঁচতে চায়। পথের ঠিকানা খোঁজে।

সফিও সেই কথাই ভাবে। সন্ধ্যার মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন রচনা করে। জমিলাকে ঘিরে সে তার মনের আয়নায় ছবি আঁকে!

সুলতান নেই। সফির ছুটি। মাত্র দু'দিনের জন্যে সৈফুদ্দীন গেছেন। সে যেতে চেয়েছিল সঙ্গে, নিয়ে যাননি।

সৈফুদ্দীনের এভাবে একাকী যাওয়া এই প্রথম। প্রাসাদের কেউ জানে না তিনি হঠাৎ কোথায় গেছেন। শুধু তাকেই জানিয়ে গেছেন মাত্র দু'দিনের জন্যে যাচ্ছেন তিনি।

সফি বলেছিল : আমিও যাবো।

হেসে মাথা নেড়ে ছিলেন তিনি। বলেছিলেন : এবার আমার সঙ্গে কেউ যাবে না।

: যদি…

: সেইজন্যেই সঙ্গে কেউ যাবে না। খোদা আমার ভরসা।

সফি আর কিছু বলেনি। কোথায় যাচ্ছেন জানতেও চায়নি। শুধু বুঝতে পেরেছিল সুলতান এমন কোথাও এবং এমন কারো কাছে যাচ্ছেন যেখানে যে-কোনো মুহূর্তে খতম হ'তে পারেন তিনি। তবু জেদের বশে বা গোপনীয়তার প্রয়োজনে কাউকে সঙ্গে নিচ্ছেন না।

তবে কি সর্দারের কাছেই গেলেন?

ভেবেছিল সফি। ক'টা দিন তার কিভাবে যে কেটেছে তা জানে না। সুলতান তাকে সর্দার বানাবে। কথাটা বলার পর মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠেছিল তার। অন্তরটা ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল। স্বার্থের নগ্ন রূপটা তাকে পাগল ক'রে তুলেছিল। মুক্তি চেয়েছিল। একটু আলো। অন্ধকারটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু মুক্তি দেবে কে? তার মুক্তিদাতা, প্রভু জামান খাঁ। জীবনটা সর্দারের কাছে বাঁধা আছে তার। বিনা হুকুমে কিছু করার অধিকার তার নেই।

জমিলা বুঝিয়েছিল। শাদি করতে চেয়েছিল।

সৈফুদ্দীন নীরব ছিলেন তার পর থেকেই।

জামান খাঁর কথা সে জানে না।

ভালো লাগেনি তার। সুলতান চলে যাবার পর থেকেই আবার অস্থির হয়ে উঠতে চেয়েছে মনটা। একটা অশুভ ছায়া মনটা ঘিরে বিস্তার লাভ করেছে। সমস্ত দিন একলা থাকতে চেয়েছে।

জমিলা কিন্তু চেপে ধরেছে একসময়। বলেছে: তোমার কি হয়েছে বল তো?

নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করেছে সে। বলেছে: কিছু হয়নি।

: সত্যি বলছো কিছু হয়নি? কথাটা বিশ্বাস করেনি জমিলা। ক'দিন আগের সেই আতংকের ছায়াটা তার মুখে-চোখে ফুটে উঠেছে।

: কি হবে? যেন বিরক্ত হয়েছে সে।

: তাই তো জানতে চাইছি।

: কিছু হয়নি আমার।

: বেশ।

: কী?

: আমার বুকে হাত দিয়ে বল কিছু হয়নি তোমার।

জমিলার সন্দেহটা মিথ্যে প্রমাণিত করতে তার বুকে হাত দিয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই সরিয়ে নিয়েছে হাতটা।

: কী হ'ল: কেঁপে উঠেছে জমিলার কণ্ঠটা।

সে চুপ ক'রে থেকেছে।

: বলবে না? অনুনয়ে ভেঙে পড়তে চেয়েছে জমিলা।

আরও অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকেছে সে। এক সময় হতাশ কণ্ঠে বলেছে: আমি আর পারছি না—জমিলা। আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব।

জমিলা তার মুখে হাত চাপা দিয়েছে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলেছে, না-না, ওকথা তুমি বোল না।

সফি বলেছে: আমি সত্যি কথা বলছি জমিলা। দিন-দিন আমি অস্থির হয়ে পড়ছি। আমি আর পারছি না। এ-বোঝা বড় কঠিন লাগছে আমার।

নীরব হয়েছে সে। জমিলাও নীরবে বসে থেকেছে অনেকক্ষণ। এক সময় দীর্ঘশ্বাসের শব্দে তার মুখের দিকে চেয়েছে। মাথা নত করেছে জমিলা।

: জমিলা! আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ডেকেছে সফি।

জমিলা মুখ তুলেছে। তার ঠোঁট দু'টি থর-থর। কথা বলতে পারেনি। দু'ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়েছে।

: জমিলা!

: উঁ!

: কি হ'ল জমিলা?

: কিছু না।

: বলবে না?

ধীরে ধীরে স্পষ্ট চোখে তার মুখের দিকে চেয়েছে জমিলা। বলেছে: একটা কথা বলবো?

: বল।

: চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

: চলে যাবো?

: হ্যাঁ।

: কোথায়?

: তা জানি না।

: তবে?

: যেখানে হোক। অনেক দূরে।

: অনেক দূরে!

: হ্যাঁ, অনেক দূর যেখানে......

: কিন্তু আমি যে পথ চিনি না। তাছাড়া, তোমার যে কষ্ট হবে!

জমিলার মুখে এক টুকরো হাসি ফুটেছিল। সফির বুকে হাত রেখে বলেছে: তুমি সঙ্গে থাকলে একটুও কষ্ট হবে না আমার। আমি ঠিক পারবো।

॥ তেইশ ॥

: ওস্তাদ! চাপাকণ্ঠে কে যেন ডাকল তাকে।

চমকে উঠল সফি : কে?

: আমি ওস্তাদ, বাহারাম।

: বাহারাম! কেন?

: বিবিজী আপনাকে ডাকছেন ওস্তাদ!

: নজরবিবি?

: হ্যাঁ, ওস্তাদ। তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

: কেন?

: আপনাকে জরুরী দরকার। আসুন।

: না। মনটাকে কঠিন করল সফি।

: ওস্তাদ!

: তোমার বিবিজীকে বলগে আমি যাবো না।

: ওস্তাদ!

: তুমি চলে যাও। সফি কঠিন, কঠোর।

অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও সফি বুঝতে পারল বাহারাম যায়নি। একটু পরে তার ম্লান কণ্ঠটা শোনা গেল: বিবিজী চলে যাচ্ছেন ওস্তাদ! আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান শুধু!

: নজরবিবি চলে যাচ্ছে?

: হ্যাঁ, ওস্তাদ।

বাহারাম চুপ ক'রে রইলো।

: বাহারাম!

: সুলতানের হুকুম বাইরের জানানা হারেমে রাখা চলবে না। শাহ্‌জাদা রাখতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন রাখবেন তিনি। বিবিজীই থাকতে রাজীই হ'লেন না।

: কোথায় যাবেন তিনি ?

: তা জানি না। হয়তো……

বাহারাম চুপ ক'রে গেল। খোজটাও উচ্চারণ করতে পারল না লজ্জার কথাটা। বলতে পারল না নজরবিবি তার পুরানো জীবনটাতেই ফিরে যাচ্ছে। অতীতের নজরজান এবার হয়তো নতুন নামে পরিচিত হবে মানুষের কাছে!

সুখ-সম্পদ-ঐশ্বর্য কতো মিথ্যে জীবনে! ক্ষণস্থায়ী সৌভাগ্য কতো মর্মান্তিক পরিহাস। নসিব! খোদার দুনিয়ায় নিত্যনূতন লীলা উত্থান-পতনের ইতিহাস মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না, সংসারে সে শুধু খেলার পুতুল। খোদার ইচ্ছে ভিন্ন আপন ভাগ্য গড়ার সাধ্য তার নেই।

নজরবিবির জন্যে দুঃখ হ'ল সফির। নজরজান হয়তো বাঁচতে চেয়েছিল। নিত্যদিনের গ্লানি থেকে সে হয়তো মুক্তি খুঁজেছিল। স্বপ্ন দেখেছিল সুখের, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

বাহারাম ডাকল : ওস্তাদ!

: হ্যাঁ!

: যাবেন ?

: নজরবিবি কোথায় ?

: আসুন।

এগিয়ে চলল বাহারাম। তাকে অনুসরণ করল সফি।

মনে পড়ল জমিলার কথা। জমিলার মুখটা। ঘরে আলো জ্বলছে। কাজ করছে জমিলা। আজ তার কাজের শেষ নেই। নিজের সংসারে ব্যস্ত সে বড়।

অতীতের কথাটা মনে পড়ল তার। নিষ্ঠুর স্মৃতি! সফি আজ ভয় পেল না। নজরবিবির দুঃখটা তাকে টেনে নিয়ে গেল।

বাহারাম এগিয়ে চলেছে। সফি পেছনে চললো তার। পথের মানুষ যারা তখনও ঘরে ফেরেনি। তারা চেয়ে চেয়ে দেখলো তাদের। হয়তো অবাক হ'ল! কারণ বাহারামকে অনেকেই চেনে, সফিকেও।

অবশেষে গিয়ে দাঁড়াল বাহারাম। সফিও দাঁড়াল।

বাহারাম ডাকল : ওস্তাদ!

: বল।

: আপনি একটু দাঁড়ান।

বাহারাম চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইলো সফি।

অদূরে ভাগীরথী। জলের শব্দ কানে আসছে। আকাশের অন্ধকারটা ম্লান। চাঁদ ওঠেনি আজ। তারার আলোয় অস্পষ্টভাবে লক্ষ্য হয় সবকিছু। পরিচিতরা কাছে এলে চেনা যায়।

একসময় বোরখাবৃতা নজরবিবি কাছে এসে দাঁড়াল।

সফি দেখলো নজরবিবিকে। সেই আলো-ছায়ায় স্পষ্ট দেখা না গেলেও তার মনে হ'ল নজরবিবির মুখটা বড় ম্লান আর শীর্ণ হয়ে গেছে।

নজরবিবি অনেকক্ষণ দেখলো তাকে। এক সময় তার মৃদু কণ্ঠটা শোনা গেল : আমি জানতাম তুমি আসবে।

: জানতেন?

: হ্যাঁ, দোস্ত! আমি জানতাম তুমি আসবে।

: কেমন ক'রে?

: কেমন ক'রে! হাসলো নজরবিবি। নজরবিবির হাসিটা স্পষ্ট শুনতে পেল সফি। বললে : সত্যি কথা বললে তুমি বিশ্বাস করবে?

: কে নয়?

: আজ তোমার ডর নেই। তুমি আজ আর কোনো ভুল করতে পার না। তোমার মনটা আজ বড় বেশি সাহসী হয়ে উঠেছে দোস্ত!

নজরবিবির কথার একটি বর্ণও বুঝতে পারল না সফি। তবে নজরবিবি যা বললে তা সত্যি। সত্যিই আজ আর তার মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই। নজরবিবির ডাক শুনে দ্বিধা জেগে ছিল, মনটা সাবধানী হয়ে উঠেছিল, একটু ঘৃণাও; কিন্তু ভয় পায়নি।

সফিকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে নজরবিবি বললে: বুঝতে পারল না তো? জমিলা যে আজ তোমার রক্ষা কবচ। জমিলা আজ তোমাকে আগলে রেখেছে। কার সাধ্য তোমার ক্ষতি করে, ছিনিয়ে নেয়! লেকিন···

: কী?

সফির সে জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর দিল না নজরবিবি। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। কি যেন ভাবছে। এক সময় চোখ তুললো। সফিকে দেখলো। বললে: একটা কথা এখন বড় মনে পড়ছে। এখানে তোমাকে দেখার পর থেকেই। একটা শের। এক পাগলা খায়ের অনেক দিন আগে আমাকে শুনিয়ে ছিল। আমি ভুলে গিয়েছিলাম তার কথা, তার শেরটাও। সে আমাকে শুনিয়ে ছিল। আজ তোমাকে শোনাতে ইচ্ছে করছে আমার।

: কেন?

: তা জানি না। তবে বিদায় বেলায় সে কেঁদেছিল। আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। আমি ডেকেছিলুম তাকে। জাগাতে চেয়েছিলুম। তার ঘুম ভাঙেনি। সেদিন যদি তার ঘুম ভাঙতো তাহলে আজ হয়তো আমাকে এখানে দেখতে পেতে না। নজরযান হয়তো তার বিবি, বাচ্চার মা হয়ে স্বপ্ন দেখতো নতুন দিনের। চুপ করল নজরবিবি। দুরন্ত কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল তার কণ্ঠটা।

সফি দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে। নজরবিবির অতীতটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সেদিনের নজরজানকে। নজরবিবিও ভালোবেসেছিল, স্বপ্ন দেখেছিল। সে স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে তার। তার আশিককে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে মৃত্যু।

নজরবিবির কণ্ঠটা শোনা গেল। মৃদুকণ্ঠে বললে:

টুট গয়ে সৈয়াল নাগিনে
ফুট রহে রুখ সারো পর,

দেখো মেরা সাথ না দেনা
বাৎ হ্যায় এ রুস বাই কি।

(ফুটন্ত তারার মতো আমার চোখ থেকে অশ্রুর তারকা গালের আকাশ বেয়ে নেমে যাচ্ছে। এ সময় সঙ্গ তুমি দিও না। কেননা, তোমার তো তাহলে বদনাম হয়ে যাবে।)

সফি তবু চুপ ক'রে রইলো।

নজরবিবি ডাকল : সফি !

: বলুন।

: আমি চলে যাচ্ছি, সফি। আর কোনোদিন ফিরবো না। তুমি আমাকে ক্ষমা কোর।

: থাকতে পারেন না ?

: না, সফি।

: কেন ?

হাসলো নজরবিবি। বললে : বাঁচবো ব'লেই আগের জীবনটা ছেড়ে এসেছিলুম। ভেবেছিলুম শাহ্জাদার কাছেই বাকী জিন্দিগিটা কাটিয়ে দেব। কিন্তু হ'ল না।

: কেন ?

: সফি, বড় নোংরা জীবনের মধ্যে ছিলুম। পদে পদে ছিল লাঞ্ছনা, অপমান আর অত্যাচার। শাহ্জাদার ডাকে ভেবেছিলাম নিত্যদিনের গ্লানিমুক্ত তো হ'তে পারবো। কিন্তু যা ভেবেছিলুম তা যে কতো ভাবে মিথ্যে, ভুল বুঝতে দেরি হ'ল না তা। অথচ মুক্তির কোনো পথ নেই। তোমাকে মিথ্যে ব'লে তোমার সর্বনাশ করতে বাধ্য হলুম। খোদা আমার গুনাহের শাস্তি দিলেন। লেকিন, আপসোস কি জানো, সুলতান নন, যার ভালো চেয়েছিলুম সেই আমাকে আজ দূর ক'রে দিল।

নজরবিবি চুপ করল। তার গলাটা স্তব্ধ হয়ে গেল এক সময়। সফিও চুপ ক'রে রইলো। সে কিছু ভাবতে পারছে না।

: সফি! এক সময় ডাকল নজরবিবি।

: কী? তার কণ্ঠটা বিকৃত।

: একটা কথা তোমাকে বলবো সফি?

: বলুন।

: তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না।

: কেন?

: আমি তোমাকে ভালোবাসি সফি। আমি···

: বিবিজী!

: ভালোবেসেই সেদিন নিজেকে তুলে দিয়েছিলুম।

: না-না। যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল সফি।

: তুমি আমার দোস্ত, সফি। আমার গুনাহ্ ভুলে যেও। জমিলা বড় ভালো মেয়ে। আর······

কথাটা শেষ করল না নজরবিবি। চলে যাচ্ছে।

সফি বাধা দিতে চাইলো। ডাকল: বিবিজী!

দূর থেকে নজরবিবির গলাটা ভেসে এলো: বিবিজী নয় সফি, দোস্ত!

: দোস্ত! ডাকল সফি।

এবার আর কেউ সাড়া দিল না। সফি দেখল অন্ধকারে দু'টি ছায়া এক হয়েছে। বান্দা বাহারাম হয়তো পৌঁছে দিয়ে আসতে চলেছে তাকে।

সফি দাঁড়িয়ে রইলো। অনেকক্ষণ একাকী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

এক সময় সংবিত ফিরে পেল। মনে পড়ল জমিলার কথা। জমিলা একা আছে। হয়তো তাকে দেখতে না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

সফি জমিলার কাছে ফিরতে চাইলো।

ফিরেও এলো।

কিন্তু সফি নয়, যেন অন্য কেউ—অজ্ঞ মানুষ, অপরিচিত।

জমিলা চিনতে পারল না। কষ্ট হ'ল তার। তবু কাছে এলো। বললে : কি হয়েছে তোমার?

চমকে উঠল সফি। জমিলাকে দেখলো। ভাবলে বলবে না। সত্য গোপন করবে। কিন্তু পারল না। বললে : আমি নজরবিবির কাছে গিয়েছিলুম জমিলা।

: নজরবিবির কাছে?

: হ্যাঁ।

কেন সে কথা জানতে চাইলো না জমিলা। একবার শুধু তার মুখের দিকে চেয়েই মাথাটা নীচু ক'রে নিল।

সফি চুপ ক'রে রইলো অনেকক্ষণ। বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে কি যেন দেখলো। জমিলা দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় ডাকল : জমিলা!

: উঁ। সাড়া দিল জমিলা।

: নজরবিবি আমার কাছে এসেছিল।

: ওঃ।

: আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। বললে সফি।

: ওঃ। জমিলার যেন কোনো আগ্রহ নেই। তার কণ্ঠটা নিস্তেজ।

সফি বললে : নজরবিবি চলে গেল জমিলা।

: কোথায়?

: যেখান থেকে এসেছিল সে।

: কেন?

: এখানে থাকতে পারল না।

: পারল না?

: না। সফির কণ্ঠটা ম্লান। বললে : আমি জানতুম সে থাকতে পারবে না।

: জানতে?

: হ্যাঁ, জমিলা।

: কেন?

: কি ক'রে থাকবে? কি আছে—কি পেল সে এখানে?

: কী?

: কিছু না। জিন্দিগিটা ভর শুধু দিয়ে গেল নজরবিবি। কারো কাছেই কিছু পেল না। তার সামান্য চাওয়াটা কেউ পূরণ করলে না। যা ছিল তা শুধু সবাই ছিনিয়ে, লুটে কেড়ে নিল সকলে। তার মনের খবর কেউ রাখল না।

: তুমি?

: আমি! চমকে উঠল সফি। জমিলার মুখের দিকে ফিরে চাইলো। মৃদুকণ্ঠে বললে: আমিও তাকে একদিন ভুল বুঝেছিলাম।

: ভুল?

: হ্যাঁ জমিলা, ভুল। জানি না, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে কি-না, আমিও তাকে ভুল বুঝেছিলাম। তাকে আমি ঘৃণা করেছিলাম।

জমিলা চুপ ক'রে রইলো। আবার বাইরে দৃষ্টিটাকে প্রসারিত ক'রে দিল সফি।

সফি ভাবল। নজরবিবির কথা। নজরজান! একটা কসবী জানানা।

স্বপ্ন দেখেছিল সে। ঘরের স্বপ্ন। একজনের বিবি হ'তে চেয়েছিল, বাচ্চার মা! কিন্তু পারেনি। মানুষ নয়, খোদা তাকে তার স্বপ্ন সার্থক হ'তে দেননি। ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, কেড়ে নিয়েছিলেন তার মনের মানুষকে।

নজরজান কেঁদেছিল। কাঁদতে কাঁদতে ভুলে ছিল মনের দুঃখ। কাঙাল মনটা ভালোবাসতে চেয়েছিল, অবলম্বন খুঁজে ছিল। ভুলের বোঝা বাড়িয়ে ছিল জীবনে।

একদিন কথায় কথায় নজরবিবি প্রশ্ন করেছিল: জমিলাকে তো তুমি ভালোবাস সফি?

সফি চুপ করেছিল। উত্তর দিতে ইচ্ছে করেনি। কারণ, তখন তার মনটা জমিলার স্বপ্নে ভরা ছিল। ওকে কাছে পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল।

: নজরবিবি ডেকেছিল : সফি!

: বলুন।

: জমিলাকে তুমি পেয়ার করো, না?

: একথা কেন বলছেন?

: জানতে বড় ইচ্ছে করছে।

সফি কথা বলেনি।

: সফি! আবার ডেকেছিল নজরবিবি।

: পেয়ার করি।

: পেয়ার করো?

: হ্যাঁ।

সফির উত্তর শুনে সেদিন একটু চুপ করেছিল নজরবিবি। এক সময় বলেছিল : জমিলাও তো তোমাকে পেয়ার করে?

: করে।

: তুমি ঠিক জানো?

: জানি।

যদিও সেদিন জমিলার পেয়ার সম্পর্কে তার মনে সন্দেহ ছিল। মেয়েটার আচার-আচরণে অনেক সময় চিনতে পারতো না। দ্বিধা জাগতো। তবু স্পষ্ট জানিয়েছিল : জমিলা তাকে পেয়ার করে।

নজরবিবির দুই চোখ যেন সেদিন কৌতুকে নেচেছিল। বলেছিল : আচ্ছা, সফি!

: বলুন।

: জমিলা ছাড়া আর কেউ যদি তোমাকে পেয়ার করে?

: আমাকে! নজরবিবির কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিল সফি। কি বলতে চায় বুঝতে পারেনি।

: হ্যাঁ, তোমাকে। জমিলার মতো আরও কেউ তো তোমাকে পেয়ার করতে পারে! সেও হয়তো তোমার পেয়ার পেতে চায়।

: না—না। ভয় পেয়েছিল সফি।

তার ভয় দেখে হেসে উঠেছিল নজরবিবি। হাসতে হাসতেই বলেছিল : তুমি বড় ভীতু!

হয়তো তাই। নজরবিবিকে সেদিন বড় ভয় করেছিল তার। পালিয়ে আসতে চেয়েছিল। বলেছিল : আমি যাই।

উঠতে গেলে হাতটা ধরে বসিয়ে দিয়েছিল নজরবিবি। বলেছিল : ভয়ে পালাচ্ছ?

: না—না।

: তবে?

: কাজ আছে।

: কি কাজ?

: জাহাঁপনা হয়তো খুঁজবেন।

: জাহাঁপনা? কথাটা ব'লে আবার হেসে উঠেছিল নজরবিবি।

মনে পড়েছিল সফির। লজ্জা পেয়েছিল। শুধু সুলতান নন, শাহ্‌জাদাও নেই। আর নেই ব'লেই নজরবিবির কাছে পৌঁছাতে পেরেছে সে। আসতে চায়নি। বাহারাম নিয়ে গিয়েছিল তাকে।

লজ্জা পেয়েছিল সে। নজরবিবির মুখের দিকে চাইতে পারেনি।

নজরবিবি বলেছিল : কি হ'ল?

সফি কথা বলেনি।

: ছেলেমানুষ। অস্পষ্টভাবে বলেছিল নজরবিবি।

সফি মুখ তুলেছিল। মৃদু হেসেছিল নজরবিবি।

তারপর সেই বিপর্যয়ের দিন। সফির জীবনে দুঃস্বপ্নের রাত্রি। নজরবিবি তার দেহটাকে পাকে-পাকে জড়িয়ে ধরেছিল। মুক্তি পায়নি। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল সে।

মিথ্যেকেই সত্যি ব'লে মেনে নিল। অসহায় পুরুষ দাসত্ব করল।

কামের। কলঙ্কিত করল যৌবন। ব্যর্থ জীবন যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হ'ল।

কিন্তু...

নজরবিবি তাকে ভালোবাসে। তার প্রতি নজরবিবির পেয়ার সাচ্চা। আজ বিদায় বেলায় সেই কথাই বলে গেল। বললে: বন্ধু, ক্ষমা কোর। ভুলে যেও একদিনের ভুল। শুধু মনে রেখো আমাকে।

তার অন্তরটা কেঁদে উঠেছিল। ধরে রাখতে চেয়েছিল।

নজরবিবি বলেছিল: জমিলার কি হবে?

: জমিলা! সফি পেছিয়ে এসেছে।

নজরবিবি চলে গেল। ফিরে গেল পুরানো জীবনে। নিঃসঙ্গ একাকিত্বে।

সেখানে আলো নেই, বাতাসও নেই না—নেই কোনো বন্ধু। সেখানে কেউ নেই নজর বিবির। মন সেখানে কাঁদবে, মাথা কুটবে, যন্ত্রণা সহ্য করবে।

চঞ্চল হয়ে উঠল সফি। ইচ্ছে হ'ল ছুটে যায়, ফিরিয়ে নিয়ে আসে। বলবে: বন্ধু, তুমি থাক।

না, তা সম্ভব নয়। কেমন ক'রে সম্ভব? জমিলা পারলেও নজরবিবি পারবে না, হয়তো সে নিজেও। কেউ-ই পারবে না তারা। মন যে অশান্তির আগুন।

এই ভালো হ'ল। সফি মনে রাখবে, ভুলবে না কোনোদিন। খোদার কাছে করবে ওর মঙ্গল কামনা।

আর ......

জমিলা গায়ে হাত দিল তার। চমকে উঠল সফি।

বললে: কী?

: কি ভাবছো?

: ভাবছি। ম্লান একটু হাসলো সফি। বললে: জানো জমিলা, আমরা যা চাই তা কেন পাই না বল তো?

: কি চাই?

আমার কথা নয়। আমরা পেয়েছি। লেকিন, সবাই পাই না। খোদা সবাইকে দোয়া করেন না।

: কার কথা বলছো? জমিলার কণ্ঠস্বরটা কেঁপে উঠল।

: নজরবিবির কথাই বলছি জমিলা। যা চেয়েছিল কিছুই পায়নি। খোদা কিছুই দেননি তাকে।

: কিছু নয়?

: না, জমিলা। সফি একটু চুপ করল। বললে: মানুষও কিছু দিল না তাকে। আমিও।

: তুমি?

: হ্যাঁ, জমিলা।

: কী?

: আমার কাছে দোস্তি চেয়েছিল সে, আমি তাকে ঘৃণা করেছি।

: কেন?

: বিনা পেয়ারে তো দোস্তি হয় না। নজরবিবি আমার পেয়ার চাইলেও আমি তা দিতে পারিনি। কেন জানো? আমার লোভ। পুরুষের লোভ যে নারীর যৌবনের স্বপ্ন দেখে, কামনা করে। আমি তাকে শুধু কামনা করেছি, পেয়ার করিনি। একটু চুপ করল সফি।

মৃদুকণ্ঠে বললে: অথচ সে পেয়ারের কাঙাল।

জমিলা চুপ ক'রে রইলো। সফিকে দেখছে সে। ভাবছে।

সফি বললে: কি দেখছো?

: তোমাকে?

: কেন?

: কি জানি!

ওকে বড় ভালো লাগল তার। কাছে টেনে নিতে চাইলো।

বাধা দিলে জমিলা। বললে : এখন না।

: তবে ?

জমিলা বললে : রাত হয়েছে।

রাত্রি!

জমিলা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর দু'খানা হাত জড়িয়ে ধরে আছে সফির গলা। এমনিভাবে ঘুমোয় ও। ঘুমের মধ্যেও ধরে থাকে সফিকে।

ঘুম নেই সফির চোখে। সফি ভাবছে।

নজরবিবি ফিরে চলেছে। অতীতের নজরজান! পুরানো জীবনটায় ফিরে যাচ্ছে সে। তাকে পৌঁছে দিতে গেছে বাহারাম।

বাহারাম ফিরে আসবে। হারিয়ে যাবে নজরবিবি। কোনোদিন ফিরে আসবে না আর।

এমনি ভাবেই হারায়! হয়তো এই নিয়ম। যা হারায় তা আর কোনোদিন ফিরে আসে না। শুধু স্মৃতি থাকে। কিছু দুঃখ-বেদনা— জীবনের সম্বল।

জমিলাকে বুকে নিয়ে রাতের অন্ধকার আকাশটার দিকে চাইলো সে। আলো নেই। অন্ধকার আকাশে তারাগুলো জ্বলছে মিটিমিটি।

নজরবিবি তাকে দোস্ত বলেছে। শেষ অনুরোধ জানিয়ে গেছে। ভুলে যেও অতীত, অতীতের ক্ষণিক দুর্বলতা। ক্ষমা কোর। মনে রেখো, বন্ধু।

মনে রাখবে সে, ভুলবে না। ভুলতে পারবে না তাকে।

নজরবিবি তার অনেক করেছে। তার জন্যেই ফিরে পেয়েছে জমিলাকে। তার প্রেমকে।

জমিলা যদি তার কথায় ব্যথা পায়, বলবে না। গোপন রাখবে। বন্ধুর স্মৃতি গোপনে লালন করবে অন্তরের মণিকোঠায়।

খোদার দরবারে প্রার্থনা জানাবে তার জন্যে। মেহেরবান খোদা তুমি তাকে দেখো। তুমি তার ভালো কোর খোদা।

তুমি তার ভালো কোর!

॥ চব্বিশ ॥

পরদিনই ফিরে এলেন সুলতান। সফিকে ডেকে পাঠালেন।

সুলতানের জরুরী ডাক শুনে ছুটে গেল সফি। দেখতে পেল কক্ষে অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। তাকে দেখে বললেন : এসো।

সামনে গিয়ে দাঁড়াল সফি।

তাকে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন তিনি। বললেন : সফি, আজ থেকে তুমি পাইক সর্দার। জামান খাঁকে আমি হটিয়ে দিয়েছি। হুকুম দিয়েছি সে যেন আর কোনোদিন এখানে না আসে।

: কেন ?

: বেকুফের মতো প্রশ্ন কোর না। যেন খিঁচিয়ে উঠলেন সৈফুদ্দীন। উত্তেজিতভাবে বললেন : তার সঙ্গে আমার পোষাল না। সে অনেক চায়। চাওয়ার শেষ নেই তার। বলে : আজ তিন সাল সে আমাকে জিন্দা রেখেছে। তার জন্যেই আমি জিন্দা আছি। সুলতানি করছি। সে ইচ্ছে করলে আমার সুলতানি খতম ক'রে দিতে পারে।

: কেন ?

: তাকে যা দেব বলেছিলুম তা আমি দিইনি, দিতে পারিনি। তাকে সব দিলে আমার কি থাকবে! দেশের মানুষকে ভুখা রেখে সুলতানি করা যায় না। জামান খাঁকে সব দিলে ফকির হয়ে যাবো আমি। আমাকে সব দেখতে হবে। ভেবে কাজ করতে হবে।

সফি কি স্বপ্ন দেখছে অথবা দুঃস্বপ্ন! সুলতান নয়, একটা শয়তান! জামান খাঁর শয়তান। নিজের শয়তানি সে ভালো মানুষীর মুখোশের আড়ালে ঢেকে রাখে না। সে যা করে সকলের সামনেই করে। কিন্তু সুলতান ?

মানব-দরদী সৈফুদ্দীন। গরীবের দুঃখে যিনি ব্যথিত। তাঁর এই পরিচয়!

বেইমানী জামান খাঁ করেনি, বেইমান হাবশী সৈফুদ্দীন। ভালো-বাসার ধোঁকা দিয়ে এতোদিন ভুলিয়ে এসেছেন মানুষকে। নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেছেন।

: সফি! সৈফুদ্দীন ডাকলেন।

সফি তাঁর মুখের দিকে চাইলো।

: তুমি রাজী?

: রাজী?

: হ্যাঁ। তোমাকে আমি ঠকাবো না।

: লেকিন···

: কী?

: আমি একা। বড় অসহায় কণ্ঠ তার।

: একা! হাসলেন সৈফুদ্দীন। জয়ের হাসি, আনন্দের হাসি। সফির পিঠটা চাপড়ে দিয়ে বললেন: কুত্তার দল কালই তোমার পায়ের কাছে জড়ো হবে। লাথ মারবে আর কাম দেবে। আর বলবে, যে জামান খাঁকে খতম করতে পারবে তাকেই মোটা ইনাম দেবেন সুলতান। জামান খাঁকে খতম করা চা-ই, চাই।

: কেন?

সফির প্রশ্নটা যেন আশা করেননি সৈফুদ্দীন। ধমকে উঠলেন: আবার বুদ্ধুর মতো কথা বলছো? একটু ভাবলেন তিনি। বললেন: জামান খাঁ আমার জান বাঁচিয়েছে ঠিকই। আমাকে সুলতান বানিয়েছে। লেকিন, আমি তো তাকে কম দিইনি!

সফি চুপ ক'রে রইলো। আর কিছু জানতে ইচ্ছে করল না। গুনাহ্ সর্দারের নয়, সুলতানের। পাইক সর্দারকে আজ অস্বীকার করতে চান সুলতান।

সৈফুদ্দীন ডাকলেন: সফি!

সফি তাঁর মুখের দিকে চাইলো।

: কা করবে ?

: কী করবো ? সফিও যেন জানতে চাইলো সে কথা।

: তোমার ডর লাগছে ?

: ডর ?

: হ্যাঁ ?

: না।

: তবে ?

: আমি শোচতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে...... কথাটা শেষ করতে পারল না সে।

সৈফুদ্দীন তাঁর মুখের দিকে চাইলেন। তাকে দেখলেন। বললেন : কী মনে হচ্ছে তোমার ?

: আমি এমন কোনদিন ভাবিনি।

: আমরা কেউ কোনোদিন ভাবি না। আমরা যা চাই তা পাই না। যা চাই না তা পাই। কেউ অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি। কেউ-বা শুধু দুঃখ। তোমার ভালো হবে সফি। খোদা তোমার আচ্ছাই করে গা।

সফি কথা বলল না। ভালো লাগছিল না তার। মনে হচ্ছিল মিথ্যে বলছেন সুলতান। ইচ্ছে হচ্ছিল বলে সে। সৈফুদ্দীনের মুখের ওপর বলে মিথ্যা বলছেন তিনি। তাকে ঝুট বাত শোনাচ্ছেন।

কিন্তু কিছু বললে না সে। বলতে পারল না। চুপ ক'রে রইলো।

সৈফুদ্দীন বললেন : কী ভাবছো সফি ?

সে তাঁর মুখের দিকে চাইলো।

: তুমি চিন্তা ক'রে দেখো। আমি জোর করবো না। আজ··

: কী ?

: বেগমসাহেবা তোমাকে ডেকেছেন।

: বেগমসাহেবা ?

: হ্যাঁ।

: কেন ?

: আমি জানি না। সময়মতো তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা কোর।

: আচ্ছা।

বিদায় নিল সে।

সুলতানের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। খোজা প্রহরীর দল তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। সফিকে দেখলো তারা। সফিও। কথা বললে না। বিনা প্রয়োজনে বড় একটা কথা বলে না ওদের সঙ্গে।

ওদের পার হয়ে বেরিয়ে এলো সফি। কিন্তু বাইরে আসতে পারল না। বুড়ো খোজাটা কাঁপতে কাঁপতে সামনে এসে দাঁড়াল।

: কী ? জানতে চাইলো সে।

: বেগমসাহেবা…

: ডাকছেন ?

: জী, হাঁ। আভি।

পরে যাবে ভেবেছিল। নিজেকে বড় ক্লান্তবোধ হচ্ছিল তার। কিন্তু ফেরা হ'ল না।

বললে : যাচ্ছি।

বেগমসাহেবা অপেক্ষা করছিলেন যেন তারই জন্যে। দেখতে পেয়ে বললেন : আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

: আমার জন্যে ?

: হ্যাঁ, সফি। হাসলেন তিনি। বললেন : ভেতরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

সফি ভেতরে প্রবেশ করার পর বসতে বললেন তিনি। সফি বসলো। তিনি কিন্তু কিছু বললেন না। চুপ ক'রে রইলেন অনেকক্ষণ।

সফি অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। ফিরতে চাইছিল সে।

বেগমসাহেবা বললেন : জমিলা কেমন আছে ?

: ভালো।

: তুমি পাইক সর্দার হচ্ছ ?

: পাইক সর্দার ?

: হ্যাঁ। জাঁহাপনা কিছু বলেননি তোমাকে ?

: বলেছেন।

: তবে ?

: কেন ?

: কী ?

: আমাকে তিনি পাইক সর্দার বানাতে চান কেন ?

: কেন ?

: হ্যাঁ।

: তুমি বুঝতে পারছো না ?

: না।

: সবাই পারে।

: কী ?

: তুমি ভাব। হাসলেন তিনি। বললেন : তুমি এখনো সাচ্চা-ই আছ।

বেগমসাহেবার মুখের দিকে চাইলো সফি। সে মুখ রহস্যময়। কৌতুক চক্‌চক্ করছে দুই চোখের তারায়। সে নিজে কেমন বিভ্রান্তবোধ করল।

জানতে চাইলো : আমাকে ডেকেছেন কেন ?

: জানতে।

: কী ?

: তুমিই পাইক সর্দার বানছো কি-না ?

: যদি না হই ?

: অন্য কেউ হবে।

: তবে ?

: বেইমানী করবে ?

বেইমানী! চমকে উঠল সে। একি বলছেন বেগমসাহেবা? সে তাঁর মুখের দিকে চাইলো। দেখতে পেল সে মুখে কৌতুকের চিহ্নমাত্র নেই।

কিন্তু ম সনদটাই তো বেইমানের। বেইমানী না করলে গৌড়ের মসনদে বসা যায় না। আজ পর্যন্ত কেউ বসতে পারেনি। কেউ নয়। কারণ, মসনদটার নায্য দাবিদার কেউ নেই। এর স্রষ্টিকর্তা কে, তাও কেউ জানে না।

আর বেইমানী করতে সে তো চায় না! বেইমানী করার কথা কোনোদিনের জন্যে মনে স্থান দেয়নি। তবে?

বললে: আপনি একি বলছেন বেগমসাহেবা?

: তুমি সর্দার হয়ো না।

: কেন?

: কেন?

: হ্যাঁ।

: আমি জানি না। আমার মন বলছে। আমি তোমার ভালো চাই। শুধু তোমার নয়, জমিলার ভালো চাই আমি। তার সঙ্গে তোমার শাদি দেওয়ার মধ্যে আমার কোনো স্বার্থ ছিল না। তার ভালো চাই বলেই, আমি তোমারও ভালো চাই।

: লেকিন···

: কী?

: আমি কি করবো?

: কি করবে?

: আমি সর্দার বানতে না চাইলে সুলতান যদি··· ···

: ভয়?

: না-না।

: তবে?

: আমি—আমি ভেবে দেখি।

: এখনো চিন্তা ?

: আমি সর্দার বানবো না।

: ঠিক ?

: হ্যাঁ।

: কি করবে তাহলে ?

: কি করবো ?

: আমায় বলে দিতে হবে ?

: না-না।

: তবে ?

: আমি চলে যাবো। জমিলাকে সঙ্গে নিয়ে।

: আর ?

: কী ?

হাসলেন বেগমসাহেবা। এগিয়ে এলেন কাছে। কি যেন বলতে চান তিনি।

: আমি রাজি। আর কালই আমি কাম শেষ করতে চাই। তারপর···

: তারপর ?

: আমি চলে যাব।

: কোথায় ?

: জানি না।

: কেন ?

: বেইমানীর ভয়ে।

: সফি !

: সুলতানের নিমক আমি খাইনি। লেকিন আপনি সুলতান বানলে খেতে হবে। সেই ভয়েই আমি চলে যাবো।

: পাইক সর্দার তুমি হবে না ?

: না, জামান খাঁকে করবেন। সুলতান সর্দারের সঙ্গে বেইমানী করেছে। আমি তা পারবো না ব'লেই খতম করতে চাই।

: সাচ?

: ঝুট বলতে আমি শিখিনি শাহ্‌জাদা।

নাসিরুদ্দীন অনেকক্ষণ চেয়ে রইলো তার মুখের দিকে। সে মুখ দৃঢ় কঠিন। চোখ দু'টো জ্বলছে যেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে বড় তীব্র আর তীক্ষ্ণ ব'লে মনে হ'ল তার। তবু সন্দেহ গেল না। নাসিরুদ্দীন যায়নি, সফি নিজেই এসেছে। প্রথমটায় আশ্চর্য হয়েছিল। এখন সব কিছুই পরিষ্কার। প্রতিশোধ নিতে চায়।

সাচ্চা মনের একটা মানুষ। কর্তব্যে কঠিন। জীবনে বেইমানীকে ঘৃণা করে। ঘৃণার পাত্রকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে দ্বিধা নেই।

তবু বললে: তোমার ইনাম···

: ইনামের লোভে আমি আসিনি শাহ্‌জাদা।

: তবে?

: আমি এসেছি···। হঠাৎ চুপ ক'রে গেল সফি।

কেন এসেছে? সফি কেন এসেছে? না এলেও তো পারতো। কোনো প্রয়োজন ছিল না নাসিরুদ্দীনের কাছে আসবার।

স্বার্থ। প্রত্যাশা—ইনামের লোভটা কি তাকে টেনে এনেছে?

না। ইনাম নয়। ইনামের লোভ দেখিয়ে একদিন যাকে রাজী করাতে পারেনি তার কাছে নিশ্চয়ই আসতো না সে। এসেছে দেখতে। নাসিরুদ্দীনকে দেখতে এসেছে সফি।

যে মানুষটা ইনামের লোভ দেখিয়ে ব্যর্থ হয়ে আশা ছাড়েনি, নজরবিবিকে তুলে দিয়েছিল। সে আজ কি করে দেখতে এসেছিল সে। শুনে চমকে উঠেছিল নাসিরুদ্দীন। যে বিশ্বাস করতে পারেনি, সন্দেহ জেগেছিল।

মন ঠিক করেছিল সফি। নাসিরুদ্দীনকে মসনদটা তুলে দেবেন। সর্দার করতে বলবে জামান খাঁকে। কথা দিলে, সেও কথা রাখবে।

নাসিরুদ্দীন ডাকল : সফি !

: ইনামের লোভ আমাকে দেখাবেন না শাহ্‌জাদা।

: জানি। তার হাতটা চেপে ধরলে নাসিরুদ্দীন। বললে : তবু আমার কর্ত্তব্য। এখন নেবে ?

: না।

: বেশ কাজ শেষ হ'লেই আমি তোমাকে পৌঁছে দেব। তোমার প্রয়োজন। বিনা ইনামে আমি কিছু করাবো না, কেমন ?

উত্তরে কিছু বলতে পারল না সে। তার অসহ্য বোধ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল···

মনটাকে দৃঢ় কঠিন করতে চেষ্টা করল সে। সুলতান বেইমান। তাঁর বাইরের রূপ সত্য নয়। মানুষ জানে তিনি করুণার অবতার !

সফি তাই জানতো। তার মনের অনেকখানি জুড়ে ছিলেন সৈফুদ্দীন। শুধুমাত্র নোকরি কিংবা কর্তব্য নয়, সুলতানের নামে সে তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিল। দেশের আধমরা মানুষগুলোর দরদী বন্ধুকে খোদার মতো ভালোবাসতো, শ্রদ্ধা করতো। জানতো না মনের পরিচয়, জানতো না হীন জঘন্য, স্বার্থপর একটা শয়তানের কথা। যার কাছে মানুষের জীবন, তাদের সুখ-দুঃখের চেয়েও মূল্যবান মসনদ। মসনদের অধিকার বজায় রাখার জন্যেই ছলনা করেছে। বিপদ থেকে বাঁচার অস্ত্র প্রয়োগ করেছে তাদের মুখে সামান্য দানা-পানি তুলে দিয়ে। নাহলে তাদের বিদ্রোহে মসনদ টি'কতো না। বুভুক্ষু মানুষেরা দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মৃত্যুর ভয় দূর হয় তাদের মন থেকে। মরার আগে শেষ বাঁচার চেষ্টা করে তারা।

সাবধানী সুলতান সজাগ হয়েছেন। তাদের কাছে মহৎ সেজেছেন। সর্দারের সঙ্গে বেঁধেছেন স্বার্থের গাঁটছড়া।

পাইকরা বেইমানী করে না। ক্ষমতান আসনে অধিষ্ঠিত সুলতানদের জন্যেই বেইমানী করতে বাধ্য হয় তারা। কারণ,

সময়ে সুলতান ভুলে যান পাইকদের কথা। ভাবেন তিনিই সব। পাইকরা কেউ নয়। পাইকরা তাঁর গোলাম। পয়জারের তলায় থাকবে।

সৈফুদ্দীনও তাই ভেবেছিলেন। জামান যাঁকে অস্বীকার করেছেন। বেইমানী করেছেন তার সঙ্গে।

সফি তা করবে না। সুলতানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সর্দারের সঙ্গে বেইমানী করতে সে পারবে না। তার জীবনের ঋণ সে পরিশোধ করবেই। তারপর?

তারপরের কথা সে জানে না। ভাবতেও চাইলো না। মাথায় যেন আগুন জ্বলছে তার। ইচ্ছে হচ্ছে শুধু মাত্র সৈফুদ্দীনকে নয়, সেই সঙ্গে···

নাসিরুদ্দীন ডাকল: দোস্ত!

সফি চমকে তার মুখের দিকে চাইলো।

তার হাতে একটু চাপ দিল নাসিরুদ্দীন। বললে: আমার কসুর তুমি মাপ কোর!

: কসুর?

: তোমাকে আমি ভুল বুঝে ছিলাম দোস্ত।

: কেন?

: আমি মনে ক'রে ছিলুম···। না, কথাটা শেষ করতে পারল না নাসিরুদ্দীন। বুঝতে পারল সফি নাসিরুদ্দীন কি বলতে চায় অথচ বলতে পারছে না। সফি বললে: বিবিজীকে আপনি ভুল বুঝেছেন।

: সফি!

: চলি

: সফি—আমি···। কি যেন বলতে চাইলো নাসিরুদ্দীন।

: কাল রাতে! কথাটা ব'লে আর দাঁড়াল না সে।

নাসিরুদ্দীন বোকার মতো তার গমন পথের দিকে চেয়ে রইলো শুধু!

ঃ জমিলা !

ঃ উঁ !

ঃ আমরা চলে যাবো জমিলা।

ঃ যাবো।

ঃ আজ।

ঃ আজই ?

ঃ না, আজ নয়, কাল। কাল রাত শেষে। মানুষের নিদ্ ভাঙার আগেই। রাতের শেষ অন্ধকারে। ভোরের আলো, পাখির ডাক আমরা পথে দেখবো—শুনবো।

ঃ বেশ।

: আর শোন। তুমি আর আমি শুধু আমরা দু'জন। কিছু সঙ্গে নেবে না।

ঃ কিছু না !

ঃ না, কিছু না। আমরা শুধু দু'জনে যাবো। পাশাপাশি, হাত ধরাধরি ক'রে।

ঃ আচ্ছা।

এখন রাতটা শেষ হচ্ছে। আলো ফুটছে। পাখিরা ডাকছে। একটু পরেই ঘরে ঘরে রাতের নিদ্রা শেষে জেগে উঠবে মানুষ। সূর্য উঠবে। দিনের কাজ হবে শুরু।

জমিলা ঘুমিয়ে ছিল। সফি এসে তুললো তাকে।...সুলতান আজ ঘুমাননি সারা রাত। বেগমের সঙ্গে গল্প করেছেন। রাত শেষ হবার আগেই ছুটি দিয়েছেন তাকে।

অন্ধকার পথে ঝরাপাতা মাড়িয়ে ঘরে ফিরল সে। জমিলাকে জাগিয়ে তার পাশে শুয়ে পড়ল। টেনে নিল কাছে। বুকের স্পর্শ উষ্ণ হ'তে চাইলো। কিন্তু হ'ল না। উঠে বসলো। জমিলার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ দেখলো। কি যেন খুঁজলো বারবার।

অবাক হ'ল জমিলা, যেন বুঝতে পারল তার মনের কথা। যে

মনটা কি যেন বলতে চায়। প্রকাশ করতে না পেরে মাথা খুঁড়ছে। ছটফট করছে। জিজ্ঞাসা করল : কিছু বলবে ?

বলবে, সে তো বলতেই চায়। তার মনে অনেক কথা। পাহাড় জমে আছে বুকের মধ্যেটায়। প্রকাশ করতে চায়। হালকা হ'তে চায়। যদিও সে সিদ্ধান্তে স্থির। তবু সে হাঁপিয়ে উঠছে। আজ যদি বাবুর্চি বুড়ো বেঁচে থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই তাকে সব কথা বলতো। সে কিছুই গোপন করতো না।

: কি হ'ল ? জানতে চাইলো জমিলা।

যা বলতে চেয়েছিল তা বলা হ'ল না। জমিলার কাছে সে কথা বলা যায় না। বললে অন্য কথা। চলে যাবে সে। জমিলাকে নিয়ে অনেক দূরে চলে যেতে চায়। বিশ্বাস করল জমিলা। সফির প্রতিটি কথা।

এক সময় উঠে পড়ল সফি। মনটা তার অস্থির ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়াল ঘরের মধ্যে। তারপর বাইরে চলে গেল।

জমিলা ভয় পেল। আতংক জাগলো মনে। বুকের মধ্যে অসহ্য কাঁপুনি। ভেবে পেল না সে কি করবে। কি করা তার উচিত।

সফি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত—চঞ্চল। আরক্ত চোখের দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক জটিল। আজ ক'টা দিন ওকে দেখছে সে। যতো দেখছে ততো ভয় পাচ্ছে। মনে হচ্ছে ও যেন দূরে সরে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে। জমিলার আশিক আজকের খসম, সফি নামের সেই তারুণ্য আর বিশ্বাসে ভরা মরদটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

কি হয়েছে ওর ? কেন এমন করছে ? ভেবেছে জমিলা। তবে কি ভুলের বেদনা। একটা কসবার মেয়েকে আজ ও মেনে নিতে পারছে না ? ভুল করেছে ভেবে এই আত্মদাহ ?

জমিলা ভেবেছে, কি করবে সে ? কি করলে ও সুখী হবে, শান্ত হবে ওর মন !

বলেছে : একটা কথা বলবো ?

: কী ?

: আমি একটা কথা ভাবছিলুম।

: কী ভাবছিলে ?

: আমি চলে যাবো।

: চলে যাবে ?

: হ্যাঁ।

: কোথায় ?

: যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফিরে যাবো ভাবছি।

: কেন ?

: আমি—আমি মুক্তি দিতে চাই তোমাকে।

: জমিলা !

: তুমি তোমার ভুল সংশোধন ক'রে নাও। একটা কসবীর মেয়েকে নিয়ে ঘর করা যায় না। সে মেয়েটাকে···

আর বলতে পারেনি জমিলা। চোখের অশ্রু দুরন্ত ধারায় গাল বেয়ে ঝরে পড়েছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে জমিলা।

সফি বিস্ময়-বিমূঢ়। কি করবে সহসা ভেবে পায়নি সে। তার-পর যেন বুঝতে পেরেছে জমিলা কি বলতে চায়। ওকে টেনে নিয়েছে। বলেছে : অমন কথা তুমি বোল না জমিলা।

: তোমার মনের কথাও তো এই ?

: না—না। আমি এমন কথা কোনোদিন ভাবিনি।

: তবে ?

: আমি···। বলতে পারেনি ও। গোপন কথা প্রকাশ করার সাধ্য হয়নি। জমিলাকে শুধু আরও জোরে বুকে টেনে নিয়েছে।

এখন জমিলা, উঠল মনটাকে দৃঢ় করল। এসময় ভয় পেলে তার চলবে না।

বাইরে এসে দেখতে পেল সফিকে। সকালের সূর্য ওঠা আকাশের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্যান-গম্ভীর মূর্তি।

জমিলার পদশব্দে ওর দিকে চাইলো সফি। বললে : আমরা কাল চলে যাবো, জমিলা!

॥ পঁচিশ ॥

রাতটা অন্ধকার।

আকাশে অজস্র নক্ষত্র। চৈত্র শেষের বাতাসে উষ্ণ ছোঁয়া।

সুলতান সৈফুদ্দীন গভীর নিদ্রায় অচেতন। মধ্য রাতে শরাবী একটা মানুষ ফুর্তির শেষে শয্যায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। সে লক্ষ্য করেছে বাঁদীদের জড়িয়ে ধরে, তাদের বুকে হাত রেখে টলতে টলতে এসেছেন তিনি। রাতের জাগ্রত প্রহরী—তার দিকে নজর পড়তে মৃদু হেসেছে।

আজ আর চোখ সরিয়ে নেয়নি সে। বাঁদী দু'টো লজ্জায় আধমরা হ'লেও সে লজ্জা পায়নি। সেইদৃশ্য দেখতে দেখতে মনে পড়েছে জমিলাকে। তার পূর্বজীবন। সেও জানানা মহলের বাঁদী ছিল। সুন্দরী নবযৌবনা। হয়তো বাধ্য হয়েছে কোনোদিন···।

ভাবতে পারেনি সফি। তার সমস্ত চিন্তাশক্তি অবশ-শিথিল হয়ে গেছে। মাথায় আগুন জ্বলছে। তার মনে হয়েছে, সুলতানরা আদমী নয় কি? তাও সে স্পষ্ট ক'রে ভাবতে পারেনি। হারামের বাঁদীদের জন্যে দুঃখ, ব্যথা, করুণা বোধ করেছে। মানুষ নয়, পশুর জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। খোদা তাদের নরক যন্ত্রণা ভোগ করাচ্ছেন। হয়তো পূর্ব-জন্মের পাপের শাস্তি। অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত।

কক্ষদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে। কতোক্ষণ যে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে তার হিসাব করেনি। কেন দাঁড়িয়ে আছে, তাও যেন এই মুহূর্তে বিস্মৃত হয়েছে।

হঠাৎ চমকে উঠল। বাইরের অন্ধকারে কর্কশ চিৎকার ধ্বনি

শোনা গেল। শরীরের রক্তস্রোতে শিহরণ জাগলো। নিজেকে যেন ফিরে পেল সে।

জামান খাঁর সেই মর্মভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল তার। বেইমানকে দেখতে এসেছিল সর্দার। যাকে সে জীবন দিয়েছিল।

তার ব্যর্থ স্বপ্ন। রেহাই নিশ্চয়ই মিলবে না। মানুষের জান নিতে হাত কাঁপে না জামান খাঁর। সে দেখেছে, বেইমানী ক'রে কেউ কোনো দিন পাইক সর্দারের কাছে নিষ্কৃতি পায়নি।

সেও পাবে না। তাকেও জান দিতে হবে। তবু একবার দেখার ছলে সুযোগ দিতে এসেছিল। শেষ সুযোগ!

তার বদনসিব! সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। জমিলাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেনি সর্দারের সঙ্গে।

সৈফুদ্দীনের দিন শেষ। ইন্তেকাল আসন্ন। সুলতানির খেল খতম হবে।

মসনদ সুলতানের নয়, পাইক সর্দারের। সফি আজ পাইক সর্দার। জিন্দা থাকার জন্যে তাকে পাইক সর্দার বানিয়েছে সৈফুদ্দীন।

জামান খাঁ? জামান খাঁ কোথায় সে জানে না। যদি দেখা হয় তাহলে বলবে, বেইমানী সে করেনি। বেইমানকে সে শাস্তি দিয়েছে।

কিন্তু কোথায় জামান খাঁ? তাকে যে একবার চাই। চলে যাওয়ার আগে একটা কথা যে তাকে জানিয়ে যেতে হবে। দুনিয়াটা স্বার্থপর আর শয়তানে ভরে গেলেও মানুষ আছে। মানুষের মন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। এখনও মানুষ ভালো হ'তে চায়। বাঁচতে চায়। পথ না পেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। মাথা কুটে মরে।

কিন্তু কোথায় জামান খাঁ! আছে কি? নেই।

রাত শেষ হয়ে আসছে। শেষ রাতের আজানের আর বিলম্ব নেই। নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে নাসিরুদ্দীন। আজ রাতে সে নিশ্চয়ই শরাব

টানেনি। আগামী কালের সুলতানির নেশা তাকে মাতাল ক'রে রেখেছে।

সে ইনাম পাবে। তার কাজের পুরস্কার। যা সে চায়নি। নাসিরুদ্দীন দেবেই। মুঠো মুঠো আশরফি। যা ফেলে-ছড়িয়ে সে তার জিন্দিগিটা পার করতে পারবে। জমিলার নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ মিলবে। জমিলার পেটের বাচ্চাটাও···

পায়ে পায়ে কক্ষে প্রবেশ করল সে। অসহ্য উত্তেজনা। পা টলছে—শরীর কাঁপছে। সৈফুদ্দীন নিশ্চিন্তে নিদ্রিত। শরাবের নেশাটা বড় উগ্র। পাইক সর্দার সফি পাহারায় আছে।

শরীরের উপরি ভাগটা অনাবৃত। কালো পাথরে গড়া একটা বিরাট মূর্তি। মানুষ নয়, একটা জীবন্ত দৈত্য যেন!

কোমরে গোঁজা ছোরাটা এখন তার হাতে। হাতীর দাঁতের বাঁটওলা সেই ছোরা। যেটার হাত থেকে একদিন অন্যমস্কতার জন্যেই বেঁচেছিল। সর্দার দিয়েছিল তাকে।

কাছে, আরও কাছে এগিয়ে গেল সে। হাত কাঁপছে। ঘরটা আজ যেন বড় বেশি অন্ধকার! দু'চোখ জ্বলছে। উত্তেজনায় নিঃশ্বাস ঘন।

অপেক্ষা করছে শাহ্‌জাদা। আগামী কালের সুলতান। মসনদের অধিকারী। আজ ইনামের আশরফি তার হাতে!

পাশ ফিরলেন সৈফুদ্দীন। একটু কাতোরক্তি। এখনও জিন্দা, সুলতান তিনি।

আকাশের অন্ধকারটা গলছে, তরল হচ্ছে। লালের একটু ইশারা।

লাল! ঘন—টকটকে! জমাট লালের বন্যা যেন!

বাইরে বেরিয়ে এলো সে দেউড়ি পার হয়ে।

খোজা প্রহরীর দল এই প্রথম বুঝি একটু বিস্মিত হয়েছে।

ঘুমোচ্ছিল তারা, জেগে উঠেছে। প্রশ্ন করতে সাহসী হয়নি, শুধু চোখ তুলে চেয়েছে।

সে আর ফিরবে না।

আকাশ লাল হয়নি, ভ্রম তার। আজানের ধ্বনির বিলম্ব আছে।

কাম ফতে। সে আর ফিরবে না। একটা গোটা মানুষের শব পড়ে আছে। যে মানুষটা খানিক আগেও জিন্দা ছিল। একটা বেইমান। একটা বেইমানকে খতম করেছে সে।

এইবার ফিরে যাবে—চলে যাবে। অনেক—অনেক দূরে। যেখান থেকে আর কোনোদিন ফিরবে না।

ইনামের প্রয়োজন নেই। কি হবে ইনামে! সে তো ইনামের জন্যে একাজ করেনি।

বেইমানকে শাস্তি দিয়েছে। কসমের মর্যাদা রেখেছে। সর্দারের সঙ্গে বেইমানী সে করেনি। নাসিরুদ্দীনের পাইক সর্দার হবে জামান খাঁ। সে বলে দিয়েছে।

ফিরে চললো সে। ইনাম চাই না তার।

: সফি! কে যেন অন্ধকারে সতর্ক গলায় আহ্বান জানালো তাকে। কণ্ঠটা পরিচিত। তবু সে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারল না।

: কাম শেষ? আবার সেই চাপা কণ্ঠস্বর।

সে মূক-বধির। শুধু মাথা নেড়ে জানালো।

: তোমার ইনাম!

সে হাত বাড়িয়ে দিল।

একটু যন্ত্রণা বোধ। পরিচিত। দিনের পর দিন সে দগ্ধ, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

আলো দেখতে পেল। দিনের সূর্য। পৃথিবীর পথপরিক্রমা।

জমিলা প্রতীক্ষায় আছে। তার বুকে মাতৃস্নেহ। চোখে সুদূরের আহ্বান।

সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। মাথাটা তুলতে চাইলো। দেখতে চাইলো তার চারপাশে কারা।

সফল হ'ল। মুহূর্তের জন্যে চিনতে পারল একজনকে! জামান খাঁ! শাহ্‌জাদা তার কথা রেখেছে।

পাইক সর্দার ফিরে এসেছে তার স্ব-পদে!

চমকে উঠল। সর্দারের হাতে ছুরি! যেন রক্ত ঝরছে।

বুকে হাত দিল। সেখানে অজস্র যন্ত্রণা। হাতটা ভিজে গেল। সেই ভেজা হাতখানা এগিয়ে দিল সে। কি যেন বলতে গেল।

ওরা চলে যাচ্ছে। সে একা। এখনো দাঁড়িয়ে আছে।

লাল হচ্ছে আকাশটা। সূর্য উঠবে।

জমিলা নিশ্চয়ই প্রতীক্ষা করে আছে। সে ফিরে যাবে। যাত্রা করবে।

অজানা নিরুদ্দেশে হারিয়ে যাবে তারা!
